বাবিচকা

বোজেনা নেমসোভা

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলিকাতা-১২

মূল চেক ভাষা থেকে অনূদিত

অনুবাদক : শিবপ্রসাদ বিশ্বাস

প্রথম বাংলা সংস্করণ : ১৯৫৪

প্রচ্ছদ : চেক শিল্পী জিরি রথৌস্কির
চিত্রাবলম্বনে শিল্পী মৃণাল চক্রবর্তী অঙ্কিত

দাম : ৬·২৫

প্রকাশক : বিমল মিত্র, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
মুদ্রক : এ. সি. চৌধুরী,
কিরণ প্রেস, ৭২।এইচ।১২।১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

বাবিচকা

[সে আজ অনেকদিনের কথা। আমি সেই মধুর মুখখানির দিকে চেয়ে, কোঁচকানো গালে চুমো খেয়ে নীল চোখদুটির গভীরতা ঠাওর করবার চেষ্টা করে-ছিলাম। সেই চোখদুটির গভীরে ছিল কত স্নেহ, কত ভালবাসা। সে আজ কতদিন! সেই জীর্ণ হাত-দুখানি আমায় আশীর্বাদ জানিয়েছিল। আমাদের দিদিমা আজ আর বেঁচে নেই—অনেক বছর হলো শীতল মাটির গভীরে তিনি ঘুমিয়ে আছেন।]

এক

দিদিমার তিন সন্তান। এক ছেলে, দুই মেয়ে। বড় মেয়ে থাকত ভিয়েনায় আত্মীয়দের কাছে। বড়োর বিয়ে হবার পর ছোট মেয়ে এলো তার জায়গায়। ছেলে বোহিমিয়ার একটি ছোট শহরে কারিগর। দিদিমা থাকতেন সাইলেসিয়ার সীমানায় একটি ছোট গ্রামে। পরিবারে দিদিমা আর বুড়ি ঝি বেট্‌সে।

গ্রামের সবাই দিদিমার আত্মীয়, কেউ ভাই, কেউ বোন, কারও বা তিনি বন্ধু, কারও বা মা, আবার কারও পরামর্শদাত্রী। গ্রামের কোন উৎসবই দিদিমাকে বাদ দিয়ে হতো না। এমনি সহজ সুখের দিনগুলি ছিল তাঁর যে, কোন পরিবর্তনই তিনি চাইতেন না। এমনি ভাবেই বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারলে তিনি খুশী হতেন।

এরমধ্যে একদিন একখানা চিঠি এল। দিদিমা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে প্রায়ই চিঠি পেতেন, তবে এর আগে আর কোন চিঠিতেই তিনি এত সমস্যায় পড়েন নি। ভিয়েনা থেকে মেয়ে লিখেছে যে তার স্বামী এক রাজকুমারীর এস্টেটে চাকরি নিয়েছে; রাজকুমারীর ভূসম্পত্তি, দিদিমা যে গ্রামে বাস করেন, তারই কাছাকাছি। এবছর গ্রীষ্মে রাজকুমারী এস্টেটে বেড়াতে আসবেন এবং তার স্বামীকেও সেই সঙ্গে যেতে হবে। মেয়ের একান্ত ইচ্ছা যে মা এসে তাদের সঙ্গে থাকে। কোন ওজর আপত্তি শুনতে তারা রাজী নয়, সবাই বৃদ্ধার পথ চেয়ে বসে থাকবে।

চিঠি পড়ে দিদিমা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কি করবেন তিনি। এক দিকে মেয়ের টান, নাতি-নাতনীদের তিনি কখনও দেখেন নি, আর-একদিকে গ্রামের লোক; তাদের ছেড়ে তিনি যাবেন কি ক'রে? শেষ পর্যন্ত মাতৃস্নেহেরই জয় হলো। ঠিক করলেন তিনি মেয়ের কাছেই গিয়ে থাকবেন। পুরোনো কুঁড়েখানি আর যা ছিল তাঁর সবকিছু বেট্সের জিম্মায় দিয়ে তিনি বললেন: 'রইল তোমার কাছে সব। জানি না ওখানে কেমন লাগবে—তবু এখানেই আমি অন্ততঃ মরবার আগেও ফিরে আসবো।'

ক'দিন পরেই দিদিমার ঘরের সামনে একখানি গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়োয়ান ওয়েনছেল্ এক এক ক'রে দিদিমার জিনিসপত্র গাড়িতে তুলল। ফুল-আঁকা কাঠের সিন্দুক, পালকের বিছানা, চরকা, একটি

ঝুড়িতে চারটে ছোট মুরগী, আর-একটি বস্তায় দুটি বিড়ালছানা। ঘর ছেড়ে দিদিমা বেরিয়ে এলেন। কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখ লাল হয়ে গেছে। গ্রামের সবাই তাঁকে বিদায় দিতে এসেছে। তাদের কাছে বিদায় নিয়ে দিদিমা গাড়িতে উঠলেন।

সেদিন 'পুরোনো বাড়ি'তে কত প্রত্যাশা কত আনন্দ। দিদিমার মেয়ে শ্রীমতী প্রশেকদের যে বাড়ি দেওয়া হয়েছে, তাকে সবাই 'পুরোনো বাড়ি' বলে। আগে এখানে কাপড় বিরঞ্জনের কাজ হতো। বাড়িখানি নির্জন এলাকায়। সেদিন মিনিটে মিনিটে ছেলেমেয়েরা ছুটে ছুটে রাস্তায় গিয়ে দেখছে ওয়েনছেল্ আসছে কিনা। রাস্তা দিয়ে যে-ই যায়, তারা চেঁচিয়ে বলে : 'আমাদের দিদিমা আসছে—' ছেলেমেয়েরা পরস্পর জিজ্ঞেস করে : 'দিদিমা কেমন দেখতে রে ?'

তারা ভাবতে পারছে না কার মত দেখতে হবে তাদের দিদিমা।

অবশেষে দিদিমা এসে পৌছলেন। 'দিদিমা এসেছে,' বলে সমস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল ছেলেমেয়েরা। প্রশেক আর তার স্ত্রী ছুটে বেরিয়ে এল বৃদ্ধাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে—তাদের পিছু ছোট বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ছুটল ঝি বেটি—তার সাথে দুটি কুকুর—সুলতান্ আর টাইরল্।

দরজায় এসে গাড়ি থামলো। ওয়েনছেলের হাত ধরে গাড়ি থেকে বৃদ্ধা নেমে এলেন। পরনে কৃষাণীর পোশাক। মাথায় মস্ত সাদা রুমাল। এ পোশাক ছেলেমেয়েরা কখনও দেখে নি, তারা একদৃষ্টিতে দিদিমার দিকে চেয়ে থাকে। প্রশেক শাশুড়ীকে অভ্যর্থনা করে, শ্রীমতী প্রশেক মাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খায়। আলগোছে বেটি টোল-খাওয়া গাল দু'খানি এগিয়ে দেয় চুমো নেবার জন্য। দিদিমা হেসে তার গায়ে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে দেন। তারপর তিনি অন্য ছেলেদের দিকে চেয়ে বলে ওঠেন : 'ওরে আমার সোনা-মানিকরা,

কতদিন থেকে তোদের দেখব দেখব ক'রে পাগল হয়ে আছি—'! ছেলেরা কিন্তু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, একটি কথাও বলে না। তারপর মায়ের ইশারায় তারা এগিয়ে গিয়ে গাল এগিয়ে দেয় চুমোর জন্য। এখনও তাদের বিস্ময় কাটে নি। অনেকের দিদিমাকে তারা দেখেছে, তবে এমন কাউকে কখনও দেখে নি। তারা দিদিমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ভাল ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখে।

দিদিমার গায়ের ছোট কোটটি পিছনে ঢেউতোলা, সবুজ ঘাগরায় সাদা পাড়। ছেলেমেয়েরা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সাদা শালখানির নিচে ফুলতোলা মস্ত একখানি রুমাল। মাটির ওপর বসে তারা ভাল ক'রে দিদিমার সাদা মোজায় লাল রঙের কাজ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, আর দেখে কাল চটিজুতো। উইলি তাঁর হাতের ঝোলাটিতে হাত দেয়, আর চার বছরের জনি চুপে চুপে দিদিমার ঘাগরার ওপরে সাদা কাপড়খানি তুলে ধরে। তার হাতে কি যেন শক্ত একটি ঠেকে দিদিমার ঘাগরার বড় পকেটে। এদের মধ্যে সব থেকে বড় হলো বারুস্কা ; জনিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফিস ফিস করে বলে : 'দাঁড়া দিদিমাকে বলে দিচ্ছি, তুই পকেটে হাত দিয়েছিস— !'

ফিস ফিস হলেও কথাটি দিদিমার কানে গেল। হেসে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন : 'এই দেখ, কি আছে আমার পকেটে !' পকেট থেকে তিনি একে একে একটি জপের মালা, একখানি ছোট ছুরি, কয়েক টুকরো রুটি, এক ফেটি সুতো আর রুটির তৈরি দুটো পুতুল বের করলেন। ঘোড়া আর পুতুল ছেলেমেয়েদের দিতে দিতে বললেন : 'দিদিমা তোদের জন্য আরও কিছু এনেছে রে—' এই বলে তিনি হাতের ঝোলা থেকে আপেল আর রং-করা ডিম বের ক'রে সবাইকে দিলেন। তারপর ঝুড়ি থেকে মুরগী ক'টি আর বস্তা থেকে বিড়াল দুটি বের ক'রে দিলেন ছেড়ে। ছেলেমেয়েরা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। দিদিমা বলেন :

'বিড়াল দুটি মাত্র তিন মাসের, দেখবি কেমন ভাল ইঁদুর ধরে আর মুরগী ক'টি এত পোষ মানবে যে বারুস্কা যদি শেখাতে পারে, দেখবি ঠিক কুকুরের বাচ্চার মতো ওর পিছু পিছু যাবে।'

তারপর আরম্ভ হলো ছেলেমেয়েদের যত জিজ্ঞাসা : 'এটা কি ওটা কি?' মা তাদের বকলে কি হবে, দিদিমা ধমকে বলেন : 'তুই চুপ কর থেরেসা, ওদের ভাল লাগছে, বকুক—আমারও খুব ভাল লাগছে।'

একজন বসেছে দিদিমার কোলে, একজন দাঁড়িয়েছে দিদিমার পেছনে একখানি বেঞ্চের ওপর, আর সামনে বারুস্কা একদৃষ্টে দিদিমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ দিদিমার সাদা চুল দেখে আশ্চর্য হয়, কেউ-বা তাঁর কপালের ওপর রেখার সারি দেখে, আবার কেউ-বা বলে ওঠে : 'ও দিদিমা, তোমার মাত্র চারটে দাঁত!' দিদিমা হেসে বারুস্কার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন : 'দিদি, আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি! তোর যখন বয়স হবে তখন তোর চেহারাও বদলে যাবে।' কিন্তু ছোটরা কিছুতেই বুঝতে পারে না, কি ক'রে তাদের নরম, মসৃণ হাত দু'খানি দিদিমার হাতের মতো জীর্ণ হয়ে যাবে।

কয়েক ঘণ্টাতেই দিদিমা নাতি-নাতনীদের মন জয় ক'রে নিলেন। তিনি একেবারে নিজেকে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। জামাই প্রশেককেও তাঁর বেশ ভাল লাগে। সরল সুন্দর মানুষটি। তবে সে যে বোহিমিয়ান ভাষা একেবারে বলতে পারে না তা দিদিমার ভাল লাগে না। জার্মান ভাষা যা একটু-আধটু তিনি জানতেন তা একেবারেই ভুলে গেছেন, তাই ইচ্ছে থাকলেও জামাইর সঙ্গে একটি কথাও বলতে পারেন না। তবু যে প্রশেক বোহিমিয়ান ভাষা বুঝতে পারে এও এক সান্ত্বনা। দিদিমা দেখলেন বাড়িতে দুটি ভাষাই ব্যবহার হয়। ছেলে-মেয়ে ও বাড়ির ঝি বেটি প্রশেকের সঙ্গে বোহিমিয়ান ভাষায় কথা বলে, আর প্রশেক তার জার্মান ভাষায় যে জবাব দেয়, সবাই

তা বুঝতে পারে! দিদিমা ভাবেন তিনিও আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন।

মেয়ের হাবভাব দেখে দিদিমার ভাল লাগে না। তিনি ভেবেছিলেন যে মেয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার সময় যেমন হাসিখুশী চাষীর ঘরের মেয়ে ছিল, আজও তেমনি আছে। তার বদলে সে আজ শহুরে পোশাকে গৃহকর্ত্রী সেজে বসেছে। আড়ষ্ট হাবভাব, কথাও কম বলে। এ সংসারে জীবনযাত্রা দিদিমার কাছে একেবারে নতুন। প্রথম প্রথম তিনি বিস্মিত হয়ে দেখেন, তারপর তাঁর যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। শুধু নাতি-নাতনীরা যদি এমনভাবে জড়িয়ে না ধরত বৃদ্ধাকে, তা হ'লে দিদিমা আবার তাঁর কুঁড়েঘরখানিতে ফিরে যেতেন।

শ্রীমতী প্রশেকের শহুরে চালচলন হলেও, তাকে দোষ দেবার মতো কিছু ছিল না। মার ওপর তার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। তাই মার অসুবিধা নজরে পড়তেই সে একদিন মাকে ডেকে বলে: 'মা, তোমার কাজ করার অভ্যাস আমি জানি। এখানে শুধু ছেলেমেয়েদের সাথে বেড়াতে গিয়ে তোমার ভাল লাগবে না। তুমি যদি সুতো কাটতে চাও, তা হ'লে আমাদের ঘরে এখনও খানিকটা শন আছে। তাছাড়া ইচ্ছে করলে ঘরকন্নার কাজও তুমি দেখাশোনা করতে পারো। আমার কাজ সারাদিন রাজকুমারীর ক্যাসলে—তারপর সেলাই, রান্না। বাকি যা কিছু সব চাকরদের ওপর। তুমি যদি ভার নাও—'

'আঃ, একটু হাত-পা নাড়তে পারলে তো বেঁচে যাই রে!' দিদিমা আনন্দে জবাব দেন। সেই দিনই তিনি মই দিয়ে উঠে ঘরের চাল থেকে শন পেড়ে আনলেন। পরের দিন ছেলেমেয়েরা দেখে, দিদিমা চরকায় সুতো কাটতে বসেছেন।

সংসারের যে কাজটির ভার দিদিমা সর্বপ্রথম নিলেন তা হলো—রুটি তৈরি। চাকরদের হাতে 'ভগবানের দানটি' থাকলে তারা না দেখায়

সম্ভ্রম, না জানে তার কদর। উনুনে রুটি দেবার বা বের ক'রে আনার সময় তারা ক্রুশের চিহ্নও করে না—এ তো তাদের কাছে রুটি নয়, যেন ইট! দিদিমা যখন রুটি সেঁকতে বসেন তখন বারবার ভগবানের নাম করেন। সে-সময়ে ঘরে কারও আসার হুকুম নেই। এমনকি উইলিও যদি রান্নাঘরে আসে তো 'ভগবানের নাম' উচ্চারণ করতে ভোলে না।

দিদিমার রুটি সেঁকার পর ছেলেমেয়েদের ভোজ বসে যায়। তিনি সবার জন্য একখানি ক'রে ছোট রুটি ভিতরে আপেল বা প্লাম দিয়ে তৈরি ক'রে দেন। এ তো আর চাকররা জানতো না। তবে রুটির টুকরো সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের সাবধান হতে হয়েছে। দিদিমা বলতেন: 'রুটির টুকরো আগুনের প্রাপ্য—।' সারা ঘর কুড়িয়ে তিনি রুটির টুকরো উনুনের মধ্যে ফেলে দিতেন। ছেলেমেয়েদের হাত থেকে কখনও মাটিতে রুটি পড়ে গেলে তিনি বলতেন: 'তুলে নে, খাবারের ওপর কারও পা পড়লে পাপ হবে।' দিদিমা অসমান ক'রে কাটা রুটি দেখতে পারতেন না, বলতেন: 'রুটি সমান ক'রে যে কাটতে পারে না, সে কারও সঙ্গে সহজ সরল ব্যবহার করতে পারে না।' একদিন জনি দিদিমাকে একখানি রুটির একধার থেকে কেটে দিতে বললে। দিদিমা বললেন: 'জানিস না তুই—রুটির একধারে যে ছুরি চালায়, সে ভগবানের গায়েই ছুরি মারে,—এমনি কথা আর কখনও বলবি নি।'

যখনই দিদিমা কোথাও রুটির টুকরো পড়ে থাকতে দেখতেন তখনই তা তুলে পকেটে রেখে দিতেন। তারপর তা জলে মাছের খাবার জন্য ফেলে দিতেন, বা পাখি কিংবা পিঁপড়ের জন্য গুঁড়ো ক'রে ছড়িয়ে দিতেন। কখনও এক টুকরো রুটি তিনি কাউকে নষ্ট করতে দিতেন না। ছেলেমেয়েদের বলতেন: 'রুটি ভগবানের দান—কখনও নষ্ট করবি না, তা হ'লে ভগবান রাগ করবেন।' রুটি মাটিতে পড়ে গেলে

ছেলেমেয়েদের তা তুলে চুমো খেতে হতো। এ এক সাধনা! ছেলে-মেয়েরাও তাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

রাস্তায় চলতে চলতে কখনও যদি দিদিমা একটি পালক পড়ে থাকতে দেখতেন, অমনি বারুস্কাকে বলতেন : 'কুড়িয়ে নে।'

বারুস্কা বলতো : 'কি হবে দিদিমা একখানা পালক দিয়ে?'

দিদিমা এবার রেগে উঠতেন : একখানা একখানা ক'রেই অনেক হয়। লক্ষ্মী মেয়েরা একখানা পালক আনতে বেড়া ডিঙ্গিয়েও যায়।'

বাড়ির সামনের দুখানি বড়ঘরে শ্রীমতী প্রশেকদের শোবার ঘর। উৎসব পার্বণে এখানেই খাওয়া দাওয়া হয়, আর এই ঘরেই যত কিছু নতুন আসবাবপত্তর। দিদিমার এই সব আসবাব একেবারে ভাল লাগতো না।

গদি-আঁটা সোফায় মানুষ কি ক'রে আরামে বসতে পারে—তিনি বুঝতে পারেন না। তাছাড়া, কি জানি কখনও যদি ভেঙে পড়ে! একদিন মাত্র তিনি সেই পরীক্ষা করতে গেলে সোফার স্প্রিং ভেঙে যায়। দিদিমা ভয়ে প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠেন। ছেলেরা হেসে উঠে বলে : 'পড়বে না তুমি··· !' কিন্তু দিদিমা আর কোনদিন সোফায় বসেন নি। বলতেন : 'যা, তোরা বোস গিয়ে, আমার দরকার নেই।'

ঝক্‌ঝকে আসবাবের ওপর তিনি কখনও কিছু রাখতেন না, পাছে তাতে দাগ পড়ে। ঘরে কাঁচের আলমারি যাতে সবকিছু বন্ধ থাকতো, তা দেখে তিনি বলতেন : 'ছোট ছেলেমেয়েরা ঠিক কিছু-না-কিছু ভেঙে ফেলবে, তারপর মার কাছে মার খাবে।' দিদিমা আডেল্‌কাকে নিয়ে প্রায়ই পিয়ানোর পাশে বসতেন। ছোট মেয়েটি কেঁদে উঠলেই তিনি পিয়ানোর একটি দুটি রিড্ টিপে টুং টাং শব্দ ক'রে মেয়েকে থামাতেন। বারুস্কা তাঁকে 'ঐ ঘোড়া, ঐ আমার ঘোড়া···' চাষীদের সুর বাজাতে শিখিয়েছিলো। বারুস্কা যখন পিয়ানো বাজাতো দিদিমা মাথা নেড়ে'

তাল দিতেন, বলতেন: 'দিনে দিনে কত হবে—মনে হয় যেন এর মাঝে জ্যান্ত পাখি আটকে আছে, তাই গান গাইছে।'

দিদিমা বিশেষ প্রয়োজন না হলে কখনও বসবার ঘরে বসতেন না। রান্নাঘরের পাশে নিজের ছোট ঘরখানিই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। নিজের রুচিমত সাজানো ঘরের কোণের উনুনটার পাশে একখানি বড় বেঞ্চ পাতা। দেওয়ালের পরই তাঁর বিছানা আর নিচে ফুলকাটা কাঠের সিন্দুক। অন্যদিকে আর-একখানি ছোট বিছানা—এখানে বারুস্কা শোয়। দিদিমার ঘরে শোবার জন্য তাকে মার কাছে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়েছিল। ঘরের মাঝে একখানি কাঠের টেবিল। তার পাগুলি একটির সাথে আর-একটি এমনি ক'রে বাঁধা যে তার ওপর প্রয়োজন হলে পা রেখে বসা যায়। টেবিলের ওপর ঝুলতো একটি পায়রা—ডিমের খোলা আর কাগজ দিয়ে তৈরি। ঘরের এক কোণে থাকতো চরকাটি। দেওয়ালে পুণ্যাত্মাদের ছবি আর দিদিমার বিছানার পাশেই দেওয়ালে একখানি ক্রুশ, ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। জানালায় বাইরের ও ভিতরের কাঁচের পাল্লার মাঝে গোটাকয়েক ফুলের টব আর জানালায় কাপড়ের ছোট ছোট ঝোলায় নানা রকমের গাছ-গাছড়া—লিনডেন্ ফুল আর এল্ডার ফুল—যা ওষুধের জন্য দরকার হয়।

টেবিলের ড্রয়ারে থাকতো দিদিমার সেলাইয়ের সরঞ্জাম, জপের মালা, চরকার সুতো আর একটি মন্ত্রপড়া মোমবাতি—ঝড় উঠলে তিনি সেটি জ্বালাতেন।

ছেলেমেয়েদের কাছে দিদিমার ফুলকাটা সিন্দুকটি ছিল সবচেয়ে প্রিয়। তারা বসে বসে সিন্দুকের গায়ে লাল নীল গোলাপ, সবুজ পাতা, নীলপদ্ম ও লাল পাখির ছবি দেখতো। দিদিমা সিন্দুক খুললেই তারা আনন্দে হৈ-চৈ ক'রে উঠতো। তার ভিতরে নানা রকমের ছবি, নানা মন্ত্র—বিভিন্ন তীর্থ থেকে আনা। সিন্দুকের মধ্যেই আর একটি ছোট

ড্রয়ার। ছেলেরা ভাবতো, না জানি কি আছে ওর ভেতর! শুধু চিঠি, ভিয়েনা থেকে লেখা মেয়েদের চিঠি, আর একটি ছোট থলিতে রূপোর মোহর, ছেলেমেয়েরা পাঠিয়েছিল মায়ের জন্য, কিন্তু তিনি তা থেকে একটিও খরচ করেন নি। একটা ছোট কাঠের বাক্সে পাঁচখানি পাথর দিয়ে গাঁথা একটি হার, লকেট্‌টি চাঁদীর মোহরের, তার ওপর সম্রাট জোসেফ ও মারিয়া থেরেসার ছবি। ছেলেমেয়েরা চাইলেই দিদিমা এই বাক্সটি খুলে বলতেন: 'দেখ, এই হারটি তোদের দাদামশায় দিয়েছিল আমার বিয়েতে, আর এই লকেট্‌টা সম্রাট জোসেফ আমায় নিজের হাতে দিয়েছিলেন। কি মহানুভব ছিলেন তিনি—ভগবান তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন!' সিন্দুক বন্ধ করতে করতে দিদিমা বলতেন: 'আমি মরে গেলে এ সবই তোদের।'

'দিদিমা, সম্রাট নিজে কি ক'রে তোমায় রূপার ডলারটি দিয়েছিলেন—বল না আমাদের।' বারুস্কা অনুরোধ করে।

'আবার মনে করিয়ে দিস, আর একদিন বলবো।' দিদিমা জবাব দেন।

সিন্দুকের ড্রয়ারের মধ্যে আরও কয়েকটি জিনিস থাকতো দিদিমার—তীর্থস্থান থেকে আনা দুটি জপের মালা, টুপির ফিতে, আর কিছু ছেলেমেয়েদের জন্য প্রিয় জিনিস।

সিন্দুকের সবচেয়ে তলে থাকতো তাঁর জামাকাপড়, ঘাগরা, কোট, রুমাল—সবকিছু পরিপাটি ক'রে সাজানো। উপরে দুটি শক্ত ইস্ত্রি করা টুপি—টুপির পিছন দিকটা পায়রার পেখমের মতো ছড়ানো। ছেলেমেয়েদের এতে হাত দেবার হুকুম ছিল না। তবু দিদিমা যখন হৃষ্টমনে থাকতেন, তিনি একটা একটা ক'রে জামাকাপড় ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে বলতেন: 'দেখ, এই ঘাগরাটা আমার চল্লিশ বছরের, এই কাপড়খানি তোদের মার বয়সের। তবু কেমন নতুনের মত আছে, আর তোদের জামাকাপড় দু'দিনেই নষ্ট হয়ে যায়। তোরা তো পয়সার

দাম জানিস না। আমার এই সিল্কের কোটটা দেখেছিস? এর দাম একশো রাইন ডলার।' এমনি ভাবে দিদিমা কত কথা বলে যেতেন। নাতি-নাতনীরা চুপ ক'রে শুনতো—যেন তারা সব বুঝতে পারছে।

শ্রীমতী প্রশেকের ইচ্ছা যে তার মা শহুরে পোশাক পরেন। দিদিমা কিন্তু একেবারেই রাজী নন। তিনি বলতেন: 'ভগবান আমায় কিছুতেই মাপ করবেন না। হালফ্যাশান আমার জন্য নয়। আমার বয়স পেরিয়ে গেছে।'

তিনি তাঁর পুরোনো প্রথাকে আঁকড়ে থাকতেন। বাড়ির কেউ-ই তা নিয়ে কোনোদিন কোন কথা বলে নি। সংসারের সবকিছুই দিদিমার মতে চলতে থাকে।

দুই

গ্রীষ্মকালে দিদিমা ঘুম থেকে উঠতেন সকাল চারটায় আর শীতকালে পাঁচটায়। ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে সর্বপ্রথম তিনি জপের মালা আর ক্রুশটিতে চুমো খেয়ে তারপর আরম্ভ করতেন অন্য কাজ। মালাটি সব সময়ই থাকতো তাঁর সঙ্গে—রাত্রে শোবার আগে রেখে দিতেন বালিসের নিচে। জামাকাপড় পরে, গায়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে, তিনি বসতেন চরকা নিয়ে। সুতোকাটা আর সকালের প্রার্থনা চলতো একই সঙ্গে। ঘুম তাঁর ভাল হতো না—তবে দিদিমার মনে পড়তো কি ঘুমই ঘুমিয়েছিলেন তিনি যখন বয়স তাঁর অল্প ছিল। তাই অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত তিনি করতেন না কখনও।

এমনি একঘণ্টা কেটে যেত। তারপর শোনা যেত তাঁর পায়ের আর দরজা খোলার শব্দ। দিদিমা এসে দাঁড়াতেন রান্নাঘরের দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে হাঁসগুলির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্, শুয়রের ঘোঁৎ ঘোঁৎ, গরুর ডাক আর

মুরগীর পাখার ঝট্‌পটানিতে বাড়িটা মুখর হয়ে উঠতো। বেড়ালগুলো ছুটে এসে তাঁর পায়ে গা ঘষতো, কুকুর দুটি দৌড়ে এসে দাঁড়াতো তার পাশে। দিদিমা সাবধান না হলে তারা হয়তো তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত, আর চার ধারে ছড়িয়ে পড়তো তাঁর হাতে হাঁসমুরগীর খাবার। দিদিমা এই জন্তুগুলিকে ভালবাসতেন আর তারাও দিদিমাকে পছন্দ করতো। কোন জন্তুরই তিনি কষ্ট দেখতে পারতেন না, এমনকি পোকামাকড়েরও না। বলতেন : 'যে-সব জন্তু মানুষের ক্ষতি করে, বা খাবারের জন্য যাদের মানুষের প্রয়োজন, তাদের ছাড়া অন্য জন্তুদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি?' ছেলেমেয়েদের কখনও তিনি হাঁসমুরগী কাটা দেখতে দিতেন না।

একবার তিনি সুলতান্ আর টাইরল্—কুকুর দুটির উপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। কারণও ছিল। কুকুর দুটি হাঁসের ঘর ভেঙে একরাত্রে দশটা ছোট্ট হলদে বাচ্চাকে মেরে ফেলে। পরের দিন সকালে তাই দেখে দিদিমা একেবারে ভেঙে পড়েন। বড় হাঁসটি যখন মাত্র তিনটি বাচ্চা নিয়ে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এল, দিদিমা প্রথমে বুঝতে পারেন নি। তারপর তাঁর নজরে পড়ল কুকুরের কাণ্ড। বিশ্বাস হয় না যে বিশ্বাসী কুকুর দুটি একাজ করতে পারে। কুকুর দুটিও লেজ নাড়তে নাড়তে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। 'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা—দূর হয়ে যা তোরা—' দিদিমা গর্জে উঠলেন। প্রশেকের ঘরে চললেন তিনি এই দুঃসংবাদ জানাতে।

প্রশেক তাঁর মলিন মুখ ও চোখের জল দেখে ভাবলেন কি জানি কি কাণ্ড হয়েছে!—বাড়িতে সব চুরি হয়ে গেছে বা বারুস্কার কিছু হয়েছে হয়তো। তারপর খবর শুনে তার হাসি চাপা দায় হলো। কটি হাঁসের বাচ্চায় কি এসে যায়? সে তাদের কোনদিন দেখেও নি—কেমন দেখতে তাদের, কেমন ক'রে সাঁতার দিত তারা, কিছুই সে জানে

না—জানতো শুধু যখন রান্না হয়ে টেবিলে আসতো। তবু প্রশেক উঠে কুকুর দুটিকে শাসন করতে চললো মোটা বেতখানি হাতে নিয়ে। বেতের ঘা শুনে দিদিমা দু'হাত দিয়ে কান ঢাকলেন: 'ওদের শাস্তি হওয়াই দরকার।' তারপর ঘণ্টাখানেক পর দিদিমা যখন দেখলেন কুকুর দুটি তখনও তাদের ঘর থেকে বেরোয় নি, তিনি ডাকলেন: 'আয়, বেরিয়ে আয়। পাপ করলে সাজা পেতে হয়।' হাঁসের কটি বাচ্চা তখন উঠানে চরছিল, কুকুর দুটি মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল। দিদিমা ভাবলেন সত্যিই ওরা অনুতপ্ত হয়েছে।

হাঁসমুরগীদের খেতে দিয়ে তিনি চাকরদের ডেকে তোলেন। তারপর ছটা বাজলে ডেকে তোলেন ছেলেমেয়েদের। বারুস্কার কপালে আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে ডাকেন: 'লক্ষ্মী দিদিমণি, এবার উঠে পড়ো।' কপালে হাত রাখলেই আত্মা নাকি তাড়াতাড়ি জেগে ওঠে। তাকে জামাকাপড় পরিয়ে অন্য ভাইবোনদের তিনি ডাকেন। যদি দেখতেন তারা জেগে তখনও বিছানায় শুয়ে আছে, দিদিমা বলতেন: 'উঠে পড় তাড়াতাড়ি—হাঁসমুরগীগুলো এরই মধ্যে দুবার উঠোনের চারদিকে ঘুরে এসেছে—আর তোরা এখনও ঘুমোচ্ছিস?' তাদের হাতমুখ ধুইয়ে দিতেন তিনি, কিন্তু জামাকাপড় পরাতে পারতেন না—এত বোতাম, বেল্ট, বকলেস্—কোন্‌টা কোথাকার তিনি ঠাওর করতে পারতেন না। তারপর তারা যীশুর ছবির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা ক'রে সকালের খাবার খেতে যেতো।

শীতকালে যখন বাইরে কিছু করার থাকতো না, দিদিমা ঘরে বসে চরকা কাটতেন। গ্রীষ্মকালে তিনি কখনও বাগানে, কখনও উঠোনে লিনডেন্ গাছের নিচে কাজ নিয়ে বসতেন। কখনও বা নাতি-নাতনীদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে বেরুতেন। বেড়াতে বেড়াতে তিনি যে-সব গাছে ওষুধ হয় তা তুলে বাড়ি নিয়ে এসে শুকিয়ে রাখতেন। সারা

জীবনে তাঁর কখনও ডাক্তারের দরকার হয় নি। স্ডেটিক্ পাহাড় থেকে এক বুড়ি এসে তাঁকে অনেক গাছগাছড়া দিয়ে যেত। বুড়িটি যেদিনই পুরোনো বাড়িতে আসত, সেদিন সে না খেয়ে যেতে পারত না। ছেলেমেয়েদের জন্য সে একথোকা ফুল নিয়ে আসতো, যা শুঁকলেই হাঁচি পায়, তাছাড়া জানালায় রাখার জন্যও আনতো শেওলা এবং আরও কত রকমের সুগন্ধি গাছ। [বোহিমিয়ার জানালার বাইরে ও ভিতরে দুদিকেই পাল্লা। এই দুই পাল্লার মাঝে যে জায়গা সেখানে শীতকালে শেওলা বা ফার্ন দিয়ে ভরে রাখা হয়।] বুড়ির কাছে ছেলেমেয়েরা কত আশ্চর্য গল্প শুনতো—রাজকুমার রিবেরছোলের গল্প, যে পাহাড়ের সাথে কত চালাকি করেছিলেন! জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন রাজকুমারী কাথারিন্। রিবেরছোল্ তাঁকে ভালবাসতেন। রাজকুমার যখন রাজকুমারীর কাছে যেতেন তখন নানা উপদ্রব সৃষ্টি হতো। যা কিছু রাজকুমারের পথে পড়তো তা তিনি ভেঙে চুরে দিয়ে যেতেন। গাছ ভেঙে, ঘরবাড়ি নষ্ট ক'রে, পাহাড়ের রাস্তা থেকে নিচে পাথর ফেলে, মানুষ মেরে তিনি ছুটতেন রাজকুমারীর কাছে। রাজকুমারী যখন তাঁকে আবার তাড়িয়ে দিতেন, তখন রাজকুমারের চোখের জলে নদীর বন্যা বয়ে যেত।

কখনও কখনও দিদিমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিলার বা বনের শিকার-রক্ষকের বাড়ি বেড়াতে যেতেন, কখনও বা তাদের নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। সেখানে পাখির গান, মাটির ওপর শুকনো পাতার বিছানা, লিলি আর ভায়েলেট্ ফুলের গন্ধভরা বাতাস। নাতিনাতনীরা প্রিমরোজ, বুনো পিঙ্ক, থাইমি ও ঝুঁটিওয়ালা লিলি ফুল তুলতো। শেষের ফুলটি ছিল ভিকটোরকার বড় প্রিয়। ছেলেমেয়েদের দেখলেই সে তুলে এনে দিত। ভিকটোরকাকে দেখতে সব সময়ই বিবর্ণ কিন্তু তার চোখ দুটি ছিল জ্বলন্ত আগুনের মতো। এলোমেলো

চুল ঘাড়ের ওপর নেমে এসেছে। পোশাক ময়লা, ছেঁড়া। কারও সঙ্গে সে কথা বলতো না। বনের ধারে একটি বড় ওক্ গাছের পাশে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে মিলের বাঁধের জলের দিকে চেয়ে থাকতো। সন্ধ্যা হয়ে এলে সে জলের ধারে এগিয়ে গিয়ে একটি গাছের গুঁড়ির ওপর বসে গান গাইতো অনেক রাত পর্যন্ত।

ছেলেমেয়েরা একদিন তার গান শুনে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে :

'ভিক্‌টোরকা কেন ভাল জামাকাপড় পরে না? কারও সঙ্গে কথা বলে না কেন ও?'

'ও যে পাগলী।'

'পাগলী কি দিদিমা?'

'যেমন ভিক্‌টোরকা কারও সঙ্গে কথা কয় না—ছেঁড়া জামাকাপড় পরে। শীতে বা গ্রীষ্মে বনেই থাকে।'

'রাতেও?' উইলি জিজ্ঞেস করে।

'হাঁ, রাতেও। রাতে ওর গান শুনিস নি? বাঁধের ধারে বসে গান গায়। তারপর এক গর্তে গিয়ে শুয়ে পড়ে।'

বিস্মিত ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করে: 'ওর কি ভয় করে না জলমানুষের?'

'জলমানুষ আবার কি?' বারুঙ্কা বলে ওঠে : 'বাবা বলেছেন, জল-মানুষ বলে কিছু নেই।'

গ্রীষ্মকালে ভিক্‌টোরকা কখনও কারও বাড়ি আসত না। তবে শীতকালে খাবারের সন্ধানে কারও বাড়ি এসে দরজা বা জানালায় টোকা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। হাতে খাবার কিছু পেলেই সে চলে যেত। ছেলেমেয়েরা বরফের ওপর তার রক্তাক্ত খালি পায়ের ছাপ দেখে ছুটে এসে বলতো : 'ভিক্‌টোরকা এসো, মা

তোমায় জুতো দেবে, তুমি আমাদের বাড়ি থাকবে।' কিন্তু সে কোন কথাই শুনতো না। ছুটে চলে যেত।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় দিদিমা কখনও কখনও খোলা আকাশের নিচে লিনডেন্ গাছের তলে নাতি-নাতনীদের নিয়ে বসতেন। আডেল্কা ছোট, সে বসতো দিদিমার কোলে, আর সবাই বসতো হাঁটু পেতে। দিদিমা কথা বলতে শুরু করলেই নাতি-নাতনীরা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতো, যেন একটি কথাও ফসকে না যায়। তিনি বলতেন দেবদূতের গল্প, যারা আকাশে তারায় তারায় আলো জ্বেলে দেয়—বলতেন পরীর গল্প, যারা ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেখে আনন্দ পায়, আবার তাদের দুঃখে কাঁদে। ছেলেমেয়েরা আকাশে কোটি কোটি তারার দিকে চেয়ে থাকতো।

'কোন্টা আমার তারা, দিদিমা?' জনি জিজ্ঞেস করে।

'ভগবান জানেন—' দিদিমা জবাব দেন: 'এই কোটি কোটি তারার মধ্যে কোন্টা কার কে জানে?'

'ঐ যে খুব জ্বলজ্বল করছে তারাগুলি, ওগুলি কার?' বারুস্কা জিজ্ঞেস করে।

'ওগুলি,' দিদিমা বলেন: 'তাদের যাদের ভগবান খুব ভালবাসেন—যারা কখনও ভগবানকে অসন্তুষ্ট করে নি।'

'কিন্তু দিদিমা,' বাঁধ থেকে ভিক্টোরকার গলা শুনে বারুস্কা আবার জিজ্ঞেস করে: 'ভিক্টোরকারও তারা আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ আছে, তবে তা মেঘে ঢেকে আছে। এবার আয় তোরা, তোদের শোবার সময় হয়েছে।'

বাড়ি এসে দিদিমা তাদের গায়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন। ছোট ছেলেমেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে। বারুস্কা কখনও কখনও দিদিমাকে ডেকে বলে, তার ঘুম আসছে না। দিদিমা

তখন তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে প্রার্থনা শুরু করেন। ধীরে ধীরে মেয়েটির চোখ বুঁজে আসে।

দিদিমা শুতে যেতেন দশটায়। শুতে যাবার আগে তিনি সব দরজাগুলো বন্ধ হয়েছে কিনা দেখে আসতেন। বিড়ালগুলোকে ডেকে আটকে রাখতেন, তা না হলে তারা আবার ছেলেমেয়েদের বিছানায় গিয়ে শোবে। প্রদীপগুলো নিভিয়ে দিয়ে চকমকির শোলার বাক্সটি উনুনের ওপর রাখতেন। ঝড়ের পূর্বাভাস পেলেই তিনি তাঁর মন্ত্র-পড়া মোমবাতিটি বের করতেন। তারপর একটুকরো রুটি কাগজে জড়িয়ে টেবিলে রেখে দিতেন। চাকরদের ডেকে বলতেন: 'আগুন লাগলে সবচেয়ে আগে এই রুটির টুকরো বাঁচাতে হবে, তাহলে মানুষের উপস্থিতবুদ্ধি কখনও নষ্ট হবে না।'

'কিন্তু বাজ?' চাকররা প্রশ্ন করতো। এ প্রশ্ন তাঁর ভাল লাগতো না। 'তোরা কী জানিস? কেবল ভগবানই তা বলতে পারেন। তাছাড়া সাবধানের মার নেই।'

সবশেষে তিনি ক্রুসের সামনে হাঁটু পেতে বসে প্রার্থনা ক'রে গায়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে, বালিসের তলে জপের মালাটি রেখে, ভগবানের নাম ক'রে শয্যায় আশ্রয় নিতেন।

তিন

কর্মব্যস্ত শহর থেকে কেউ যদি ঘুরতে ঘুরতে এই উপত্যকায় এসে হাজির হয়, তাহলে প্রশেক-পরিবারের এই নিরালা বাড়িখানি দেখে ভাববে: 'এখানে এরা সারা বছর থাকে কি ক'রে? গ্রীষ্মকালে যখন চারদিকে ফুলে ভরে যায় তখন না হয় এ জায়গাটি মনোরম, কিন্তু শীত-কালে না জানি কি ভয়ঙ্কর।' তবু প্রশেক-পরিবারে কি গ্রীষ্মে কি

ণীতে কত আনন্দ। এই বাড়িটি যেন স্নেহ ভালবাসা আনন্দের খনি। শুধু মাত্র কারও অসুখ করলে বা প্রশেককে বাইরে যেতে হলে একটু বিষাদের ছায়া পড়ে।

বাড়িটি বড় নয়, তবু সুন্দর। সামনের ফটকে আঙুর গাছ লতিয়ে উঠেছে, বাগানে তরকারি, গোলাপ আর সুগন্ধি ফুলের গাছ। উত্তরপূব কোণে একটি ফলের বাগান, তারপর খোলা মাঠ একেবারে মিল পর্যন্ত। বাড়ির পাশেই একটি মস্ত পিয়ার গাছ, ডালপালাগুলি তার টালির ছাদের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরের চালে বাবুই পাখির বাসা। মস্ত উঠোনের মাঝে দাঁড়িয়ে একটি লিনডেন্ গাছ। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েরা তার তলে এসে বসে। দক্ষিণপূব কোণে আস্তাবল আর কয়েকখানি ঘর। তার পেছনে বাঁধ পর্যন্ত ছোট ঝোপঝাড়।

বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়েছে দুটি রাস্তা। একটিতে গাড়ি চলে, নদীর ধার দিয়ে রিসেন্ ক্যাসেল হয়ে রেডহুরা পর্যন্ত চলে গেছে। আর একটি গিয়েছে নদীর ধার দিয়ে মিল পর্যন্ত, তার পর পাশের গ্রাম। নদীর নাম উপা, রিসেন্ পাহাড় থেকে সরু উপত্যকা দিয়ে এসে পড়েছে সমতল ভূমিতে। তারপর মিশেছে এলবে নদীর সঙ্গে। নদীর দু'ধারে শুধু সবুজ, কোথাও কোথাও খাড়া, আবার কোথাও বা ঝোপঝাড়।

বাগানের সামনে দিয়ে গেছে একটি ছোট খাল। তার ওপর একটি কাঠের সাঁকো। সাঁকোটি পার হয়েই একটা ঘর। ঘরের মাঝে আছে একটি বড় উনুন। যত ফলমূল শুকানো হয় এই ঘরে। ঘরটি যখন আপেল, পিয়ার আর প্রুনে ভর্তি থাকতো তখন জনি আর উইলিকে দেখা যেত সারাদিন সাঁকোর ওপর ছুটোছুটি করতে। এ ঘরে যাবার সময় বাইরে একজন পাহাড়া থাকতো, দিদিমা যেন দেখে না ফেলেন। তবু দিদিমাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ ছিল না। তিনি ঘরে এসেই দেখতেন কটি প্রুন উধাও হয়েছে। একটু

রাগ দেখিয়ে বলে উঠতেন: 'জনি, উইলি তোরা এখানে এসেছিলি? এখান থেকে প্রুন নিয়েছিস?'

ছেলেরা বলে উঠতো: 'না দিদিমা…।' কিন্তু তাদের মুখ দেখেই মনে হতো সত্যি বলছে না।

'মিছে কথা বলিসনি, ভগবান তোদের কথা শুনবেন।' তারপর তারা আর জবাব দিত না। বুঝতে পারতো না তারা, দিদিমা কি ক'রে তাদের ধরে ফেলেছেন।

গরম পড়লে দিদিমা ছেলেমেয়েদের নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যেতেন, তবে তাদের কখনও হাঁটু জলের বেশী নামতে দিতেন না। কখনও বা এসে বসতেন তাদের নিয়ে বেঞ্চের ওপর, যেখানে চাকররা কাপড় কাচে। ছেলেমেয়েরা জলে পা ডুবিয়ে ছুটে যেত ছোট ছোট মাছের ঝাঁকের পেছনে। জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে কয়েকটি এডলার আর উইলো গাছ। ছেলেমেয়েরা তা থেকে ছোট ছোট ডাল ভেঙে জলে ভাসিয়ে দিত, আর তাকিয়ে থাকতো সেই ভেসে-যাওয়া ডাল-পালার দিকে।

দিদিমা বলতেন: 'ডালপালা জলের মাঝামাঝি ছুড়ে দে, তা না হলে জলের ধারে আটকে যাবে।'

বারুস্কা একখানা ডাল ভেঙে একেবারে স্রোতের মধ্যে ফেলে দেয়। ডালটিকে ভেসে যেতে দেখে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে: 'দিদিমা, লক্‌গেটে গিয়ে ডালটার কি হবে, তারপর যাবে কি ক'রে?'

'যেতেও পারে,' জন জবাব দেয়: 'মনে নেই তোর, একদিন আমি ঠিক লক্‌গেটের সামনে একটা ডাল জলে ছুড়ে দিলাম, তারপর তা ঘূর্ণিতে পড়ে ঘুরে ঘুরে লক্‌গেটের তল দিয়ে এসে আবার ভেসে গেল স্রোতে।'

'কোথায় গেল?' বারুস্কা জিজ্ঞেস করে।

'মিল ছাড়িয়ে পুল, তারপর খালের ভেতর দিয়ে বাভিরস্কী পাহাড়ের

চারদিকে বাঁধ দিয়ে একেবারে ভাটিখানা। সেখান থেকে স্কুল—পরের বছর তোরা সেই স্কুলে যাবি। স্কুল পেরিয়ে বড় পুল, তারপর জুলি। সেখান থেকে ইয়ারমিরম্ হয়ে এলবে নদীতে।'

'তারপর কোথায় যাবে দিদিমা?' আবার জিজ্ঞেস করে ছোট মেয়েটি।

'এলবে নদীতে ভাসতে ভাসতে সাগরে গিয়ে পড়বে।'

'সাগর কোথায় দিদিমা? কেমন দেখতে?'

'অনেক, অনেক দূর এখান থেকে। এখান থেকে শহর যতটা পথ তারও একশো গুণ হবে। সাগর মস্ত বড়।'

'তাহলে আমার ডালটির কি হবে?' মেয়েটির স্বরে এবার দুঃখের রেশ।

'ডালটি ঢেউয়ের ওপর দুলে দুলে চলবে। তারপর ঢেউ তাকে তীরে তুলে দেবে। তীরে তোদের মতো কত ছোট ছেলেমেয়ে আসবে বেড়াতে। তাদের মধ্যে একটি ছোট ছেলে ডালটি তুলে নিয়ে বলবে: 'ছোট্ট ডাল, ছোট্ট ডাল, কোথা থেকে এলে গো তুমি। কে তোমায় ভাসিয়ে ছিল জলে? কোন দেশের কোন ছোট মেয়ে নদীর ধারে বসে তোমায় গাছ থেকে ভেঙে ভাসিয়ে দিয়েছে গো—!' তারপর ছেলেটি ডালটি বাড়ি নিয়ে গিয়ে বাগানে পুঁতে দেবে। তা থেকেই আবার মস্ত গাছ হবে। তার ডালে বসে কত পাখি গান গাইবে। গাছটির তখন কি আনন্দ!'

বারুস্কার দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। গল্প শুনতে শুনতে তার ঘাগরা জলে পড়ে গেছে। তা তুলে জল নিংড়ে নিতে হয়। এমনি সময় শিকার-রক্ষক এসে দাঁড়ায় পাশে। মেয়েটির অবস্থা দেখে হেসে বলে: 'তুই একটি জলপরী!

মাথা নেড়ে মেয়েটি জবাব দেয়: 'জলপরী আবার আছে নাকি?'

শিকার-রক্ষককে দেখলেই দিদিমা বলতেন: 'আসুননা, বাড়িতে সবাই আছে।' ছেলেরা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে বাড়িতে টেনে আনতো।

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
39564
9-11-64
AGARTALA

কখনও বা শিকার-রক্ষক ওজর দেখাতো : 'কাজ আছে—ফেজান্ট পাখিরা ডিমে তা দিচ্ছে, তাদের দেখতে চলেছি।' কিন্তু প্রশেক ও শ্রীমতী প্রশেক তাকে দেখে ফেললে আসতেই হতো।

প্রশেকের ঘরে সব সময়ই অতিথির জন্য অন্ততঃ এক গ্লাস ভাল মদ থাকতো। অতিথিকে অভ্যর্থনার রীতি অনুযায়ী দিদিমা রুটি আর নুন নিয়ে আসতেন। কথা বলতে বলতে শিকার-রক্ষক পাখির কথা একেবারে ভুলে যেত। তারপর হঠাৎ মনে হতেই তাড়াতাড়ি উঠে বন্দুক হাতে বেরিয়ে যেত। উঠোনে নেমে কুকুরটিকে ডাকতো : 'হেক্টার—হেক্টার—' কিন্তু হেক্টারের দেখা নেই। 'কোথায় গেলি হেক্টার?' ছেলেরা ছুটে যেত হেক্টারকে সুলতান্ আর টাইরলের কাছে খুঁজতে।

শিকার-রক্ষক লিন্ডেন গাছের তলে বসে হেক্টারের অপেক্ষা করতো। যাবার আগে একটু থেমে সে দিদিমাকে বলতো : 'একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি। আমার স্ত্রী আপনার জন্য কটি গিনি হাঁসের ডিম রেখে দিয়েছে।' গৃহস্থালীর ব্যাপারে মেয়েদের মনের দুর্বলতা তার অজানা ছিল না।

দিদিমা রাজী হয়ে বলতেন : 'আপনার স্ত্রীকে আমার নমস্কার জানাবেন—বলবেন, আমি একদিন যাবো।' যাবার সময় এমনি ক'রে প্রতিবারই পালটা নিমন্ত্রণ হতো।

শিকার-রক্ষক সারাটি বছর ধরে প্রায় একদিন পরপরই পুরোনো বাড়ির পাশ দিয়ে কাজে যেত।

আর-একজন ব্যক্তি, যাকে প্রতিদিন সকাল দশটায় এই রাস্তায় দেখা যেত, সে হচ্ছে মিলার। এই সময়ে সে লক্‌গেট দেখতে যেত। দিদিমা বলতেন : মিলার ভালমানুষ তবে বড় রগুড়ে। অন্যকে নিয়ে তামাশা করাই তার স্বভাব। নিজে সে কখনও হাসবে না, তবে তার মুখের

ওপর ভেসে উঠবে এক দুষ্টুমির ভাব। ঝোলা ভুরুর নিচে চোখ দুটিতে তার জেগে উঠবে আনন্দ। খাটো দোহারা চেহারা। পরনে সারাটা বছর ছাই রঙের প্যাণ্ট—রং দেখে ছেলেমেয়েরা তাকিয়ে থাকে—তারপর একদিন সে তাদের বলে: 'বুঝলি, এ হচ্ছে মিলারের রং!' শীতকালে তার পরনে থাকতো লম্বা কোট আর ভারী বুট, আর গ্রীষ্মে হালকা নীল রঙের জ্যাকেট্ আর চপ্পল। শনি-রবিবার ছাড়া আর থাকতো তার সেই অদ্ভুত রঙের প্যাণ্ট। নস্যির কৌটাটি তার সর্বসময়ের সঙ্গী। তাকে দেখলেই ছোট ছেলেমেয়েরা তার পিছু পিছু লক্‌গেট পর্যন্ত যেত। পথে মিলার তাদের নিয়ে নানা রকম মজা করতো। কখনও কখনও সে জনিকে জিজ্ঞেস করতো: 'এক পেনী রুটির দাম কত হবে বলতো, যখন গমের দাম প্রতি বুশেল দুই রাইন ডলার?' ঠিক জবাব দিলেও মিলার বলে উঠতো: 'তুই একটি বোকা। তোকে সবাই ক্রামোল্‌নার হাকিম ক'রে দেবে!' [ক্রামোল্‌না একটি ছোট্ট গ্রাম। এখানে কোন দিনও কোন হাকিম ছিল না।] ছেলেদের নাকে নস্যি দিলে তারা যখন হাঁচতে আরম্ভ করে তখন সে মুখ টিপে হাসে। মিলার এলেই আডেঢকা দিদিমার ঘাগরার পিছনে গিয়ে লুকোতো—সে তখনও ভাল ক'রে কথা বলতে শেখেনি। তার জন্য মিলার ছুটতো এক ঝুড়ি ষ্ট্রবেরী বা বাদাম কিংবা অন্য কিছু আনতে। আদর ক'রে তাকে বলতো ছোট্ট টুনটুনি।

আর-একজন, যে রোজ পুরোনো বাতির পাশ দিয়ে যায়, সে হলো ঢ্যাঙা মোসেস্, ক্যাসেলের পাহারাদার। লম্বা বাঁশের মতো ছিপছিপে, চোখেমুখে সবসময়ই রাগের ভাব, পিঠে থাকে একটি ঝোলা। ঝি ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাতো এই বলে যে ঐ ঝোলার মধ্যে রয়েছে অনেক অবাধ্য ছোট ছেলেমেয়ে। তারপর থেকে ঢ্যাঙা মোসেসকে আসতে দেখলেই বাচ্চারা ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়তো। দিদিমা শুনে রাগ

করতেন, বেটিকে বলতেন অমন গল্প যেন সে না করে। চাকর ভোরসা বলতো মোসেস হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে যায়। ঝোলায় দুষ্টু ছেলেমেয়ে নেই, তা-জেনেও ছেলেমেয়েদের মোসেস সম্বন্ধে ভয় কমত না।

গ্রীষ্মকালে যখন ক্যাসেলে মালিকরা আসতেন তখন প্রায়ই দেখা যেত এক সুন্দরী রাজকুমারী ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, আর তাঁর পিছু পিছু চলেছে অভিজাত ব্যক্তিদের দল। এই দেখে মিলার একবার দিদিমাকে বলেছিলো : 'আমার মনে হয়—যেন ধূমকেতু চলেছে আর তার পেছনে এরা হলো লেজ। ধূমকেতু তো ভগবানের হাতের চাবুক।'

'পার্থক্য এইটুকু যে ধূমকেতু উঠলে পৃথিবীর অমঙ্গল হয়, আর অভিজাতদের আবির্ভাব হলে আমাদের কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে—' দিদিমা জবাব দেন। নস্যির কৌটো ঘুরিয়ে, মুচকি হেসে মিলার চুপ ক'রে থাকে।

সরাইখানার মালিকের মেয়ে ক্রিষ্টিনা প্রায়ই সন্ধ্যায় দিদিমা আর ছেলেমেয়েদের কাছে বেড়াতে আসতো। ফুলের মত সুন্দরী, কাঠবিড়ালের মত ছটফটে আর গানগাওয়া পাখির মত সুখী মেয়েটা। দিদিমা তার নাম দিয়েছিলেন হাসি, সবসময়ই তার মুখে হাসি লেগেই আছে।

ক্রিষ্টিনা দৌড়ে এসেছে কি যেন বলতে। শিকার-রক্ষকও এসেছে। মিলার এসেছে একটুক্ষণের জন্য—তার স্ত্রী অনেকদিন পর যখন 'পুরোনো বাড়ি'তে আসতো, সঙ্গে চরকাটি নিয়ে আসতো। শিকার-রক্ষকের স্ত্রী কোলের বাচ্চাটিকেও নিয়ে আসতো। কিন্তু ক্যাসেল থেকে যদি পরিচালিকা কখনও বেড়াতে আসতো, শ্রীমতী প্রশেক বলতো : 'আজ কিন্তু কথা বলে বেশ আরাম পাওয়া যাবে।'

মহিলা এলে দিদিমা কিন্তু নাতি-নাতনীদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেন। কারও মনে কষ্ট দেবার স্বভাব ছিল না তাঁর। তবে এই মহিলার অযথা দেমাক্ তিনি সইতে পারতেন না।

দিদিমা যখন মেয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন, এ বাড়ির বা পাড়াপড়শীর হাবভাব কিছুই যখন তাঁর জানা নেই, তখন একদিন এই মহিলা আরও দু'জন মহিলার সঙ্গে এ বাড়িতে বেড়াতে এলেন। মেয়ে বাড়িতে ছিল না। দিদিমা অতিথিদের বসতে বলে বাড়ির ভিতর থেকে রীতি অনুযায়ী রুটি আর নুন নিয়ে এসে বিনীতভাবে তাঁদের সামনে রেখে অভ্যর্থনা জানালেন। অতিথিরা পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণভাবে চেয়ে বললেন তাঁদের আহারে বাসনা নেই। এ চাউনির অর্থ যেন 'সেকেলে বুড়ি!' শ্রীমতী প্রশেক বাড়ি এসেই বুঝল সব। অতিথিরা চলে যাবার পর সে মাকে বললে আর যেন কখনও তিনি এঁদের রুটি আর নুন না দেন।

দিদিমা দমে গিয়ে জবাব দিয়েছিলেন : 'আমার হাত থেকে যে রুটি আর নুন গ্রহণ করবে না, সে এ বাড়ির চৌকাট মাড়ানোর উপযুক্ত নয়। তুই যা খুশী করতে পারিস, তবে আমাকে নতুন ক'রে আচার ব্যবহার শেখাতে আসিস না।'

পুরোনো বাড়িতে যারা বছরে একবার আসতো তাদের মধ্যে ভ্লাখ ছিল সবচেয়ে প্রিয়। সে তার ঘোড়ার গাড়ি ভর্তি মিষ্টি, বাদাম, কিস্‌মিস্, ডুমুর, গায়েমাখা সাবান আর সুগন্ধি নিয়ে এসে হাজির হতো। প্রশেকরা অনেক কিছু কিনতো তার কাছ থেকে, তাই ফেরিওয়ালা প্রতিবারই ছেলেমেয়েদের হাতে মিষ্টি দিয়ে যেত। দিদিমা বলতেন : 'ভ্লাখ বড় চালাক, তবে ওর দরাদরি আমার ভাল লাগে না।' ওষুধের ফেরিওয়ালা বছরে দুবার আসতো। দিদিমা তার কাছ থেকে এক কৌটো ঘায়ের মলম কিনতেন—আর দামের সঙ্গে একখানি ক'রে রুটি প্রতিবারই দিতেন।

তাছাড়া ইহুদী ফেরিওয়ালা, আর তার লোকটিও ছিল তাঁর প্রিয়। তারা প্রতি বছরই ঘরের লোকের মত এসে হাজির হতো। কিন্তু গ্রামের

কাছে জিপসিরা এলেই দিদিমা ভয় পেতেন। তিনি তাদের খাবার দিতেন। বলতেন : 'ওরা তাড়াতাড়ি সরে পড়লেই বাপু সকলের মঙ্গল !'

ছেলেমেয়েদের আর বাড়ির সকলের সবচেয়ে প্রিয় ছিল বেয়ার, স্থডেটিক্ পাহাড়ের মার্সেন্ গ্রামের শিকার-রক্ষক। বছরে একবার ক'রে সে উপা নদীতে কাঠ ভাসিয়ে নিয়ে যাবার তদারকে আসতো।

দিদিমা প্রায়ই বলতেন : ছোট ছেলেমেয়েরা আর কুকুর—এদের চিনতে দেরী হয় না—কে তাদের সত্যিকারের বন্ধু। বেয়ারের কাছে ছেলেমেয়েরা ছিল খুব প্রিয়। সবচেয়ে ভালবাসতো সে জনিকে—সেই হলো সবচেয়ে দুষ্টু। বেয়ার বলতো এ-ই হবে সবচেয়ে সাহসী, দুর্ধর্ষ। ও যদি বনের কাজ শিখতে চায়, তাহলে সে নিজে তাকে শিখিয়ে দেবে। রিসেন্ পাহাড়ের শিকার-রক্ষকও প্রায়ই পুরোনো বাড়িতে তার সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করতে আসতো। জনির কথা শুনে সে বলতো :

'ও যদি বনের কাজ সত্যিই শিখতে চায় তাহলে আমিই ওকে শিখিয়ে দেবো, কারণ আমার ফ্র্যাঙ্কিও ওই জীবিকাই গ্রহণ করবে।'

বেয়ার আপত্তি করতো : 'তা হবে না ভায়া—বাড়ির এত কাছে থেকে কিছু শেখা যায় না। তাছাড়া, অল্প বয়সেই যা কিছু দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা হওয়া ভাল। এখানে পাহাড়ের তলে আর তোমাদের অস্থবিধা কি ? কষ্ট কাকে বলে তা তো আর তোমরা জান না—' এই বলে সে একে একে বর্ণনা দিত শীতের পাহাড়ের ঝড়ঝাপটা আর বরফের কথা। কি ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে বরফে আর কুয়াশায় পাহাড়ে-পথের অবস্থা। কতবার কত বিপদে পড়েছে সে—পা পিছলে গেছে—পথ হারিয়ে গেছে। একবার পথ খুঁজে পেতে দুদিন কেটে গেছে—একেবারে অনাহারে কাটাতে হয়েছে। সে বলতো : 'তোমরা তো পাহাড়তলিতে বাস করো, জান না কি স্থন্দর হয়ে ওঠে গ্রীষ্মকালে পাহাড়। বরফ গলে যেতেই চারদিক সবুজ হয়ে যায়, ফুল ফোটে, বন গন্ধে আর গানে ভরে ওঠে। কে যেন

যাদু মাখিয়ে দেয় সব কিছুতে। তখন শিকারের খোঁজে বনে ঘুরে বেড়াতেও ভাল লাগে। সপ্তাহে দুবার আমি রিসেন্ পাহাড়ের সব থেকে উঁচু চূড়া স্লিজ্‌কাতে উঠি সূর্যোদয় দেখতে—সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য! সব কষ্ট ভুলে যাই। মনে মনে ভাবি, এ পাহাড় ছেড়ে যাবো না কোন দিন।'

বেয়ার প্রায়ই ছেলেমেয়েদের জন্য কত রকমের পাথর নিয়ে আসতো। কখনওবা নিয়ে আসতো শেওলা, ঠিক যেন ভায়োলেট্‌ ফুলের মত সুগন্ধ। গল্প বলতো, বলতো রিবেরছোলের বাগানের কথা, তুষারঝড়ে পথ হারিয়ে সে একবার সেখানে এসে পড়েছিল।

ছেলেরা কখনও তার কাছ ছাড়া হতো না। তার সঙ্গে বাঁকে গিয়ে তারা কাঠ ভাসানো দেখতো—কখনও বা কাঠের ভেলায় চড়ে বসতো। বেয়ারের যাবার সময় এগিয়ে আসতেই তাদের চোখে জল আসতো—দিদিমার সঙ্গে তারা বেয়ারকে এগিয়ে দিয়ে যেত, সঙ্গে দিত খাবার।

'ভগবান করলে আবার পরের বছর দেখা হবে—' বিদায় নিয়ে বেয়ার পথে নেমে যেতো। পরের কয়েকদিন বাড়িতে চলতো শুধু তারই কথা, পাহাড়ের ভয়ঙ্করের বর্ণনা—আর সেই দিনটির কথা যেদিন সে আবার আসবে।

চার

ছুটির দিন ছাড়াও রবিবারগুলি ছিল ছেলেমেয়েদের খুব আনন্দের। সেদিন তারা যতক্ষণ ইচ্ছা বিছানায় শুয়ে থাকতে পারতো। দিদিমা গ্রামের গির্জায় সকালের প্রার্থনায় যেতেন। শ্রীমতী প্রশেক তার স্বামী বাড়ি থাকলে দুজনে বেলায় প্রার্থনায় যেত এবং আবহাওয়া ভাল থাকলে

ছেলেমেয়েরাও যেত তাদের সাথে। দিদিমাকে দেখতে পেলেই তারা ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠতো যেন কতদিন তাঁকে দেখেনি। রবিবারে দিদিমা একেবারে বদলে যেতেন। সেদিন তাঁর মুখখানি আরও উজ্জ্বল, আরও স্নেহময় হয়ে উঠতো, তাছাড়া তাঁর পোশাকও সেদিন অন্যদিনের চেয়ে আরও সুন্দর হতো। পায়ে কালো চটি, মাথায় সাদা টুপি—তার পিছনে সাদা ফিতে এমনি ক'রে শক্ত ইস্ত্রি করা যে, পেছন থেকে দেখে মনে হতো যেন তাঁর মাথায় একটি সাদা পায়রা দু'পাখা মেলে বসে আছে।

দিদিমাকে দেখেই কেউ তার জপের মালা, কেউ রুমাল, আর সবার বড় বারুস্কা দিদিমার হাতব্যাগটি বয়ে নিয়ে যেত। এতে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে যেত—কারণ সবাই দেখতে চাইতো হাতব্যাগে কি আছে। বারুস্কা কিন্তু কিছুতেই দেখতে দেবে না। রাগারাগি হবার পর বারুস্কা দিদিমাকে বলতো ওদের বকে দিতে। ব্যাগ খুলে দিদিমা সবাইকে আপেল বা আর কিছু দিতেন। মেয়ে বলতো মাকে : 'মা তুমি সব সময়ই ওদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আস কেন?'

দিদিমা বলতেন : 'ওদের জন্য গির্জা-ফিরতি পথ থেকে যদি কিছু না আনি তাহলে চলে— ! তোরাও তো এমনিই ছিলিস।'

দিদিমা প্রায়ই মিলারের স্ত্রী বা মিলের পাশের ছেরনভ্ গ্রামের লোকেদের সঙ্গে আসতেন। মিলারের স্ত্রীর পরনে লম্বা ঘাগরা, আর কোমর পর্যন্ত ব্লাউজ ও মাথায় রূপালী সুতোর কাজকরা টুপি। বেঁটে দোহারা চেহারা। কালো সুন্দর চোখ, ছোট নাক, এবং ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। রবিবারে তার গলায় ঝোলে মুক্তোর মালা আর অন্যদিন পাথরের। তার হাতে থাকে সবসময়ই একটি বড় ঝুড়ি, তাতে থাকে নানা রকমের গাছ-গাছড়া, যা থেকে ওষুধ তৈরি হয়।

স্ত্রীর অদূরেই মিলারকে তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা যেত। গরম পড়লেই সে তার গায়ের কোটটি খুলে হাতের ছড়িটিতে ক'রে কাঁধে ঝুলিয়ে নিত। রবিবারে তার বুটটি কাল চক্‌চক্ করতো। বুটের ওপর একটি রেশমী ঝাপ্পা ঝুলতো। ছেলেমেয়েরা সেই দিকে তাকিয়ে থাকতো। তার প্যাণ্টের ঝুল বুটের মধ্যে ঢোকানো আর মাথায় ভেড়ার লোমের উঁচু টুপি, তার একপাশে নীল ফিতেয় সারি সারি ধনুক। বন্ধুবান্ধবদের বেশভূষাও প্রায় একই রকমের।

প্রার্থনা থেকে ফিরতে ফিরতে পরস্পর দেখা হলে অভিনন্দন জানাতো। কখনও বা পথে দাঁড়িয়ে কুশল প্রশ্ন, গাঁয়ের বা মিলের খবর নিয়ে হতো আলোচনা।

বাড়ি ফিরেই দিদিমা জামাকাপড় বদলে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতেন—তাঁর অনুপস্থিতিতে বাড়ির কাজের কিছু গণ্ডগোল হয়েছে কিনা। দিনের খাবার পর তিনি বিশ্রাম নিতেন—কখনও বা ঘুমোতেন। ঘুম থেকে উঠেই বিস্মিত হয়ে ভাবতেন ঘুমিয়ে পড়লেন কি ক'রে!

বিকালে নাতি-নাতনীদের নিয়ে তিনি প্রায়ই মিলে যেতেন। তাদের কাছে ঐ দিনটি ছিল ছুটির দিন। মিলারের একটি মেয়ে, নাম মারী, সবাই তাকে মান্‌চিঙ্কা বলে ডাকতো। বারুঙ্কার সমবয়সী, হাসিখুসি মেয়ে।

মিলের সামনে দুটি লিনডেন্ গাছের মাঝে ছিল একটি সেণ্ট জন্ নেপোমুকের পাথরের মূর্তি। রবিবারে এখানে এসে বসতো মিলারের স্ত্রী, ছেরনভ গ্রামের মেয়েরা আর মান্‌চিঙ্কা। হাতে নস্যির কৌটোটি ঘুরোতে ঘুরোতে মিলার তাদের সামনে দাঁড়িয়ে খবর বলতো। দিদিমাকে নাতি-নাতনীদের নিয়ে আসতে দেখেই মান্‌চিঙ্কা ছুটে যেত, আর মিলার আসতো এগিয়ে। মিলারের স্ত্রী কিন্তু এর মধ্যে বাড়ি গিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু তৈরি খাবার এনে সবাই

পৌঁছানোর আগেই বাগানে গাছের নিচে টেবিলে সাজিয়ে দিত। বান, রুটি, মধু, মাখন, ক্রীম এমনি আরও কত কি! গ্রীষ্মকালে মিলার একঝুড়ি ফল নিয়ে আসতো আর শীতকালে থাকতো শুকনো আপেল বা প্রুন। কফি বা অন্য কোন পানীয়ের রেওয়াজ ছিল না। এই এলাকায় কেবলমাত্র প্রশেক-পরিবারেই কফির ব্যবহার ছিল।

দিদিমাকে বসতে চেয়ার দিয়ে মিলারের স্ত্রী শুরু করতেন :

'আপনারা আসায় এত ভাল লাগছে—! তা না হলে আজ রবিবার বলে মনেই হতো না। ···আসুন ভগবানের দান একটু কিছু মুখে দিন।'

দিদিমা কিছু গ্রহণ করতেন না। মিলারের স্ত্রীকে তিনি বলতেন ব্যস্ত না হতে। মিলারের স্ত্রী জবাব দিতেন : 'আপনার তো বয়স হয়েছে। তবে ছোট ছেলেমেয়েদের পেট যেন হাঁসের মত, কখনই ভরে না। দেখুন না মান্‌চিক্কাকে, ওর খিদে যেন লেগেই থাকে।

ছেলেমেয়েরা আস্ত বান হাতে নিয়ে গোলাঘরের পেছনে ছুটে চলে যেত। সেখানে কেউ তাদের খোঁজ করতো না। ঘোড়া-ঘোড়া খেলতো তারা এখানে। ওদের সঙ্গে এসে জুটতো অন্য ছেলে-মেয়েরা। ছ জন। তারা শন্ মিলের অর্গান-বাজিয়ের ছেলেমেয়ে। এই পরিবারটি গ্রামে আসতেই সরাইখানার মালিক তাদের জন্য একটি ছোট কুঁড়েঘর ক'রে দিয়েছিলো। বাপ অর্গান হাতে ঘুরে বেড়াতো আর মা প্রতিবেশীদের ছোটখাট কাজ ক'রে দিত—তার বদলে কিছু কিছু পেতো। নিঃসম্বল রিক্ত পরিবার, শুধু এই ছ'টি ছেলেমেয়ে। মিলার তাদের নাম দিয়েছিলো ছ'টি তারের বাদ্যযন্ত্র। ছেলেমেয়েগুলোর গোলাপের মত লাল টুকটুকে গাল। মাঝে মাঝে শন্ মিল থেকে খাবারের এমন সুগন্ধ ভেসে আসতো যে লোকের জিভে জল এসে যেত। ছেলেমেয়েরা তেলমাখা চক্‌চকে

ঠোঁটে যখন বেরিয়ে আসতো, প্রতিবেশীরা ভাবতো কুডারনা পরিবারে কি না জানি রান্না হচ্ছে।

একদিন মান্‌চিঙ্কা শন্‌ মিল থেকে এসে মাকে বললে: 'মা, মা কুডারনা-মাসী আমায় একটু খরগোশের মাংস দিয়েছিলো, কি সুন্দর যে খেতে!'

'খরগোশ!' মা ভাবে: 'ওরা খরগোশ পেলে কোথায়? বন থেকে চুরি ক'রে আনেনি তো! তাহলে তো মুস্কিল হবে।'

কিছুক্ষণ পর কুডারনার বড় মেয়ে ছেলিয়া একটি বাচ্চা কোলে ক'রে এল, মিলারের স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করল:

'ছেলিয়া আজ তোদের কি রান্না হয়েছিলো রে?'

'শুধু আলু।'

'আর কিছু না? মান্‌চিঙ্কা বলছিলো তোর মা তাকে এক টুকরো খরগোশের মাংস দিয়েছিলো, খুব ভাল খেতে।'

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম। খরগোশ নয়, বিড়ালের মাংস। বাবা বিড়ালটি নিয়ে এসেছিলো। ঠিক যেন শূয়রের মত মোটা। মা তার চর্বিও গলিয়ে রেখেছে। বাবা বুকে মালিস করে। কামারবৌ বলেছে তাহলে নাকি কাশি থেকে আর কোন খারাপ রোগ হতে পারবে না।'

'রক্ষা করো ভগবান!' মিলারের স্ত্রী ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে থুতু ফেললো।

'জানেন না আপনি, কি সুন্দর খেতে! কাঠবিড়ালের মাংস আরও ভাল। একদিন বনের এক কর্মচারীর সঙ্গে বাবার দেখা। সে তিনটি কাঠবিড়াল মেরে নিয়ে চলেছে তার পোষা পেঁচার জন্য। বাবা কাঠবিড়াল কটি চাইলেন। তিনি শুনেছিলেন কাঠবিড়ালের মাংস খরগোশের চেয়েও ভাল, কাঠবিড়াল তো শুধু হিজল ফল খেয়েই থাকে। বাবা সে তিনটি বাড়ি এনে ছাল ছাড়ালেন, মা রান্না করলেন। সেদিন আমাদের খুব ভাল খাওয়া হলো। বাবা কোন কোন দিন কাক নিয়ে

আসেন, তবে তা খেতে ভাল নয়। কিছুদিন আগে আমাদের সত্যি-কারের এক ভোজ হয়ে গেছে। মা ক্যাসেল্ থেকে একটি রাজহাঁস নিয়ে এসেছিলেন। ওঁরা ওটাকে মোটা করার জন্য এত খাইয়েছিলেন যে মরে গেল। মরা জিনিস ওঁরা তো খাবেন না, তাই আমাদের দিয়ে দিলেন। আমরা অনেক দিন ধরে খেয়েছি, তাছাড়া চর্বিও অনেক দিন ছিল!'

মিলারের স্ত্রী তাকে থামতে বলে: 'তুই এখন যা। তোর কথা শুনে আমার গা বমি বমি করছে। মারী, তুই আর কোন দিন কুডারনাদের বাড়িতে কোন মাংস খাসনি। যা, এখন গিয়ে গা হাত ধুয়ে ফেল—কিছুতে হাত দিস না।' বেরিয়ে যেতে যেতে সে ছেলিয়াকেও বাইরে বের ক'রে দিলে।

মানচিস্কা কেঁদে মাকে বোঝাতে চায় যে সে খরগোসের মাংসই খেয়েছে। কিন্তু মা উত্তর না দিয়ে শুধু আর-একবার থুতু ফেলে।

মিলার এসে সব শুনে নস্যির কৌটো ঘুরিয়ে বলে: 'কি হয়েছে তাতে গিন্নি? যার যা ভাল লাগে। আমি ভাবছি একদিন কুডারনাদের কাঠবিড়ালের মাংস খেয়ে আসবো।'

ক্রুদ্ধা স্ত্রী জবাব দেয়: 'তাই যাও।'

মিলার চোখ বন্ধ করে, মুখখানিতে তার দুষ্টু হাসি খেলে যায়।

এরপর শুধু মিলারের স্ত্রী নয়, সকলেই কুডারনা-পরিবারকে একটু ঘৃণার চোখেই দেখে। তারা বিড়াল, কাঠবিড়াল সবকিছু খায়। প্রশেকের ছেলেমেয়েদের কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। খেলার সাথী পেলেই তাদের আনন্দ। তারা নিজেদের খাবারও ভাগ ক'রে খায়। দশ বছরের ছেলিয়া কোলের বাচ্চাটিকে মাটিতে বসিয়ে তার হাতে একখানি বান দিয়ে খেলতে আসে। ছেলেমেয়েদের সে গাছের শিষ দিয়ে ছোট ছোট ঝুড়ি তৈরি ক'রে দেয়। খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে ছেলেমেয়েরা উঠোনে

ছুটে আসে। মান্‌চিস্কা বলে সবার খিদে পেয়েছে। মা সবাইকেই খেতে দেয়।

মিলার সব সময়েই ছেলিয়ার সঙ্গে ঠাট্টা করতো, তাকে দেখেই বলতো: 'কি জানি আমার কি হয়েছে! আমার বুকের মধ্যে চাপ চাপ ঠেকছে। ছেলিয়া, তোদের বাড়িতে আজ খরগোসের মাংস হয়েছে? একটু…'

মিলারের স্ত্রী রাগ ক'রে চলে যেত। দিদিমা বলতেন: 'আপনি কি রকম? আমি যদি আপনার স্ত্রী হতাম সত্যিই আপনাকে কাক রেঁধে দিতাম!'

নস্যির কৌটো নাড়াচাড়া করতে করতে মিলার চোখ বন্ধ ক'রে হাসতো।

সকলে যখন বাগানে বসত তখন মিলের ফোরম্যান্ এসে দলে যোগ দিত। প্রথমে গির্জা নিয়ে শুরু, তারপর কার কার সঙ্গে দেখা হলো সেখানে, তা থেকে আলোচনা গড়িয়ে যেত সে-বছরের ফসল, বন্যা, ঝড়-বৃষ্টি, শনের ফসলে; সৈন্য আর জেলের কথায় এসে আলোচনা থামতো। ফোরম্যান্ খুব কথা বলতে পারতো, তবে সন্ধ্যার সময় যেই চাষীরা ফসল ভাঙাতে আসতো, তাকে তখন মিলে ফিরে যেতে হতো। মিলারও সরাইখানার দিকে পা বাড়াতো।

শীতকালে ছেলেমেয়েরা ঘরের কোণে বড় উনুনের ওপর সারাদিন কাটাতো। বোহেমিয়ার গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই ঘরের কোণে একটি ইটের তৈরি উনুন থাকে—তাতে উনুনের কাজ ও ঘরগরম দুই কাজই হয় আর তার ওপরই হয় চাকরের বিছানা, আর থাকে মানচিস্কার পুতুল আর খেলার সবকিছু। ছেলেমেয়েরা এসে জমতো উনুনের ওপর। উনুনের সিঁড়ির ধাপে বসতো একটি কুকুর। ছেলমেয়ে-দের বিয়ের খেলা হতো। বর ঝুলকালিমাখা আর পুরোহিত নিকোলাস্।

তারপর ভোজ, নাচ, গানের দাপটে কেউ-না-কেউ কুকুরের লেজটি মাড়িয়ে দিতেই সে আঁতকে উঠতো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কথাবার্তায় ছেদ পড়তো। গৃহকর্ত্রী বলে উঠতেন: 'তোরা যে উনুন ভেঙ্গে ফেলবি দেখছি, কাল আমার রুটি সেঁকতে হবে না!' ছেলেমেয়েরা তখন চুপ ক'রে যেত। তারপর শুরু হতো তাদের 'বাবা মা' খেলা। এক সারস পাখি কোথা থেকে কনেকে এক শিশু এনে দিত। আডেল্‌কা হতো তার ধাত্রী, সঙ্গে জনি ও উইলি। শিশুর নাম রাখা হতো জ্যাক্। তারপর হতো তার খৃষ্টধর্মে দীক্ষার উৎসব। ভোজ বসতো, ভালমন্দ খাবার পরিবেশন হতো—কুকুরটিও বাদ যেত না। বড় হয়ে উঠতো জ্যাক্। তার বাবা তাকে স্কুলে নিয়ে যেত। জনি হতো স্কুলের মাষ্টার, জ্যাককে সে বানান শেখাতো। শুধু একটি ছাত্র। কি ক'রে স্কুল চলে? এবার সবাই 'ইস্কুল ইস্কুল' খেলা শুরু করতো। কেউই পড়া ক'রে আসে না। মাষ্টার মশাই রেগে যান। শাস্তি—সকলের হাতে দু'ঘা ক'রে বেত। শাস্তি মেনে নেয় সবাই। কিন্তু কুকুরটি? দু'ঘা বেতের পরে ঠিক হয় তার গলায় 'গাধার লেবেল' ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। লেবেল ঝুলিয়ে দিতেই বেচারী ছুটে নিচে গিয়ে মেঝেয় গড়াগড়ি দেয় লেবেল খুলে ফেলতে।

ফোরম্যান্ ছুটে আসে। দিদিমা ভয়ে চিৎকার ক'রে ওঠেন। মিলার ছেলেমেয়েদের দিকে নস্যির কৌটো দেখিয়ে বলে ওঠে: 'দোহাই তোদের···আমি আসছি···' তারপর মুখ ঘুরিয়ে হাসে যেন তারা দেখতে না পায়।

দিদিমা বলে ওঠেন: 'আমাদের ছেলেলেয়েদেরই দোষ। আয় তোদের বাড়ি নিয়ে যাই, তা না হলে সব ভেঙে ফেলবি।'

মিলারের স্ত্রী আপত্তি জানায়। তখনও ফরাসী যুদ্ধ আর তিন যোদ্ধার কাহিনী শেষ হয়নি। দিদিমা এসব গল্প সবই জানতেন। অনেক অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর—যুদ্ধের জীবনেরও। সবাই বিশ্বাস করতো তাঁর কথা।

'দিদিমা, বোনাপার্টির বিরুদ্ধে রাশিয়া যে তিনজন বরফের যোদ্ধা পাঠিয়েছিলো, তাদের নাম কি?' জিজ্ঞেস করতো এক যুবক।

'তা তুমিই ধারণা করতে পার।' ফোরম্যান্ তাড়াতাড়ি জবাব দিত।

'ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী। রাশিয়ায় যা শীত, তাতে সবাই জমে যাবার ভয়ে নাক ঢেকে রাখে। ফরাসী সৈন্যেরা তা জানতো না, তাই জমে মরে গেল। জার জানতো, তাই তাদের এতদূর আসতে দিয়েছিলো যাতে তারা আর ফিরে না যেতে পারে। জার সত্যিই কিন্তু বুদ্ধিমান।'

'দিদিমা,' আর একজন প্রশ্ন ক'রে উঠতো: 'আপনি সম্রাট জোসেফকে জানতেন। তাই না?'

'হাঁ, জানতাম বৈকি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছি। এই ডলারটি তিনি নিজের হাতে আমায় দিয়েছিলেন।' গলার হার থেকে ডলারটি তুলে দেখাতেন।

যারা শুনতো তারা আবার জিজ্ঞেস করতো: 'সে কি ক'রে হলো?'

তখন উনুনের ওপর ছেলেরা একেবারে চুপ হয়ে যেত। তারা ছুটে নেমে এসে দিদিমাকে ধরতো সেই গল্প বলতে।

দিদিমা আপত্তি জানিয়ে বলতেন: 'কিন্তু মিলার আর তার স্ত্রী তো শুনেছে।'

মিলার বলে উঠতো: 'ভাল গল্প আর-একবার বলুন না। বলুন আর-একবার।'

'আচ্ছা বলছি, তবে ছেলেমেয়েরা শান্ত হয়ে বোস।'

ছেলেমেয়েরা আর টুঁ শব্দটি করতো না।

দিদিমা আরম্ভ করতেন:

'নতুন শহর যখন তৈরি হচ্ছে, আমার বয়স তখন খুব কম। আমি থাকতাম তখন ওলেস্‌নিকে। ওলেস্‌নিক কোথায় জানো তো?'

'আমি জানি,' ফোরম্যান জবাব দিত : 'ভবরুসকা ছাড়িয়ে পাহাড়ের ওপর—সাইলেসিয়ার সীমানার কাছে। তাই না?'

'হাঁ সেখানেই!' আমাদের বাড়ির কাছে এক কুঁড়ে ঘরে থাকতো এক বিধবা, নভত্‌নি নাম। জীবিকা চলতো তার পশমের কম্বল বুনে। কয়েকখানি কম্বল বোনা হয়ে গেলেই সে ইয়ারমিরম্‌ বা থিল্‌সেন-এ নিয়ে যেত বিক্রি করতে। প্রায়ই সে আমাদের বাড়ি আসতো আর আমরাও তার কুঁড়ে ঘরে দিনের মধ্যে অনেকবার ছুটে যেতাম। আমার বাবা ছিলেন এই বিধবার ছেলের ধর্মবাপ। আমি যেই একটু কাজকর্ম শিখেছি, বিধবার বাড়ি গেলেই সে বলতো, আয়, তাঁতে বোস এসে, কম্বল বোনা শেখ—। কি জানি কোন দিন হয়তো তোর কাজে লাগবে। ছোটবেলায় মানুষ যা শেখে তা হয়তো আবার বয়সকালে কাজে লাগে।··· আমার সখ ছিল কাজ শেখার। তাই দ্বিতীয়বার আর আমায় বলতে হতো না। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি একা একাই একখানি কম্বল বুনে ফেললাম। সেই সময় সম্রাট প্রায়ই নতুন শহর দেখতে আসতেন। গ্রামের সবাই সেই গল্প করতো। সম্রাটকে যারই দেখার সৌভাগ্য হোক সে-ই মনে মনে গর্ববোধ করতো।···

'একবার সেই বিধবা মহিলা যখন শহরে চলেছে আমি তার সঙ্গে যেতে চাইলাম। মা রাজী হলেন, তবে বললেন আমি যেন কয়েকখানি কম্বল বয়ে নিয়ে যাই। পর দিন সকালে আমরা রওনা হয়ে দুপুরের আগেই শহরের মাঠে এসে গেলাম। সেখানে কাঠের গাদায় বসে জুতো পরতে পরতে মহিলা বললো: আজ কোথায় কম্বল বিক্রি করতে যাবো? এমন সময় আমি দেখলাম এক ভদ্রলোক শহর থেকে আমাদের দিকে আসছেন। তাঁর হাতে কি যেন একটা বাঁশীর মত—মাঝে মাঝে মুখের ওপর তুলে চারদিক ঘুরছেন।···

'দেখ, দেখ! আমি বলে উঠলাম: এক-বাঁশী বাজিয়ে, বাঁশীর তালে তালে নাচছে।'

'দূর বোকা। ওটা বাঁশী নয়, ওঁ বাঁশী বাজিয়েও না। খুব সম্ভব এই বাড়ি তৈরির তদারক করাই ওঁর কাজ। এমনি কয়েকজনকেই আমি এখানে দেখি। বাঁশী নয়—ওটা একটা নল, তার মাঝে কাঁচ, এ দিয়ে অনেকদূর দেখা যায়।...

'তাহলে আমরা যখন জুতো পরছিলাম তখন যদি আমাদের দেখে থাকেন!...

'তাতে আর লজ্জা কি?

'ভদ্রলোক কাছে এসে গেলেন। তাঁর গায়ে ধূসর রঙের এক কোট আর মাথায় একটি তিনকোণা টুপি। টুপির নীচে মাথার চুলের সাথে একটি ছোট ধনুকের প্রতিকৃতি। অল্পবয়সী, ঠিক ছবির মত সুন্দর। কোথায় চলছো তোমরা? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।...

'মহিলা জবাব দিল: হাতের কাজ বিক্রি করতে।

'কি কাজ? আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'পশমের কম্বল, সৈন্যদের ব্যবহারে লাগতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন—এই বলে মহিলা বোঝা খুলে এক এক ক'রে কয়েকখানি কম্বল বিছিয়ে দিল। মহিলা অতি ভাল মানুষ, তবে বেচতে বসলেই বক্ বক্ শুরু করে।

'এ তোমার স্বামীর তৈরি? প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'সেও তৈরি করতো। বছর দুই আগে মারা গেছে। তার কাজ দেখে দেখে শিখেছিলাম। আমি তাই সব সময়ই মেয়েটিকে বলি—শুধু—শিখে যা, যা শিখবি তা তোর কাছ থেকে কোন সৈন্যও কেড়ে নিতে পারবে না।...

'ও তোমার মেয়ে?

'না, আমার মেয়ে নয়—আমাদের গুরু ভগ্নীর মেয়ে। আমার কাছে কাজ শিখছে। এই কম্বলখানি তৈরি করেছে।...ভদ্রলোক আমার কাঁধে টোকা দিয়ে আমার দিকে তাকালেন প্রশংসার দৃষ্টিতে। এমন সুন্দর চোখ আমি কখনও দেখিনি—ফুলের মত নীল।...

মহিলার দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার ছেলেমেয়ে নেই ?

'হাঁ, আমার এক ছেলে আছে। তাকে রিথ্নভে স্কুলে পাঠিয়েছি। ভগবানের দয়া, পড়াশুনা তার কাছে খেলারই মত। সে ভাল উপাসনা-সঙ্গীত গাইতে পারে। কিছু অর্থ সঞ্চয় ক'রে তাকে পাদ্রীর কাজ শিখতে পাঠাবো।

'সে যদি পাদ্রীর কাজ শিখতে রাজী না হয়—

না, না, সে গররাজী হবে না। জর্জ ভাল ছেলে।' বিধবা জবাব দেয়।

'আমি তখন ভদ্রলোকের হাতের নলটির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। তিনি হয়তো তা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই আমার দিকে ফিরে বললেন : তুমি বোধ হয় ভাবছো কি ক'রে এই দূরবীন দিয়ে দেখতে হয়। তাই না ? লজ্জা পেয়ে চুপ ক'রে রইলাম। নভতনি বলে উঠলো : ও ভেবেছে আপনার হাতের নলটি বাঁশী আর আপনি বাঁশীবাজিয়ে। আমি ওকে বললাম আপনি কে।

'জানো তুমি ? তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন। না, আপনার নাম আমি জানি না। তবে যারা এখানে মজুরদের কাজ দেখতে আসে আপনি তাদেরই একজন হবেন, আর এই নলটি দিয়ে দূর থেকে তাদের কাজ দেখেন। তাই না ?'

'ভদ্রলোক জোরে হেসে উঠে বললেন : হাঁ মা, আপনার পরের ধারণাটিই সত্যি। তারপর তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন : তুমি খুকী এই নল দিয়ে দেখবে ? তিনি যন্ত্রটি আমার চোখে ধরলেন।

কি আশ্চর্য! কত কি আমার নজরে এল। লোকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়ে সব দেখতে পারছি--তারা কি করছে—তারা যেন একেবারে আমার কাছে দাঁড়িয়ে—মাঠে কাজ করছে যারা তাদের মনে হয় যেন একেবারে আমার সামনে।...

নভতনিকে বললাম একবার সেই নল দিয়ে তাকিয়ে দেখতে। সে বললে তার মত বয়সের লোকের এমনি ছেলেখেলা ভাল দেখায় না।

'এ ছেলেখেলা নয়, এ কাজের জিনিস। ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

'তা হবে, তবে আমার কাছে নয়। বিধবাকে কিছুতেই সেই নল দিয়ে দেখতে রাজি করানো গেল না। তখন ভাবলাম আমি একবার যদি সম্রাট জোসেফকে দেখতে পেতাম। ভদ্রলোক খুব ভাল, তাই তাঁকে মনের কথা বললাম।...

'সম্রাটকে দেখে কি হবে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কি তাঁকে ভাল লাগে?

'নিশ্চয়ই, সবাই তাঁর সুনাম করে। রোজই আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী যেন দীর্ঘায়ু হন।

'তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাও?

'ভগবান না করুন। আমি তাঁর দিকে চাইবো কি করে?

'কেন? তিনি তো আমার মতই একজন মানুষ।'

'না—, নভতনি জবাব দেয়: সম্রাট সম্রাটের মতই। শুনেছি তাঁর দিকে চাইলেই কাঁপুনি আসে। আমাদের নগরপাল দু'বার তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে—তার কাছেই শুনেছি।...

'তা হলে তোমাদের নগরপালের মনে কিছু গোপন উদ্দেশ্য ছিল; তা না হলে কারও চোখের দিকে চাইতে পারবে না কেন? এই বলে তিনি এক টুকরো কাগজে কি যেন লিখে নভতনির হাতে দিয়ে বললেন নতুন শহরের গুদামে গিয়ে কম্বলগুলি দিয়ে আসতে, সেখানে তারা দাম

ফিয়ে দেবে। তিনি আমার হাতে একটি রূপার ডলার দিয়ে বললেন : ‘এটি সম্রাট জোসেফের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে দাও। তার আর তার স্ত্রীর জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে ভুলো না। তোমাদের মত অকপট মনের প্রার্থনাই ভগবান মঞ্জুর করেন। বাড়ি গিয়ে সবাইকেই ব'লো যে সম্রাট জোসেফের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে। এই বলেই তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আনন্দে ভয়ে অভিভূত হয়ে আমরা নতজানু হয়ে বসে রইলাম। জানি না কি করবো। নভতনি আমাকে বকতে থাকে আমি কত আবোল-তাবল কথা বলেছি। সেও বলেছে—যা মনে এসেছে তাই। কে জানতো সম্রাট নিজে এখানে আসবেন। মনে মনে আমরা সান্ত্বনা দিই যে সম্রাট আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হলে কখনই আমাদের পুরস্কার দিতেন না।

‘নভতনি কম্বল নিয়ে গুদামে আসতেই কম্বলের প্রায় তিন গুণ দাম মিললো।’

‘সেদিন আমরা প্রায় ছুটে বাড়ি এলাম। আমাদের আর গল্প বলার শেষ নেই। যাকে পাই তাকেই সেই ঘটনা বলি। মা সেই ডলারটিকে ফুটো ক'রে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। সেই থেকেই সেটি আমার গলায়। অনেক সময়ে অনেক অভাবে পড়েছি, তবু কখনও এটি হাতছাড়া করিনি। হায়! সেই মহানুভব মানুষটি আজ মাটির গভীরে ঘুমিয়ে আছেন!’ এই বলে দিদিমা গল্প শেষ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। ছেলেমেয়েরা ডলারের ইতিহাস শুনে সেটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। দিদিমার সম্ভ্রম বেড়ে যায় তাদের চোখে। দিদিমা সম্রাটের সঙ্গে কথা বলেছেন!

রবিবার বিকাল থেকেই মিলে সপ্তাহের কাজ শুরু হয়। তখন

থেকেই চাষীরা ফসল ভাঙতে নিয়ে আসে। চারদিকে চাকার ঘর্ঘর শব্দ, তার মধ্যে ফোরম্যান্ এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। মজুরেরা ঝুড়ি নিয়ে উপর-নিচ করছে। মিলার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে একটিপ নস্য হাতে নিয়ে হাসিমুখে তার খরিদ্দারদের সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

গ্রীষ্মকালে মিলারের স্ত্রী আর মা'র্চিস্কা দিদিমাকে সরাইখানা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত। ওখানে যেদিন নাচ হতো সেদিন গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তারাও গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে নাচ দেখতো। ভীড়ের জন্য ভিতরে যাওয়া যেত না। ক্রিষ্টিনা বাগানে যারা বসেছে তাদের জন্য বিয়ার নিয়ে আসতো, ভীড়ের জন্য গ্লাসগুলি মাথার ওপর তুলে নিয়ে আসতো হতো।

বাগানের লোকদের দিকে দেখিয়ে মিলারের স্ত্রী বলতো: 'দেখেছেন ওদের? ক্যাসেল থেকে এসেছে ওরা আর কোন না কোন অছিলায় ক্রিষ্টিনাকে আটকে রাখতে চায়। এমন মেয়ে বড় দেখা যায় না। ভগবান না করুন, ওর যেন জীবনটা দুঃখে না কাটে।'

'সে-ভয় করবেন না,' দিদিমা জবাব দিতেন: 'ক্রিষ্টিনা বড় চালাক মেয়ে। সে ওদের কি ক'রে ভাগিয়ে দিতে হয় তা ভালই জানে।'

দিদিমা ঠিকই বলতেন। বাগানের ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন এত গন্ধ মেখেছে যে দশহাত দূর থেকে তা পাওয়া যায়। সে যেন ক্রিষ্টিনার কানে কানে কি বলে। ক্রিষ্টিনা হেসে জবাব দেয়: 'রাখুন আপনার জিনিস, আমার দরকার নেই।' তারপর সে ছুটে নাচের ঘরে গিয়ে এক লম্বা চওড়া যুবকের বলিষ্ঠ হাতখানি ধরে। যুবকটিও তার আর-এক হাতে ক্রিষ্টিনার কোমর ধরে এগিয়ে যায় নাচতে। বাইরে থেকে চিৎকার ভেসে আসে: 'লক্ষ্মী ক্রিষ্টিনা, আর একটু বিয়ার।' ক্রিষ্টিনা সে-কথা কানেও নেয় না।

'ওই ছোকরাই ক্রিষ্টিনার কাছে ক্যাসেল আর তার ধনদৌলতের

চেয়েও প্রিয়,' দিদিমা হেসে বিদায় নিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাড়ির পথে চলেন।

আবহাওয়া ভাল থাকলে দিদিমা বলতেন : 'আজ আমরা শিকার-রক্ষকের ওখানে যাবো।' রওনা হবার আগে পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা চুপ ক'রে থাকতো। বাঁধের পিছনে সাঁকো পর্যন্ত খাড়া পথ—তারপর সেখান থেকে রিসেন্ দুর্গ পর্যন্ত পথের দু'ধারে বড় বড় পপলার গাছের সারি। দিদিমা নদীর ধার দিয়ে মিলের রাস্তাটাই পছন্দ করতেন। করাত কলের পরেই ছিল একটি উঁচু পাহাড়, সেখানে অজস্র মুলি গাছের ঝোপ। করাত কলের পর থেকেই উপত্যকা সরু হতে হতে একেবারে একফালি জলস্রোতে এসে ঠেকেছিলো। সেখানে নদীর স্রোত প্রবল—বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে জলস্রোত বেগে বয়ে যেত। এখানে পাহাড়ের গায়ে সবুজ গাছ—তাদের ঘন পাতার ছায়া পড়তো নিচের উপত্যকায়। এই পথেই দিদিমা নাতি-নাতনীদের নিয়ে রিসেন্ দুর্গে যেতেন। দুর্গের ভগ্নাবশেষ বনের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যেত। দুর্গ থেকে একটু দূরে এক সুরঙ্গের ওপর একটি ছাউনি আর তার তিনটি বড় বড় পুরোনো জানালা। লোকে বলতো এই সুরঙ্গ দিয়ে বারো মাইল হেঁটে যাওয়া যায়, তবে সেখানে এত স্যাঁতসেঁতে যে কেউ কোন-দিন সাহস করেনি। ক্যাসেল থেকে যখন গণ্যমান্যেরা শিকারে যেতেন, তখন প্রায়ই এই ছাউনির তলে এসে তাঁরা দ্বিতীয় বার প্রাতরাশ গ্রহণ করতেন। ছেলেরা এই ছাউনির দিকে চলতো তর তর ক'রে খাড়া পথ দিয়ে। বেচারী দিদিমা বহুকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে দু'ধারে গাছ পাতা ধরে ওপরে উঠে এসে বলতেন : 'এ বাপু আমার সাধ্য নয়।'

ছেলেমেয়েরা তাঁর হাত ধরে ছাউনিতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিত। এখান থেকে চারদিকের শোভা অতি সুন্দর, আর বাতাসও এখানে ঠাণ্ডা। ডানদিকে দুর্গের ভগ্নাবশেষ, তার তলে

ঢালু জায়গা লতাপাতায় ঢাকা। সেখানে একটি ছোট গির্জা। এই নির্জন জায়গায় শোনা যায় শুধু পাখির গান আর জলের কলকল ধ্বনি।

রজনে রিসেন্ দুর্গের শক্তিশালী মেষপালক টিবর-এর গল্প মনে পড়ে যায়। মাঠের পথে তার মনিব তাকে একটি আস্ত গাছ কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে দেখে। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে জঙ্গল থেকে চুরি ক'রে এনেছে। মনিব তার সত্যি কথায় খুশি হয়ে তাকে দুর্গে আসতে বলে। যা কিছু সে একা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে তাই সে পাবে। টিবর এত লোভী যে বাড়ি থেকে ন' খানি বিছানার চাদর নিয়ে এসে তাতে মাংস আর গম বেঁধে নিলে। তার সত্যবাদিতায় ও দেহের বলে সন্তুষ্ট হয়ে নাইট্ তাকে প্রাগে ক্রীড়াযুদ্ধে নিয়ে যায়। সেখানে সে এক জার্মান নাইটকে হারিয়ে দেয়। রাজা খুশি হয়ে টিবরকে নাইট্ ক'রে দেন।

গল্পটি ছেলেমেয়েদের ভাল লাগে।

উইলি জিজ্ঞেস করে : 'ঐ গির্জাটি যেখানে ওর নাম কি দিদিমা ?'

'ও হচ্ছে বাউসিন্' দিদিমা জবাব দেন : 'আমাদের সবার স্বাস্থ্য ভাল থাকলে আমরা একবার ওখানে যাব যখন ওখানে তীর্থের মেলা বসে।'

'কি হয়েছিলো ওখানে দিদিমা ?' আডেল্কা জিজ্ঞেস করে। সারদিন বসে বসে ও গল্প শুনতে পারে।

'ওখানে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিলো। জানিস না তোরা, ভোরসা কি বলেছিলো ?'

'মনে নেই, দিদিমা আর একবার বলোনা।'

'তা বলবো, তবে তোরা চুপ ক'রে বোস। জানালা দিয়ে ঝুঁকিসনা, তা হলে নিচে পড়ে যাবি,' এই বলে দিদিমা গল্প শুরু করতেন।

'এই পাহাড় আর বনের পরে তুরিন্, লিটোবর্ আর বাউসিন্ গ্রাম।

পুরাকালে এ সব ছিল টুরিনস্কি নামে এক নাইটের। তিনি থাকতেন টুরিন্ দুর্গে। নাইটের স্ত্রী আর একটি ছোট মেয়ে—খুব সুন্দরী, কিন্তু হায়, কালা আর বোবা। বাপ মার মনে খুব দুঃখ।···

'মেয়েটি একদিন দুর্গে ঘুরতে ঘুরতে ভাবলো—সে একবার বাউদিনে যাবে। ভেড়ার বাচ্চাগুলি কত বড় হয়েছে, অনেকদিন সে তাদের দেখেনি। সে সময়ে সেখানে গ্রামও ছিল না, গির্জাও ছিল না। সেখানে ছিল শুধু খামার আর খামারবাড়ি। চারদিকে বন আর সেই বনে কত জন্তুজানোয়ার। টুরিনস্কির ছোট মেয়েটি অনেকবার এখানে এসেছে, তবে তার বাবার সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে। এবার খামার সে আর খুঁজে পায় না। ভয় হয় তার। ভাবে, বাবা মা কি ভাববেন আমায় না দেখতে পেয়ে? তখন সে আবার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। ভয় পেলে সবাই দিশেহারা হয়ে পড়ে—বিশেষ ক'রে ছোট মেয়েরা। তার পথ হারিয়ে যায়। দুর্গেও না, খামারেও না, সে এসে হাজির একেবারে বনের মধ্যে। সেখানে না আছে পথ, না আছে দিনের আলো। ছোট মেয়েটি দেখলো সে হারিয়ে গেছে।···

'তখন বুঝতেই পারিস তার মনের অবস্থা। তোরা হলে কেঁদেই ফেলতি। সে তাও পারে না। এদিক ওদিক ছোটাছুটি ক'রে সে আরও দিশেহারা হয়ে পড়ে। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ভয়ে সে এক ঝর্ণার কাছে এসে পড়ে। সেখানে হাঁটু পেতে বসে জল খেয়ে সে দেখে কয়েকটি পথ গিয়েছে সেখান দিয়ে। কিন্তু কোন পথে যাবে সে? বাড়িতে সে দেখেছে আপদে বিপদে মা প্রার্থনায় বসে। সেও সেখানে হাঁটু পেতে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে···"আমায় বন থেকে বাইরে নিয়ে যাও ঠাকুর।"···

'হঠাৎ সে এক অদ্ভুৎ শব্দ শুনতে পায়। শব্দ আরও কাছে ভেসে আসে। এ শব্দ আগে সে কোনদিন শোনে নি—তাই আরও ভয় পেয়ে

যায়। পালিয়ে যেতে যেতে সে দেখে একটি সাদা রঙের ভেড়া তার দিকে আসছে—তার পেছনে আর একটি, তার পেছনে আরও একটি—এমনি ক'রে সেই ঝর্ণার পারে এসে দাঁড়ায় ভেড়ার পাল। এ তাদেরই ভেড়ার পাল, সঙ্গে সাদা কুকুরটি, আর মেষপালক বার্টা। "বার্টা" বলে চিৎকার ক'রে মেয়েটি ছুটে যায়। বার্টাও হারিয়ে-যাওয়া মেয়েটিকে পেয়ে খুশি, আরও খুশি যে সে কথা কইছে। বার্টা তাকে কোলে ক'রে তখনই দুর্গে নিয়ে আসে। নাইটের স্ত্রী মেয়েকে হারিয়ে কাঁদছিলেন। সুস্থ মেয়েকে ফেরৎ পেয়ে তাঁর আনন্দ দেখে কে। তাছাড়া মেয়ে এখন কথা বলতে পারে। বাপ মা দু'জনেই ভগবানের উদ্দেশ্যে এক গির্জা গড়ে দেন। ঐ হচ্ছে সেই গির্জা—বনের মাঝে সেই ঝর্ণাটিও দূরে নয়। সে-মেয়েটি আজ আর বেঁচে নেই। টুরিন্স্কি ও তার স্ত্রীও মারা গেছে, বার্টাও। দুর্গটি ভেঙে গেছে।'

'কুকুরটি আর ভেড়ার পালের কি হয়েছে?' উইলি জিজ্ঞেস করে।

'কেন? কুকুরটিও মরে গেছে। ভেড়াগুলি বুড়ো হয়ে মরে গেছে, তারপর তাদের বাচ্চারা, তাদের বাচ্চারা। এইতো জগতের নিয়ম। এক যায়, এক আসে।'

ছেলেমেয়েরা উপত্যকার দিকে চেয়ে যেন দেখতে পায়। নাইট ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, ছোট মেয়েটি ছুটে বেড়াচ্ছে—এ ছবি যেন তাদের চোখে ভাসে।

সত্যিই এক মহিলা ঘোড়ায় চড়ে আসছেন! তাঁর টুপির সঙ্গে একখানি ওড়না বাতাসে উড়ছে। পিছনে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ।

'দিদিমা, দিদিমা এক নাইটের স্ত্রী ঘোড়ায় চড়ে আসছে,' ছেলে-মেয়েরা চিৎকার ক'রে ওঠে।

'কি বলছিস্ তোরা? নাইটের স্ত্রী কোথায়, এ নিশ্চয়ই ক্যাসেলের রাজকুমারী!'

ছেলেমেয়েরা শুনে হতাশ হয়ে যায় যে এ নাইটের স্ত্রী নয়।

'রাজকুমারী কি এখানে উঠে আসবেন?' সমস্বরে ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করে।

'এখানে ঘোড়া উঠবে কি ক'রে?'

'দেখ দেখ, ঘোড়াটা যেন বিড়ালের মত উপরে উঠছে,' চিৎকার করে ওঠে জন্।

'চুপ কর। আমি দেখতে চাই না। রাজকুমারীদের অনেক সখ।' জবাব দেন দিদিমা। ছেলেমেয়েদের তিনি জানালা দিয়ে উঁকি দিতে বারণ করেন।

অল্পক্ষণেই রাজকুমারী পাহাড়ের ওপর উঠে আসেন। ঘোড়া থেকে নেমে ছাউনিতে এগিয়ে যান। দিদিমা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্ভাষণ জানান।

ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন: 'এরা প্রশেকের ছেলেমেয়ে, না?'

'আজ্ঞে হাঁ,' সসম্মানে দিদিমা জবাব দেন।

'আপনি ওদের দিদিমা?

'আজ্ঞে হাঁ।'

ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে রাজকুমারী বললেন: 'এমনি টুকটুকে নাতি-নাতনীদের নিয়ে আপনি নিশ্চয়ই খুব সুখী। মনে হয় এরা খুব বাধ্য।'

'তা বটে···তবে মাঝে মাঝে···' দিদিমা বলেন: 'আমরাও তো এমনি ছিলাম।'

রাজকুমারী শুনে হাসেন। তারপর সেখানে এক ঝুড়ি ষ্ট্রবেরী দেখে জিজ্ঞেস করেন কোথায় পেয়েছে তারা।

দিদিমা তাড়াতাড়ি বারুঙ্কাকে বললেন: 'যাও, রাজকুমারীকে ফলগুলি উপহার দাও। তাজা ফল, ছেলেমেয়েরা এখানে আসতে আসতে পথে

কুড়িয়ে এনেছে। আপনার ভাল লাগতে পারে। আমি যখন ছোট ছিলাম খুব ভালবাসতাম ষ্ট্রবেরী। তারপর আমার ছেলে মারা যাওয়ার পর আর আস্বাদ নিইনি।'

ঝুড়িটা বারুস্কার হাত থেকে নিয়ে রাজকুমারী জিজ্ঞেস করলেন: 'কেন?'

'আমাদের মধ্যে প্রথা আছে যে ছেলে মারা যাবার পর মা সেণ্টজন্ বাপটিষ্ট-এর উৎসব পর্যন্ত ষ্ট্রবেরী বা চেরী খায় না। সে সময় ভার্জিন মেরী স্বর্গে ছোট ছেলেদের ফল দিতে যান। এর মধ্যে মা যদি এই ফল খেয়ে থাকে তাহলে ভার্জিন তার ছেলের কাছে এসে বলেন: "তোমার ফল তোমার মা নিজে খেয়ে ফেলেছেন।" তাই মা সেণ্টজন্ পর্যন্ত এই ফল খায় না। আমি সেণ্টজন্ পর্যন্তই যদি না খাই তো তা হলে তার পরেও খাবার দরকার কি?'

রাজকুমারী দু' আঙুলে একটি মস্ত ষ্ট্রবেরী তুলে নিলেন। এমনি লাল যেন তাঁর সুন্দর ঠোঁট দুখানির মত। দিদিমার গল্প শুনে তিনি আবার সেটি ঝুড়িতে রেখে দিয়ে বললেন: 'না আমি নেব না, তাহলে ছেলেমেয়েদের জন্য আর কিছু থাকবে না।'

'তাতে কি—আমরা আবার কুড়িয়ে নেব,' বারুস্কা ঝুড়িটা আবার তাঁর হাতে দিল।

ঝুড়িটা নিয়ে রাজকুমারী বললেন: 'ধন্যবাদ তোমাদের ছেলেমেয়ে-দের।' সারল্যে তিনি হেসে বললেন: 'কাল ক্যাসেলে এসে ঝুড়িটি নিয়ে যেও। আর তোমাদের দিদিমাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। মনে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই,' ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে বলে ওঠে। এ যেন তাদের মিল-এ যাবার জন্য মিলারের স্ত্রীর নিমন্ত্রণ। দিদিমা আপত্তি জানাতে যান। তবে বড় দেরী হয়ে যায়। রাজকুমারী ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে হেসে দিদিমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বনের মধ্যে যেন ছায়ার মত অদৃশ্য হয়ে যান।

'দিদিমা, দিদিমা, কি মজা! আমরা ক্যাসেলে যাবো। বাবা বলেন, কত সুন্দর সুন্দর ছবি আছে সেখানে,' বারুক্কা আনন্দ চেপে রাখতে পারে না।

হাততালি দিয়ে জন্ বলে ওঠে : 'ওখানে একটি কাকাতুয়া আছে, কথা বলতে পারে!'

আডেলকা বলে : 'আমি কি এই জামা পরে যাবো?'

'কি ছিরি হয়েছে তোর জামার? কি করেছিস্?' দিদিমা গায়ে ক্রুশ এঁকে দেন।

ছোট মেয়েটি জবাব দেয় : 'আমি কি করবো? জন্ আমাকে ধাক্কা দিয়ে ষ্ট্রবেরীর ওপর ফেলে দিয়েছে—'

'তোরা দুটিতে সব সময়ই ঝগড়া করিস। রাজকুমারী ভাববেন কি বলতো? আর একবার আমরা যাই, না হলে শিকার-রক্ষকের ওখানে যেতে পারবো না। তোরা যদি ঝগড়া মারামারি করিস্ তাহলে আর কখনও তোদের নিয়ে আসবো না।'

তারা আশ্বাস দেয়—ভাল হয়ে থাকবে।

যেতে যেতে দিদিমা বলেন : 'দেখা যাবে ওখানে গিয়ে।' ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শিকার-রক্ষকের সাদা বাড়িটি দেখা যায়। বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড উঠোন—লিনডেন্ আর চেষ্টনাট্ গাছের ছায়ায় ঢাকা। গাছের নিচে থানকয়েক ছোট টেবিল ও বেঞ্চ। একফালি সবুজ মাঠের ওপর কয়েকটি ময়ূর নেচে বেড়াচ্ছে। দিদিমা বলতেন, ওদের পাখাগুলিতে স্বর্গের শোভা, ওদের নাচ যেন চোরের মত আর গলার স্বর শয়তানের মত। ময়ূরগুলির কাছেই একপাল গিনিমুরগী, আর সাদা খরগোশ, তারা কান খাড়া ক'রে আছে কিছু শব্দ শুনলেই ছুটে পালাবে। দরজায় একটি সুন্দর হরিণের বাচ্চা। আশে পাশে কয়েকটি কুকুর। ছেলেমেয়েদের সাড়া পেয়েই কুকুরগুলি ডেকে উঠে

ছুটে আসে। হরিণটিও আডেল্‌কার কাছে এসে চোখ তুলে চেয়ে থাকে—যেন জিজ্ঞেস করে: 'ও তুমি! আমার জন্য কি এনেছো?' আডেল্‌কা যেন তার ভাষা বুঝতে পারে, তাই পকেট থেকে এক টুকরো রুটি বের ক'রে হরিণটিকে দেয়। সেও সবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে আসে।

বাড়ির ভিতর থেকে শোনা যায় পুরুষের গলা: 'কি হচ্ছে তোদের এখানে? যত সব জানোয়ার!' তার পরই শিকার-রক্ষক বেরিয়ে আসে।

'আসুন, আসুন!' দিদিমা ও ছেলেমেয়েদের দেখে সে বলে ওঠে: 'হেকটর্‌, ডিয়েনা, আমিনা চুপ কর। তোদের চিৎকারে কি কিছু শোনার উপায় আছে?' এই বলে হাতের বেতখানি সে তাদের দিকে দোলায়।

সবাই বাড়ির মধ্যে আসে। দরজার ওপরে একজোড়া হরিণের শিং। ঘরের দেওয়ালে কয়েকটি বন্দুক—তবে এত ওপরে ঝুলছে যে ছেলেমেয়েদের নাগালের বাইরে। দিদিমার সব সময়ই বন্দুকের ভয়। শিকার-রক্ষক যদিও বলে 'ওতে গুলি নেই,' দিদিমা বলেন: 'কি জানি, বিশ্বাস কি?'

ঘরে কাউকে না দেখে দিদিমা জিজ্ঞেস করতেন: 'আপনার স্ত্রী কোথায়?'

'বসুন আপনারা, আমি তাকে ডাকছি।'

ছেলেরা শিকার-রক্ষকের ছুরি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের আলমারির দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েরা হরিণটিকে নিয়ে খেলা করে। দিদিমা ঝক্‌ঝকে ঘরখানির দিকে তাকিয়ে বলেন: 'রবিবারই হোক, আর শুক্রবারই হোক, ঘরখানি কিন্তু কাঁচের মত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।' হঠাৎ উনুনের কাছে শনের সুতোর ওপর তাঁর নজর পড়ে। দিদিমা মন

দিয়ে সুতো দেখছেন এমনি সময়ে ঘরের দরজা খুলে গৃহকর্ত্রী প্রবেশ করলেন।

মহিলার বয়স অল্প। ঘরের পোশাক আর সাদা টুপিতে তাঁকে বেশ লাগছে দেখতে। আন্তরিক সম্ভাষণ তাঁর মুখে ভেসে ওঠে। 'আমি কাপড় কাচছিলাম। এ বছর ভালই হবে মনে হয়—প্রায় কেমব্রিক-এর মতই সাদা হবে,' এই বলে গৃহকর্ত্রী তাঁর অনুপস্থিতির জন্য মাপ চান।

দিদিমা বলেন: 'কি পরিশ্রম আপনার! একদিকে কাপড় কাচা, আর-একদিকে সুতো একেবারে তৈরি। এ সুতোয় কাপড় হবে ঠিক কাগজের মত, তাঁতী যদি আপনাকে ঠকিয়ে না দেয়। আপনার তাঁতীর কাজ কেমন?'

'ওরা তো সবাই চোর।'

'উঁহু, উঁহু তাঁতী কি ক'রে ঠকাবে? সুতোর হিসেব না নিয়ে ছাড়বেন না, তা হলেই তো বুঝতে পারবেন।

শিকার-রক্ষক হেসে ওঠে। 'আপনি বসুন দিদিমা।' দিদিমা তখনও দাঁড়িয়ে সুতো দেখে তার তারিফ করছিলেন।

'ব্যস্ত হবেন না, আমি মোটেই পরিশ্রান্ত নই,' দিদিমা জবাব দিতে দিতে ছোট্ট মেয়েটার হাত ধরেন যেন পড়ে না যায়। সবে হাঁটতে শিখেছে সে।

চৌকাঠের ওপর দুটো ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে। রোদেপোড়া রং, একজনের মায়ের মত মাথায় সোনালী চুল আর-একজনের বাপের মত কাল। মায়ের সঙ্গে তারা আসছিল। মা দিদিমার সঙ্গে কথা বলছেন দেখে তারা মুখ বুঁজে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

বাপ বলে: 'বাড়িতে যখন লোক এসেছে, তোরা তখন মার ঘাগরার আড়ালে লুকিয়ে থাকবি কেন। আয় সকলের সামনে আয়।'

তারা এগিয়ে এল। দিদিমা তাদের হাতে আপেল দিয়ে

বললেন : 'এমন লাজুক কেন গো তোমরা? ছেলেদের কি কখনও মায়ের আঁচলের নিচে লুকিয়ে থাকতে আছে?'

ছেলেরা চুপ ক'রে থাকে। তাদের নজর তখন আপেলের ওপর।

'এবার তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সেই শিংওয়ালা পেঁচাটি দেখাও গিয়ে। ওদের কুকুরছানা দেখাতে ভুলো না কিন্তু।'

শেষের কথাটি ছেলেদের কানে গেল না। 'দেখাও গিয়ে' শুনেই ওরা ঘর ছেড়ে সবাই ঝড়ের মত বাইরে বেরিয়ে গেল।

হেসে শিকার-রক্ষক বলে : 'উঃ কি দুরন্ত!'

'ছেলেরা দুরন্ত হবে না তো কি? ছেলেমানুষ সব,' দিদিমা সায় দেন।

ওদের মা বলেন : 'ওরা যদি এমনি দুরন্ত না হতো! সত্যি বলছি, দিদিমা—মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়। গাছে চড়ে, লাফিয়ে ডিগবাজী খেয়ে প্যান্ট ছেঁড়ে—কি আর বলবো? এই মেয়েটি সত্যি খুব লক্ষ্মী।'

'তাতো হবেই। ছেলেরা বাপের মত আর মেয়েরা মায়ের মতই হয়।' দিদিমা বলেন।

মা বাচ্চাটিকে বাপের কোলে দিয়ে যেতে যেতে বলেন : 'আমি এখনই আসছি—শুধু একটু কিছু খাবার নিয়ে আসি।'

গৃহকর্ত্রী খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসেন। ওক টেবিলটির ওপর সাদা কাপড় বিছানো হয়েছে। তার ওপর পোড়া মাটির প্লেট, হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া ছুরি। আর ষ্ট্রবেরী, ক্রীম, কেক্, মধু, মাখন, রুটি আর বিয়ার।

দিদিমার হাত থেকে টেকোটি নিয়ে গৃহকর্ত্রী বলেন :

'এবার রাখুন সুতো কাটা, আসুন। রুটি কেটে নিন। মাখন একেবারে টাটকা, আজই করেছি। কেকগুলি ভাল হয়নি। তাড়াতাড়ি

ভেজেছি তবে কখনও কখনও অসাবধানে করা জিনিসও সুস্বাদু হয়ে যায়। আপনি তো ষ্ট্রবেরী খান না। ছেলেরা কিন্তু খুব ভালবাসে, বিশেষ করে ক্রীম দিয়ে।'

হঠাৎ কি একটা মনে হতেই দিদিমা নিজের মাথায় ঘা দিয়ে বলেন : 'কি ভুলো মন আমার! আপনাকে বলতেই ভুলে গেছি যে আজ রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'দিদিমা, একটু দাঁড়ান, এখন বলবেন না। আমি ছেলেমেয়েদের ডেকে আনি।'

ওদের ডেকে ফিরে এলেন গৃহকর্ত্রী। দিদিমা শুরু করলেন রাজকুমারীর গল্প।

'তাইতো বলি ওঁর অন্তরটি খুব ভাল,' শিকার-রক্ষকের স্ত্রী বলে ওঠেন : 'যখনই উনি এখানে আসেন, ছেলেমেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করেন। বাচ্চাটার কপালে চুমো খান। ছেলেমেয়েদের যারা ভালবাসে তারা কখনই খারাপ হতে পারে না। শুধু ওঁর চাকরবাকরেরা যত সব গুজব রটায় যেন উনি কত খারাপ।'

'খারাপ লোকের ভাল করলে সে প্রতিদানে খারাপই করবে,' মন্তব্য করেন দিদিমা।

'ঠিক বলেছেন আপনি,' শিকার-রক্ষক বলে ওঠে : 'আমিও সেই কথাই বলি। ওর চেয়ে ভাল মালিক আশা করা যায় না, তবে ওঁর যত ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী আছে, ওরাই মিথ্যাকথা ব'লে আমাদের ওপর ওঁকে রুষ্ট করে। রাগ হয় আমার, যে এরা আমার চেয়েও বেশী রোজগার করে। সব কর্মচারীরা যখন আমার সামনে নাক উচু করে এসে দাঁড়ায় তখন মনে হয়—যাক, বিরক্ত হয়ে লাভ কি?' এই বলে শিকার-রক্ষক এক গ্লাস পানীয় নিয়ে তার বিরক্তি গলাধঃকরণ করে।

'এসব খবর রাজকুমারী জানেন না? সাহস ক'রে কেউ তাঁকে সব বলে না কেন?' দিদিমা জিজ্ঞেস করেন।

'আগুনে হাত দেবে কে? মাঝে মাঝেই ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়। ভাবি সব বলে দিই। আবার মনে হয়, কি দরকার আমার? আমার ওপরই সব চাপ এসে পড়বে। তাছাড়া আমায় বিশ্বাস করবেন কেন তিনি? জিজ্ঞেস করবেন আমার উপরকার কর্মচারীদের। তখন? তারা এক জোট হয়ে আমায় বিপদে ফেলবে। কদিন আগে রাজকুমারী এসেছিলেন বন-ভ্রমণে। আমি তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। রাজকুমারীর সঙ্গে ছিল সেই নবাগত ব্যক্তিটি যে এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ওদের সঙ্গে ভিক্টোরকার দেখা। সে রাজকুমারীকে ভয় দেখিয়েছে। ওঁরা আমায় ভিক্টোরকার কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললাম ও পাগলী, তবে কারও কোন ক্ষতি করে না।'

'ওঁরা তখন কি বললেন?'

'ওঁরা তখন ঘাসের ওপর বসলেন। ভদ্রলোক বসলেন রাজকুমারীর পায়ের কাছে। তারপর আমায় বলতে বললেন ভিক্টোরকার কাহিনী, কি ক'রে সে পাগল হলো।'

'আর তুমিও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলে। তাই না!' স্ত্রী হেসে ওঠে।

'সুন্দরী স্ত্রীলোকের কথা কে ফেলতে পারে বলো? রাজকুমারী অবশ্য আজ আর যুবতী নন, তবে এখনও তিনি সুন্দরী।'

'তা বই কি। আজ দু'বছর আমার এখানে হয়ে গেল। আপনি আমায় কথা দিয়েছিলেন ভিক্টোরকার কাহিনী বলবেন। আজও তা বললেন না। আমি সুন্দরীও নই, আর হুকুমও দিতে পারি না। তাহলে আর আমার জানার কোন উপায় নেই।'

'দিদিমা আপনি আমার কাছে জগতের সুন্দরী স্ত্রীলোকের চেয়েও

অনেক প্রিয়। আপনি শুনতে চাইলে আজ এখনই সে-কাহিনী আপনাকে বলছি।'

হেসে দিদিমা বলেন : 'আপনার স্বামী কথায় ওস্তাদ !'

দরজায় দাঁড়িয়ে বার্টি বলে : 'মা আর ক'খানি রুটি দাও। আমাদের রুটি ফুরিয়ে গেছে।'

'এত রুটি গেল কোথায় ?' দিদিমা আশ্চর্য হয়ে যান।

রুটি কাটতে কাটতে মা বলে : 'অর্ধেক ওরা খেয়েছে আর অর্ধেক কুকুর, হরিণ, কাঠবিড়ালি—এদের বিলিয়েছে। এই তো ওদের স্বভাব।'

শিকার-রক্ষক তার পাইপে তামাক ভর্তি করে।

'আমার স্বামীও গল্প বলার আগে তাঁর পাইপটি ভরে নিতেন।' বলতে বলতে দিদিমার মুখখানি অতীতের এক মধুর স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

'এ কিন্তু খারাপ অভ্যাস। তবে পুরুষ মানুষের যা স্বভাব।' স্ত্রী অনুযোগ করে।

'তুমিই তো আমার জন্য তামাক আনো। তবে আবার নালিশ কেন ?' পাইপ ধরিয়ে স্বামী জবাব দেয়।

'তবে এবার শুনুন—' পাইপের ধোঁয়ার দিকে চেয়ে, চেয়ারে ভাল ক'রে বসে শিকার-রক্ষক ভিক্‌টোরকার গল্প আরম্ভ করে।

পাঁচ

'ছেরনভের এক চাষীর মেয়ে ভিক্‌টোরকা। তার বাপ-মা অনেক-দিন মারা গেছে, এক ভাই ও এক বোন আজও বেঁচে আছে। পনের বছর আগেকার কথা। তখন ভিক্‌টোরকা কুমারী। স্ট্রবেরীর মত টুকটুকে, হরিণীর মত ছটফটে আর মৌমাছির মত পরিশ্রমী।

আশে পাশের কোন গাঁয়েই তার মত আর একটি মেয়েরও দেখা মিলত না। সবাই ভাবে এমনি একটি মেয়ে যদি ঘরের বৌ হয়ে আসে! পণ দিয়ে যে মেয়েকে লোকে নিয়ে যেতে চায় তার খবর তো আর বেশীদিন চাপা থাকে না। ভিক্‌টোরকার সৌন্দর্যের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ঘন ঘন ঘটক আসে বাড়িতে। কোন কোন পাত্রকে বাপ ম. দু'জনেরই পছন্দ হয়। কেউ বা অবস্থাপন্ন চাষী—কথায় বলে না, 'কনের কান্তি আর গোয়ালের গোরু।' কিন্তু ভিক্‌টোরকা তা গ্রাহ্যই করে না। এ মেয়ে বরমাল্য দেবে তাকে যে নাচতে পারে প্রাণ মাতিয়ে।

'বাপ কিন্তু মেয়ের এই আচরণে একটুও সন্তুষ্ট হলেন না। বাপ মেয়েকে ভয় দেখালেন যে তিনি নিজে এক পাত্র পছন্দ ক'রে জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দেবেন। মেয়ে তখন কেঁদে অনুনয় করতে থাকে যে বাবা যেন তাকে এমনি ক'রে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে না দেয়। কি বা তার বয়স! সবে কুড়ি, এখনও বিয়ের কত সময় পড়ে আছে। কটা দিন একটু আমোদ আহ্লাদ ক'রে বেড়াবে। তারপর বিয়ের পর ভগবানই জানেন কপালে কি আছে। বাপ মেয়েকে ভালবাসতেন—তাই মেয়ের কথা শুনে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন : সত্যিই বিয়ের বয়স হয় নি ওর। এ মেয়ের পাত্রের অভাব হবে না কোনদিন। লোকে কিন্তু অন্য কথা বলতো—ভিক্‌টোরকার ভারী দেমাক—ও অপেক্ষায় আছে কেউ গাড়ি হাঁকিয়ে এসে ওকে নিয়ে যাবে। অহংকারের মার হবেই হবে, যে বেশী অপেক্ষা করে তার কপালে আর ভাল কিছু জোটে না।

'গ্রামে তখন সৈন্যদের এক ছাউনি বসেছিলো। তাদের একজন ভিক্‌টোরকার পিছু নিলে। ভিক্‌টোরকা যখন গির্জায় যায় সেও ওর পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। ভিক্‌টোরকা যখন মাঠে ঘাস কাটতে যায়, আশেপাশে কোথাও সেই সৈন্যটি দাঁড়িয়ে থাকে। এককথায় সে ছায়ার মত ভিক্‌টোরকাকে অনুসরণ করে।

লোকে বলতো তার মাথার ঠিক ছিল না। ভিক্‌টোরকার সামনে তার কথা উঠলেই ভিক্‌টোরকা বলতো, ও আমার পিছু নিয়েছে কেন? লোকটা একটি কথাও বলে না। ওকে দেখে আমার ভয় করে। আশে পাশে ওকে দেখলেই আমার গা কেঁপে ওঠে আর ওর চোখের দিকে চাইলেই আমার মাথা ঘুরে যায়।···

'আর সেই চোখ। সবাই বলতো অমঙ্গলের চাউনি; রাতে যেন কয়লার মত জ্বলে। কাল জোড়া ভ্রূ যেন কাকের পাখার মত চোখ দুটিকে ঢেকে রেখেছে। এই থেকেই সকলের বদ্ধধারণা হলো যে তার চোখে বশীকরণের অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। কেউ কেউ বলতো, জন্ম থেকেই বলে কেউ কেউ এই রকম হয়। তাছাড়া এ চোখে নাকি সবার ক্ষতি করতে পারে না। পারে শুধু কারোর কারোর। তবু গাঁয়ের ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে সেই লোকটা তাকালেই মা তাদের মুখ সাদা কাপড় দিয়ে মুছে দিত। কারও অসুখ করলেই সবাই খোঁজ করতো কাল সৈন্যটি তার দিকে চেয়েছে কিনা। ক্রমে ক্রমে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেল। কেউ জানে না সে কোথা থেকে এসেছে। মানুষের মত মনেই হয় না যেন লোকটাকে। সে কাছে এলেই তারা মনে মনে বলে, ভগবান একে বিদায় ক'রে দাও। কেউ তাকে কোনদিন নাচতে, গাইতে এমন কি কথা বলতেও শোনে নি। তাই সবাই তাকে দূরে দূরে রাখে।

'বাইরে যেতেও ভিক্‌টোরকার ভয়, পাছে সেই চোখ দুটি ওর দিকে চেয়ে থাকে। নাচতেও ভাল লাগে না—ও জানে সেই চোখ দুটি কোথাও-না-কোথাও ওর দিকে চেয়ে আছে। দল বেঁধে সুতো কাটতেও যায় না ভিক্‌টোরকা আজকাল, কারণ সেই কাল সৈন্যটির মুখখানি দেখেই ওর গলার স্বর বন্ধ হয়ে যায়। যাতনায় কাতর হয়ে পড়ে ও। সবার নজরেই তা পড়ে, তবে এ যে সেই কাল সৈন্যটির জন্য, তা কেউই বোঝে না। তারা ভাবে ভিক্‌টোরকাই লোকটাকে তার পিছু

নিতে দিয়েছে, কারণ ও বারণ করে নি কেন? ভিক্‌টোরকা তার বান্ধবীদের বলতো, দেখ, সত্যি বলছি, আমায় ভিন গাঁয়ের কেউ যদি এখন বিয়ে করতে চায়, গরীবই হোক আর বড়লোকই হোক, সুশ্রী বা কুৎসিৎই হোক, আমি রাজী হয়ে যাই।

'কি হয়েছে তোর? ঝগড়া করেছিস বুঝি বাড়িতে যে আমাদের সবাইকে ছেড়ে যেতে চাস্?

'তা নয়। ওই সৈন্যটি যখন আমার পিছু নেয় আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। এ আমার এক ভীষণ যাতনা। রাতে ঘুমুতে পারি না—ভগবানকে পর্যন্ত মন থেকে ডাকতে পারি না। লোকটার ভীষণ চোখ দুটি সব সময়েই আমাকে অনুসরণ করে, বলতে বলতে ভিক্‌টোরকা কেঁদে ফেলে।

'তুই ওকে বলে দিস না কেন—ও যেন তোর পিছু না নেয়।

'আমি ওর সঙ্গে কথাই বলি না। কথা বলবো কি ক'রে, ও সর্বদাই আমার পেছনে ছায়ার মত লেগে আছে। তবে ওর এক সঙ্গীকে দিয়ে আমি বলে পাঠিয়েছিলাম।

'কি বলে লোকটা? সবাই জিজ্ঞেস করে।

'ও বলে, ও কোথায় যাবে বা না-যাবে তা প্রশ্ন করার অধিকার কারও নেই। তাছাড়া ও তো এখনও বলেনি যে আমায় ভালবাসে—।

'কি বেয়াদব! মেয়েরা ভ্রূকুটি ক'রে ওঠে। কি ভেবেছে ও? ওকে ঠেঙানি দেওয়া দরকার।

'ছেড়ে দে ওকে। ও হয়তো কাউকে যাদু ক'রে বসবে। মেয়েদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমতী তারা বলে।

'ওঃ! ও আমাদের কি করবে। যাদু করতে হলে ওর আমাদের গায়ের ছোঁয়া জামা চাই। তা আমরা ওকে কখনই দেবো না আর ওর হাত থেকেও কিছু নেবো না। তাহলে আর ভয় কি?

ভিক্টোরকা তোর ভয় নেই। আমরা সবসময়ই তোর সঙ্গে সঙ্গে যাবো। বন্ধুরা ওকে সাহস দেয়।

'ভিক্টোরকা ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকায়। সাহস পায় না ও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে : ভগবান আমায় এ বিপদ থেকে বাঁচাও।

'বান্ধবীদের কাছে বলা ভিক্টোরকার মনের কথা চাপা রইলো না। গ্রামের সবাই শুনলো। পাশের গ্রামেও পৌঁছে গেল।

'কদিন পরেই পাশের গ্রাম থেকে এক সুসজ্জিত ভদ্রলোক এসে হাজির ভিকটোরকাদের বাড়ি। একথা-ওকথা বলার পর তিনি কথা পাড়লেন যে তাঁর প্রতিবেশী ছেলের বিয়ে দিতে চায় আর ভিক্টোরকাকে খুব পছন্দ। তিনি তাই ঘটকালি করতে এসেছেন।

'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রথমে মেয়েকে জিজ্ঞেস করি। আমি যতদূর জানি সিমন্ ও তার ছেলে এণ্টন্-এর বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। এই বলে ভিক্টোরকার বাবা বাড়ির মধ্যে গেলেন মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে।

'ভিক্টোরকা শুনেই রাজী হয়ে গেল।

'বাপ আশ্চর্য হয়ে গেলেন এত তাড়াতাড়িতে মেয়ের মত পেয়ে। তাই আবার মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন এণ্টনকে সে জানে কিনা। তাড়াতাড়ি কিছু নেই, ধীরে সুস্থে মন ঠিক করবার উপদেশ দিলেন। মেয়ের কিন্তু একমত। বলে সে এণ্টনকে ভালভাবেই জানে আর সে বেশ ভাল ছেলে।

'ভাল কথা, বাপ খুশি হয়ে বলে : তোমার যখন মত আছে তখন ভগবানের নাম ক'রে ওদের আসতে বলি।

'মা এসে ভিক্টোরকার মাথায় ক্রুশ চিহ্ন ক'রে তাঁর আনন্দ জানান : সবচেয়ে আমার আনন্দের কথা যে তোর সংসারে শাশুড়ী বা জা কেউই নেই। তুই হবি সংসারের কর্ত্রী।

'মা, ও-সংসারে তুই শ্বাশুড়ী থাকলেও আমি ওখানেই বিয়ে করবো।

'তুই যা ভাল মনে করিস্—মা জবাব দেন।

'তা নয় মা। যে কোন লোককেই আমি এখন বিয়ে করতে রাজী হয়ে যেতাম।'

'সে কি! কি হয়েছে তোর? কি ভাবছিস্ তুই? এত লোককে ফিরিয়ে দিয়েছিস—!

'তখন তো ঐ সৈন্যটা তার ভীষণ চোখ দুটি নিয়ে আমার পিছু নেয়নি,' ভিক্টোরকা কেঁদে বলে ওঠে।

'তোর এত ভয় কিসের? ঐ সৈন্যটির জন্য তোর কি? ও তোর কি করবে? ওর যা খুশী করুক না। তোকে তো আর ও বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

'কিন্তু মা, শুধু ঐ সৈন্যটি। আমার মনের কষ্ট, দুঃখ যাতনা তুমি জানো না। কি অস্বস্তি আমার! আমার মনে এতটুকু শান্তি নেই। ভিক্টোরকা ফুঁপিয়ে ওঠে।

'তুই আমাকে আগে বলিসনি কেন? আমি তোকে কামার বৌ-এর কাছে নিয়ে যেতাম। এসব রোগের ওষুধ ও জানে। যাক্, কাল তোকে নিয়ে যাবো। মা মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়।

'পরের দিন মা-মেয়ে বুড়ি কামার বৌ-এর কাছে যায়। লোকে বলতো বুড়ি অনেক কিছু জানে যা অন্য কেউ জানে না। কারও কিছু হারিয়ে গেলে, গরুর দুধ কমে গেলে, বা কেউ যদি কারও মন না পেয়ে থাকে তাহলে বুড়ি তার উপায় বাতলে দিত। ভিক্টোরকা বুড়িকে সব কথা খুলে বলে।

'তুই তার সঙ্গে কখনও কথা বলিস নি? একটি কথাও না? বুড়ি জিজ্ঞেস করে।

'না, একটি কথাও না।

'ও কখনও তোকে কিছু দেয়নি বা অন্য কোন সৈন্যের হাত দিয়ে খাবার কিছু, যেমন আপেল বা মিষ্টি, পাঠিয়ে দেয়নি ?

'কখনও না। অন্য সৈন্যদের সঙ্গে লোকটার কোন সম্বন্ধই নেই। ওরা বলে, লোকটা এত দাম্ভিক যে সারা জীবনই ও একা একা থাকে।

'ও সত্যিকারের একটি রাক্ষস—কামার বৌ আশ্বস্ত হয়ে জবাব দেয় : তবে ভয় করিস না ভিক্‌টোরকা। আমি তোকে ভাল ক'রে দেব। এখনও বিশেষ কিছু হয় নি। কাল তোকে আমি একটা জিনিস এনে দেবো। তুই সব সময়ই সেটা তোর সঙ্গে রাখবি। সকালে ঘর থেকে বেরিয়েই গায়ে পুণ্যজল ছিটিয়ে দিয়ে মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবি 'আমায় ভাল করো—অমঙ্গল দূরে যাক।' যখন মাঠে যাবি, কখনও ডানে বা বাঁয়ে চেয়ে দেখবি না। সেই সৈন্যটি তোকে কিছু বললেও না। গলার স্বরেই সে তোকে যাদু করতে চেষ্টা করতে পারে। তখন তোর দু'হাত দিয়ে কান বন্ধ ক'রে রাখবি। এ কথা ভুলিস না। কয়েকদিনের মধ্যে যদি ভাল না হয়ে যাস তাহলে আবার অন্য চেষ্টা করবো। তবে আবার এখানে আসতে যেন ভুলে যাসনে।...

'মনের আনন্দে ভিক্‌টোরকা বাড়ি ফিরে এল। ও ভাবে আবার আগের মত মনের আনন্দ ফিরে পাবে।

'পরের দিন কামার বৌ কি একটা নিয়ে এসে, লাল কাপড়ে জড়িয়ে, নিজের হাতে মেয়েটির গলায় বেঁধে দিলে। সাবধান ক'রে দিল সে যেন কখনও তা খুলে না ফেলে বা কাউকে না দেখায়। সন্ধ্যায় ভিক্‌টোরকা যখন মাঠে ঘাস কাটছে, ওর মনে হয় কে যেন গাছের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ লাল হয়ে ওঠে, একবারও চারদিকে চেয়ে দেখল না। কাজ সেরে ও ছুটে বাড়ি এল—যেন কেউ ওর পিছু তাড়া করেছে।

'তৃতীয় দিন রবিবার। মা মিষ্টি রুটি কোলাচ্ ভাজছে। বাবা

গিয়েছেন গ্রামের স্কুল-মাষ্টার ও আর কজন প্রবীণ প্রতিবেশীদের বিকালে নিমন্ত্রণ করতে। গ্রামের লোকেরা একজোট হয়েছে বলছে—মিখেসদের বাড়িতে আজ বিয়ের আশীর্বাদ।

'বিকেলে তিন ভদ্রলোক এলেন। বিশুদ্ধতার চিহ্ন স্বরূপ দু'জনের জামার হাতে সবুজ পাতা সমেত ছোট ডাল। গৃহস্বামী দরজায় এসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। চাকরেরা বলে উঠল: ভগবান আপনাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

'ভগবান মনোবাসনা পূর্ণ করুন—বর ও তার বাপের হয়ে তৃতীয় ব্যক্তি মন্তব্য করেন।

'সবার শেষে বর ঘরে আসে। বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েরা বলে ওঠে: বাঃ সুন্দর ছেলে তো এণ্টন্! কেমন হরিণের মত মাথা উঁচু ক'রে চলেছে! আশীর্বাদের মালা তার হাতে। একজন বলে: সত্যিই! মাথা উঁচু হবে না কেন, যখন গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে সে নিয়ে যেতে এসেছে। তাছাড়া মেয়েটি সবচেয়ে ভাল নাচিয়ে, ঘরের কাজও বেশ জানে আর অবস্থাও ভাল।

'কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হয় ভিক্টোরকার ওপর, ভিন গাঁয়ের ছেলেকে সে পছন্দ করেছে ব'লে। কেন? এ গ্রামে কি ওর উপযুক্ত কেউ ছিল না? কি দরকার ছিল এত তাড়াতাড়ির? এ ব্যাপারে এমনি কথাই হয়ে থাকে। সন্ধ্যার আগেই বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। স্কুল-মাষ্টার লিখলেন, বাপ মা আর সাক্ষীরা তাতে নাম সই ক'রে পাশে পাশে তিনটি ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিলেন। ভিক্টোরকা এণ্টনের সাথে করমর্দন ক'রে কথা দিল যে তিন সপ্তাহের মধ্যে সে তার স্ত্রী হবে। পরে বান্ধবীরা এসে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। ভিক্টোরকা যেখানেই যায় সবাই বলে ওঠে: কনে তোমার মঙ্গল হোক। (বোহিমিয়াতে আশীর্বাদের পরই মেয়েকে কনে বলা হয়। গ্রামের

ছেলেরা যখন ওকে বলে: ভিক্টোরকা তুমি আমাদের ছেড়ে চললে—শুনে ওর চোখে জল আসে।

'কয়েকদিন বেশ মনের সুখে ওর কাটে। গ্রাম ছেড়ে যাবে ও আর ওর আগের মত মনে ভয় নেই। কামার বৌ ওর গলায় যেটি বেঁধে দিয়েছিলো সেটি তখনও রয়েছে। মনে মনে ও বুড়িকে আর ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় ওকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু ওর মনের এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী।

'একদিন সন্ধ্যায় ও বাগানে এণ্টনের সঙ্গে বসে আছে। বিয়ে ও ঘরসংসারের কথাবার্তা বলছে। হঠাৎ ভিক্টোরকা থেমে গেল সামনের একটি ঝোপের দিকে চেয়ে। ওর হাত কেঁপে উঠলো।

'কি হলো গো? আশ্চর্য হয়ে এণ্টন্ জিজ্ঞেস করে।

'দেখ সামনের ঐ দুটি ডালের মধ্যে দেখতে পাচ্ছো না কিছু? ও ফিস্ ফিস্ করে।

'এণ্টন্ তাকিয়ে বলে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না তো সে।

'আমার মনে হয় যেন সেই কাল সৈনিকটি আমাদের দেখছে।

'দাঁড়াও এর ব্যবস্থা আমি করছি—এই বলে এণ্টন্ ছুটে গিয়ে চারদিক খুঁজেও কিছু দেখতে পেল না। আর-একবার হলে আর এমনি ক'রে পালিয়ে যেতে দেবে না। এণ্টন রেগে বলে।

'এণ্টন্ তোমায় অনুরোধ করছি, ওর সঙ্গে ঝগড়া করো না। সৈন্যরা সৈন্যদের মতই। বাবা নিজে রেড্‌হুরাতে গিয়ে এক অফিসারকে কিছু দিতেও রাজী হয়েছিলেন যদি ঐ সৈনিকটিকে আমাদের গ্রাম থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু অফিসার বলে যে সে পারবে না, ইচ্ছে থাকলেও পারবে না। তাছাড়া কেউ যদি শুধু একটি মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে তাতে আর এমন দোষের কি? বাবা শুনেছিলেন যে এই সৈনিকটি নিজের ইচ্ছায় পণ্টনে ভর্তি হয়েছে এবং যেহেতু সে খুব ধনী পরিবারের ছেলে,

ইচ্ছেমতই সে এই দল ছেড়ে চলে যেতে পারে। ওর সঙ্গে ঝগড়া করলে তোমার ভাল হবে না। ভিক্‌টোরকার কথা শুনে এণ্টন্‌ কথা দেয় যে সৈন্যটির সঙ্গে সে ঝগড়া করবে না।

'সেদিন সন্ধ্যা থেকেই ভিক্‌টোরকা আবার বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যত বিশ্বাসভরেই ও কামার বৌ-এর দেওয়া গলার জিনিসটি বুকে চেপে ধরে, সেই সৈনিকের চোখ দুটির কথা মনে আসতেই ওর বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে। কামার বৌ-এর কাছে ও ছুটে গিয়ে বলে— জানি না ভগবান আমায় এমন শাস্তি কেন দিয়েছেন। তুমি যা দিয়েছিল তাতে কোন কাজই হচ্ছে না—

'তাই নাকি, বোশ, আমি এবার তোকে আর-একটি জিনিস দেবো। ও যতই ধর্মবিরোধী হোক না কেন, দেখি ও কি করে। কিন্তু প্রথমে দুটি জিনিস চাই আমার। তা পাবার আগে তোকে ওর কাছ থেকে এড়িয়ে চলতে হবে। তোকে প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনা করতে হবে সেই সব আত্মার জন্য যাদের হ'য়ে কেউই প্রার্থনা করে না। এমনি একটি আত্মা এসেই তোকে সাহায্য করবে।

'কিন্তু এ বড় কঠিন কাজ যে মা। আমার মন এত চঞ্চল যে আমি প্রার্থনাও করতে পারি না—ভিক্‌টোরকা কেঁদে ওঠে।

'বাছা এতদিন কেন চুপ ক'রে ছিলি ! শয়তান যে তোকে দখল ক'রে বসেছে ! এখনও ভগবানের দয়ায় তুই ভাল হয়ে যাবি। মনে মনে সাহস আনে ভিক্‌টোরকা। ও প্রার্থনা করে। ওর মনে ভেসে আসে যিশুর ক্রুশের ছবি, কুমারী মেরীর কথা, শয়তান যেন ওর কাছে না আসতে পারে। এমনি ক'রে দুদিন যায়। তৃতীয় দিন ও দূরের মাঠে যায় ঘাস কাটতে। সঙ্গী মজুরদের বলে যায় তাড়াতাড়ি ফিরতে কারণ ও-ও তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবে। ছুটে চলে সে বনহরিণীর মত। সবাই চেয়ে দেখে। কিন্তু বাড়ি ফিরল ও বিবর্ণ ও আহত

অবস্থায়। মজুরেরা ওকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। ওর পায়ে একখানি ছোট সাদা রুমাল বাঁধা।

'হায় ভগবান! আমার মেয়ের কি হয়েছে—মা আর্তনাদ করে ওঠেন।

'কাঁটাগাছের ওপর পা পড়ে পায়ে কাঁটা ফুটে যায়। সেই থেকেই অসুস্থ। আমায় ঘরে নিয়ে যাও। আমি শোব—ভিক্টোরকা অনুনয় করে।

'ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শোয়ানো হলো। বাপ কামার-বৌ-এর কাছে ছুটে গেল। কামার বৌ ছুটে এল আর তার পিছু পিছু এল প্রতিবেশীরা। কেউ বলে ক্রনেট্ গাছ দিয়ে বেঁধে দিতে, কেউ বলে মন্ত্র পড়ে চিকিৎসা করতে।

কামার বৌ কিন্তু কারও কথা না শুনে ফোলা পা দু'খানিতে আলুর পুলটিস্ দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর সবাইকে চলে যেতে বলে একা ভিক্টোরকার পাশে বসল।

'কি হয়েছে আমায় বল। খুব ভয় পেয়েছিস্ দেখছি। কে তোর পায়ে এই সাদা মিহি রুমাল বেঁধে দিয়েছে? আমি তাড়াতাড়ি রুমাল-খানি সরিয়ে রেখেছি পাছে লোকে এই নিয়ে বলাবলি করে। কামার বৌ মেয়েটির পা দু'খানি ভাল ভাবে ছড়িয়ে দেয়।

'কোথায় রেখেছো?

'তোর বালিশের নিচে।

'রুমালখানি হাতে নিয়ে ভিক্টোরকা তাতে রক্তের দাগ দেখে। তারপর তাতে এমব্রয়ডারি করা নাম দেখে ওর সাদা মুখ লাল হয়ে ওঠে।

'তোর চাউনি দেখে আমার তো ভাল ঠেকছে না।

'ভগবান আমায় ত্যাগ করেছেন। কেউই আর আমার কিছু করতে পারবে না। আমি চিরতরে শেষ হয়ে গেছি।

'ও হয়তো জ্বরে প্রলাপ বকছে, এই ভেবে কামার বৌ ওর গালে হাত দিয়ে দেখে ঠাণ্ডা, হাতও ঠাণ্ডা, শুধু ওর চোখ দুটি জ্বলে যাচ্ছে— দু' হাত দিয়ে রুমালখানি চোখের সামনে ধরে আছে ও।

'শোন—ভিক্‌টোরকা ধীরে ধীরে আরম্ভ করে : কিন্তু কাউকে কিছু বলো না। আমি তোমায় সব বলছি। দু'দিন আমি তাকে দেখিনি— কাকে তা তুমি জানো। আজ সকালে আমার কানে যেন কে কেবল বলছে : 'যাও ঘাসের ক্ষেতে যাও—যাও ঘাসের ক্ষেতে যাও।' জানি এ প্রলোভন, কারণ ও ওখানে প্রায়ই পাহাড়ের ওপর একটি গাছের নিচে বসে থাকে। তবু যতক্ষণ না আমি কাস্তে আর ঝোলা নিয়ে এই পথে রওনা হই ততক্ষণ আমার একেবারে স্বস্তি নেই। বারবার আমার মনে হতে থাকে যে আমার হয়তো ভাল হবে না। কিন্তু কে যেন আমার কানে কানে বলে, 'যাও ঘাস কাটতে যাও। কে জানে ও ওখানে আছে কিনা? তাতেই বা ভয় কি তোমার? টমেস্‌ও এখনই গিয়ে পৌঁছোবে।' আমি চলে গেলাম। গাছের নিচে চেয়ে দেখলাম কেউ নেই। ভাবলাম, ও যদি এখানে না থাকে তবে আর ভয় কি? কাস্তে হাতে কাজ আরম্ভ করলাম। এমন সময় মনে হলো যে চারপাতার একটি ঘাসের শীষ যদি আমার হাতে না আসে তাহলে এণ্টনের সঙ্গে আমি সুখী হব (—বোহিমিয়ার জনশ্রুতি)। খুঁজে খুঁজে কিছুতেই তা পেলাম না। যেই মুখ তুলে চেয়েছি পাহাড়ের দিকে, দেখি গাছের তলে দাঁড়িয়ে সেই সৈনিকটি! তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ালাম। পথে একটি কাঁটাগাছের ওপর পা পড়তেই কাঁটা ফুটে গেল পায়ে। ব্যথায় আর্তনাদ করিনি তবে যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখলাম। মনে হয় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম কে যেন আমায় দু'হাতে তুলে নিয়ে চলেছে। আবার যন্ত্রণায় আমার জ্ঞান ফিরে এল। আমি তখন ঝরণার ধারে শুয়ে আর আমার পাশে সেই সৈনিকটি হাঁটু পেতে

বসে। সে তার সাদা রুমালখানি জলে ভিজিয়ে আমার পায়ে বেঁধে দিলে।…

'ভাবলাম, হায় ভগবান! কি হবে আমার! ওই চোখ দুটি থেকে কি নিষ্কৃতি নেই আমার? যাক, ওদিকে আর চাইবো না। তখন আমি যন্ত্রণায় কাতর, আমার মাথা ঘুরছে, একটি কথাও না বলে চোখ বন্ধ ক'রে রইলাম। সে আমার কপালে হাত দিয়ে আমার একখানি হাত তুলে নিলে। ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে এল। তবু চুপ ক'রে থাকলাম। তখন সে আমার মুখে জল ছিটিয়ে দিয়ে আমার মাথাটি তুলে ধরলো। কি করি? চোখ খুললাম। তার চোখ দুটি যেন সূর্যের মত জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠলো। দু'হাতে মুখ ঢাকলাম। সে কথা কইতে শুরু করলো। কি মিষ্টি তার স্বর! তুমি সত্যিই বলেছিলে যে সে গলার স্বরে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে দেবে। সে-কণ্ঠস্বর এখনও আমার কানে বাজছে। সে বললে সে আমায় ভালবাসে। আমিই তার সব, তার স্বর্গ।…

'কি শয়তান! এযে যাদু করার ফন্দী! হতভাগী মেয়ে কি ভাবছিস্ তুই? তুই কি ওর কথা বিশ্বাস করেছিস্? কামার বৌ হায় হায় করে ওঠে।

'অবিশ্বাস করবো কেন? ও যে বললে আমায় ভালবাসে।

'বলেছে তাতে আর কি? এ সব মিথ্যে। ও তোকে ভোলাতে চায়।

'আমিও ওকে তাই বলেছিলাম। কিন্তু ও ভগবানের নামে শপথ ক'রে আমায় বললো যে আমায় ভালবাসে। আমায় দেখার প্রথম দিন থেকেই সে আমায় ভালবেসেছে। কিন্তু আমায় বলেনি কারণ তার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমায় সে বাঁধতে চায় না। সারাটা জীবন দুর্ভাগ্য তার লেগে আছে। তার না আছে শান্তি, না আছে সুখ। আরও কত কথা সে বললো আ শুনে আমার কান্না আসে। বললাম,

আমি তাকে বিশ্বাস করি, বললাম আমার ভয় করতো তাকে, সেই ভয়ে আমি বিয়ে করতে চলেছি। আমার গলায় বাঁধা সেটিও তাকে দেখালাম। সে চাইতেই দিয়ে দিলাম তাকে।

'হায় ভগবান! কামার বৌ হায় হায় ক'রে ওঠে: তুই সেই জিনিসটাও দিয়ে দিয়েছিস! এবার কার সাধ্য তোকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে আনে। এ ভগবানেরও অসাধ্য।··

'সে বললে এ ভালবাসা। আমি যেন আর কাউকে বিশ্বাস না করি।

'হাঁ ভালবাসা! তাকে বুঝিয়ে দিতাম ভালবাসা কি! কিন্তু এখন আর উপায় নেই। কি করলি তুই? ও একটা রাক্ষস, তোর সব রক্ত শুষে নেবে, তারপর কবরে শুয়েও শান্তি পাবি না তুই। হায়! কি সুখের জীবনই না হোত তোর।

'শুনে ভিক্‌টোরকা ভয় পেয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে: সব শেষ হয়ে গেছে। আমি ওর সঙ্গেই যাবো—ও যদি আমায় সর্বনাশের পথে নিয়ে যায় তবুও। শীত করছে আমার, শরীরটা ঢেকে দাও।

'কামার বৌ তাকে পালকের লেপ দিয়ে ঢেকে দেয়। তবু ভিক্‌টোরকার শীত যায় না। সে কথাও বলে না। ভিক্‌টোরকার কোন কথাই কিন্তু কামার বৌ কাউকে বলে না।

'সেদিন থেকে ভিক্‌টোরকা মরার মত পড়ে থাকে। কোনদিকে চেয়েও দেখে না সে। কখনও কখনও ঘুমের ঘোরে আবোলতাবোল বকে। কামার বৌ দিনরাত তার বিছানার পাশে বসে থাকে। তার বুদ্ধি বিদ্যাও হার মেনে যায়। দিনে দিনে বাপ-মার মন ভেঙ্গে যায়।

'ভাবীবর রোজই বিষণ্ণ মনে ফিরে যায়। কামার বৌ মাথা নেড়ে বলে, এ কি ক'রে হয়? কত জনেরই এই ওষুধে ভাল হয়ে গেল আর ওর হলো না কেন? সৈন্যটি ওকে যাদু করে একেবারে বশ করে ফেলেছে। দিনরাত তার এই চিন্তা। একদিন রুগীর ঘর থেকে জানালা দিয়ে

তাকিয়ে দেখে যে বাগানে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এক মূর্তি, তার চোখদুটি যেন জ্বলন্ত কয়লার মত।

তারপর একদিন মিথেস্ খবর নিয়ে এলেন যে সৈন্যরা গ্রাম ছেড়ে চলেছে।

'ওরা সবাই থাকলেও আমার কিছু যায় আসে না—শুধু ঐ একজন যদি চলে যায়। যাহোক ওদের যাবার খবর শুনে সত্যিই আমি সুখী। ও লোকটা যে একটা শয়তান। ওর জন্যই ভিক্‌টোরকার এই অবস্থা। ভিক্‌টোরকাকে ও যাদু করেছে।

'সৈন্যের দল মার্চ ক'রে চলে যায়। সেই রাতে ভিক্‌টোরকার অবস্থা এত খারাপ হলো যে সবাই ভাবলো পাদ্রীকে ডাকার কথা। তারপর আবার সকালের দিকে ওর অবস্থা ভাল হলো। ও উঠে বসলো। সবাই বলে কামার বৌ না থাকলে ভিক্‌টোরকা আর ভাল হতো না।

'কিন্তু সব বিপদের তখনও অবসান হয়নি। ভিক্‌টোরকা উঠে হেঁটে বেড়ালো, তবে ও যেন আর ওতে নেই। কারও সঙ্গে কথা বলে না, কারও দিকে চায় না। ওর মুখে এক হতবুদ্ধির ভাব। কামার বৌ বাপ মাকে সান্ত্বনা দেয়: ও ধীরে ধীরে ভাল হয়ে যাবে। আর ওর ওপর নজর রাখার প্রয়োজন নেই।

'ভিক্‌টোরকা ওর বোন মারীর সঙ্গে আবার এক ঘরে শোয়।

'প্রথম রাতে মারী ভিক্‌টোরকার বিছানায় বসে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তোর? ভিক্‌টোরকা ওর দিকে চেয়ে থাকে, কোনো জবাব দেয় না।

'দিদি, তোকে একটা কথা বলবো বলবো ভাবছি। কিন্তু তুই যদি রাগ করিস।

'মাথা নেড়ে ভিক্‌টোরকা জবাব দেয়: বল কি বলবি মারী।

'সৈন্যরা চলে যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় মারী শুরু করে— :

'কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই ভিক্‌টোরকা তার হাত ধরে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে : সৈন্যরা চলে গেছে ? কোথায় ?

'কোথায় তা আমি জানি না।···

'ভগবান ! এই বলে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভিক্‌টোরকা বালিসের ওপর পড়ে যায়।

'শোন দিদি, আমার ওপর রাগ করিস না। জানি তুই সেই কাল সৈন্যটিকে দেখতে পারতিস না। তার সঙ্গে কথা বলেছি শুনে তুই রাগ করবি।

'তার সঙ্গে কথা বলেছিস তুই ? ভিকটোরকা উঠে বসে।

'কি করবো আমি ? আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য সে এত কাকুতি মিনতি করেছে কিন্তু তবুও আমি তার দিকে চেয়ে দেখিনি। তোর যখন খুব অসুখ, সে রোজই আমাদের বাড়ির কাছে আসতো। আমি তাকে দেখলেই পালিয়ে যেতাম। তাকে দেখে আমার ভয় করতো। একদিন বাগানে গাছের তলে আমায় দেখে সে আমার হাতে কতগুলো গাছগাছড়া দিলে। বললে তা সিদ্ধ ক'রে তোকে খেতে দিতে, তুই ভাল হয়ে যাবি। আমি কিন্তু তা নিই নি। আমার ভয় হলো সে হয়তো তোকে প্রেমের ওষুধ দিচ্ছে। তখন সে কাকুতিমিনতি ক'রে তোকে বলতে বললে যে সে চলে যাচ্ছে—কিন্তু সে তার প্রতিজ্ঞা ভুলবে না। তুইও যেন তোর প্রতিজ্ঞা না ভুলিস। তার সঙ্গে আবার দেখা হবে তোর। কথা দিয়েছিলাম তোকে বলবো। তাই আজ বললাম সব। কিন্তু ভয় নেই তোর—সে আর আসবে না। তোর আর কোন ভাবনা নেই।

'মারী তুই এত ভাল মেয়ে ! যা, এখন শুতে যা, ভিক্‌টোরকা আদর ক'রে তার গলা ধরে।

'পরদিন সকালে উঠে মারী ভিক্‌টোরকাকে দেখতে পায় না। ভাবে,

হয়তো বাড়ির মধ্যে কোথাও আছে। উঠোনেও কোথায়ও দেখা নেই তার। বাপমা আশ্চর্য হয়ে কামার বৌ-এর কাছে খোঁজ করে সেখানে এসেছে কিনা। কিন্তু সেখানেও ভিক্‌টোরকার দেখা নেই।

'ভিক্‌টোরকার ভাবী শ্বশুরবাড়ি লোক পাঠানো হলো সেখানে গিয়েছে কিনা। খবর পেয়ে ভাবী বর এসে হাজির। কামার বৌ বলে : আমার মনে হয় ও পালিয়ে সেই সৈন্যটির পিছু নিয়েছে।

'এণ্টন রেগে জবাব দেয় : মিথ্যে কথা।

'এ কথনই হতে পারে না, বাপমা বলে ওঠে : ও সেই সৈন্যটিকে একেবারে দেখতে পারতো না।

'তা সত্ত্বেও এই ঘটেছে, কামার বৌ তথন ভিক্‌টোরকার কথা সব বলে। মারীও আগের দিন বোনের সঙ্গে কি কি কথা হয়েছে তা বলে। তথন একে একে সবারই দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে এক গোপন যাতুমন্ত্রের আকর্ষণে ভিক্‌টোরকা সেই সৈন্যটির পিছু নিয়েছে।

'তাকে দোষ দিয়ে কি হবে? তার কোন ক্ষমতা ছিল না। এখন ধরে আনলেও আবার পালিয়ে যাবে, কামার বৌ বলে।

'বাপ বলে : তাহলেও আমি যাবো, ওকে খুঁজে নিয়ে আসবো। আমার এমন লক্ষ্মী মেয়ে!

'সঙ্গে সঙ্গে এণ্টনও বলে ওঠে : আমিও যাবো আপনার সাথে। এতক্ষণ চুপ করে সে সব কথা শুনছিলো।

'না, তোমার যাবার প্রয়োজন নেই, রাগে মানুষের বিবেচনা হারিয়ে যায়। তুমি হয়তো এমন কিছু ক'রে বসবে যাতে তোমাকে জেলে যেতে হবে বা সৈন্যদলে ভরতি হতে হবে। তোমারও যথেষ্ট কষ্ট ভোগ হয়েছে—আর তোমার দুঃখ বাড়িয়ে কি লাভ? ওর সঙ্গে আর তোমার বিয়ে হবে না—সে-কথা আর চিন্তা করো না। এক বছর যদি তুমি মারীর জন্য অপেক্ষা করতে পারো। ও বড় ভাল মেয়ে। আমার

ইচ্ছে তোমায় জামাই করা, কিন্তু তোমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাই না। শুনে পরিবারের সকলে চোখের জল ফেলে। বাপ সান্ত্বনা দেয়, কেঁদে কি হবে? আমি যদি মেয়েটাকে ফিরিয়ে না আনতে পারি তাহলে ভগবানের হাতেই তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

'পাথেয় নিয়ে ঘরের সবাইকে উপদেশ দিয়ে বাপ বেরিয়ে পড়ে। পথে অনেককেই সে মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেয়ের বর্ণনা দেয়। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। কেউ বলে সৈন্যরা হ্রাডেটস্-এর দিকে গিয়েছে। সেখানে এসে শোনে যে সেই কাল সৈন্যটি অন্য দলে যোগ দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে কেউই কিছু বলতে পারে না, তবে সেই সৈন্যটি যে ছেরনভে ছিল তা সবাই বললে। ভিক্টোরকার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। লোকে বললো পুলিশে খবর দিতে কিন্তু বাপ তাতে রাজী হলো না।

'পুলিশ দিয়ে কি হবে? ভবঘুরের মত তাকে আমি ধরে আনতে চাই না। যেখানেই সে থাকুক না কেন—ভগবান না করলে তার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। সে যদি ফিরে আসে আসবে। যদি না আসে তাও ভগবানের কৃপা। আমি তাকে সকলের সামনে টেনে আনতে চাই না।

'এই ভেবে বাপ হ্রাডেটস্-এর শিকার-রক্ষককে অনুরোধ জানিয়ে যায় সে যদি ভিক্টোরকার দেখা পায় বা কোন খোঁজ পায় তাহলে যেন তাকে বলে বাড়ি ফিরে যেতে এবং সঙ্গে কাউকে দিয়ে যেন তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। শিকার-রক্ষকের আশ্বাস পেয়ে বাপ বাড়ি ফিরে আসে।

'সবাই ভিক্টোরকার জন্য দুঃখ করে। গির্জায় তার জন্য সবাই প্রার্থনা করে—যেন সে ফিরে আসে। ছমাস-নমাস গেল কেটে। কোন খবর নেই। তখন সবাই ধরে নিল যে, সে আর ফিরবে না।

'একদিন রাখাল ছেলেরা খবর নিয়ে এল যে তারা বনে

ভিক্টোরকার মত লম্বা কাল চুলের একটি মেয়েকে দেখেছে। খবর শুনে মিথেস পরিবারের সবাই বনে ছুটে গেল, কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না সেখানে।...

'সেই সময় আমার শ্বশুর মশায়ের অধীনে আমার শিক্ষানবীশের প্রথম বছর। আমরাও শুনেছিলাম ভিক্টোরকার কথা। পর দিন আমি যখন বনে গেলাম শ্বশুর মশায় আমাকে খোঁজ করতে বললেন। ঠিক সেই দিনই মিথেসদের ক্ষেতের ওপর দুটি ফার গাছের ডালপালা যেখানে জট পাকিয়ে আছে, দেখি সেখানে একটি স্ত্রীলোক বসে আছে। ঘাড়ের ওপর তার মাথার চুল জটা পাকিয়ে আছে। ভিক্টোরকাকে জানতাম—তবে এমনি অবহেলিত বন্য চেহারায় তাকে চেনা কঠিন। তার জামা কাপড় জরাজীর্ণ হয়ে গেলেও তাতে সৌন্দর্যের ছাপ। তার দেহে মা হবার পূর্বলক্ষণ। চুপে চুপে চলে এলাম শ্বশুর মশায়কে খবর দেবার জন্য। তিনি তখনই ছেরনভে খবর দিতে চললেন। বাপমা শুনে কাঁদে। তারা মেয়েকে আর জীবিত দেখতে চায় না। কিন্তু কি করা যায়? আমরা নজর রাখি কোথায় সে যায় কোথায় শোয়—যদি তাকে শান্ত করতে পারি। এক সন্ধ্যায় সে তার বাবার বাগানের কাছে এল, দেখলাম মাটিতে বসে, দুহাতে হাঁটু দুটি ধরে তার ওপর থুতনি রেখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মা তার কাছে অসেতেই সে ছুটে বেড়া পেরিয়ে বনে অদৃশ্য হয়ে গেল। শ্বশুর মশায় বলেন যে কিছু খাবার আর জামা কাপড় বনে রেখে এলে তার নজরে পড়তে পারে। বাপ সব কিছু নিয়ে আসে। আমি তা বনের মধ্যে রেখে আসি। পর দিন আবার দেখতে যাই। দেখি খাবারের মধ্যে রুটি আর পোশাকের মধ্যে পেটিকোট্ ও অন্তর্বাস উধাও হয়েছে। আর সব যেমন তেমনি পড়ে আছে। তিন দিনের দিন আমি বাকী জিনিসগুলি সরিয়ে নিয়ে যাই পাছে অন্য কেউ নিয়ে

যায়। অনেকদিন ধরে আমরা ধরতে পারি না কোথায় শোয় সে রাত্রে। তারপর একদিন দেখলাম তিনটি ফার গাছের মধ্যে এক গহ্বর। কখনও হয়তো কেউ সেখান থেকে একখানি পাথর কেটে নিয়েছিল। তাইতেই এই গহ্বরটা তৈরি হয়েছে। গহ্বরের মুখটি লতাপাতায় ঢাকা। আমি ভেতরে গিয়ে দেখলাম—দু-তিন জনের জায়গা হয় সেখানে। কিছু নেই, শুধু শুকনো পাতা আর শেওলা—তাই তার বিছানা। তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, বাপ, ছোট বোন মারী—সে তখন এণ্টনের বাগ্‌দত্তা—অনেক দিন তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু সে একেবারে মানুষের সংসর্গ এড়িয়ে চলে আর দিনের বেলা তাকে ক্বচিৎ দেখা যায়। অবশেষে সে একদিন বাড়ি এল। মারী তার কাছে গিয়ে আদর ক'রে বলে : দিদি, আয় আমার ঘরে আয়। কতদিন হয়ে গেল আমরা এক সঙ্গে শুতাম। এখন আমি একা।

'মারীর হাত ধরে সে ঘরে আসে। তারপর হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে ছুটে পালায়। অনেকদিন তাকে আর বাড়ির আশে পাশে দেখা যায় নি।

'একদিন রাতে আমি শিকারের জন্য অপেক্ষা করছি। 'পুরোনো বাড়ি' থেকে বেশী দূর নয়। আকাশে ঝক্‌ঝকে চাঁদ—একেবারে দিনের আলোর মত। হঠাৎ দেখি ভিক্‌টোরকা বন থেকে বেরিয়ে আসছে। তার হাত দুখানি বুকের ওপর ক'রে রেখে, মাথা নিচু ক'রে এমন লঘু পদক্ষেপে চলেছে যে দেখে মনে হয় মাটিতে পা পড়ছে না। এমনি ভাবে সে বাঁধ অবধি এগিয়ে গেল। প্রায়ই তাকে জলের ধারে দেখতাম—পাহাড়ের গায়ে বড় ওক্ গাছটার তলে ও বসতো। তাই এদিন বিশেষ লক্ষ্য করলাম না। কিন্তু ভাল ক'রে চেয়ে দেখতেই দেখি কি যেন সে জলে ফেলে দিচ্ছে। তারপর তার হা-হা হাসিতে ভয়ে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। আমার সঙ্গের কুকুরটিও ডেকে

উঠলো। ভিক্‌টোরকা তখন একটি গাছের গুঁড়ির ওপর বসে গান গাইছে। তার একটা কথাও বুঝতে পারলাম না, তবে স্বর থেকে মনে হল যেন ঘুমপাড়ানী গান :

ঘুম আয়,
বাছা ঘুমায়!
বাছার চোখে ঘুম আয়!
বাছার সাথে ঘুমায় ভগবান।
দোলায় তারে স্বর্গদূত,
রক্ষা করে ভগবান :
ঘুম আয়!···
ঘুম আয়!···

'সেই নিস্তব্ধ রাতে এই গানের স্বর এত করুণ মনে হলো যে আমি আর সেখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না। প্রায় দুঘণ্টা সে সেখানে বসে গান গাইলো। সেই থেকে রোজ সন্ধ্যায় সে জলের ধারে এসে ঘুমপাড়ানী গান গায়। সকালে বললাম সবাইকে সেই ঘটনা। সবাই ধারণা করে নিলো কি ফেলে দিয়েছে সে জলে। সে-ধারণা সত্যি। তাকে যখন আবার দেখলাম আমরা, তখন তার দেহের রূপ বদলে গেছে। ভয়ে সবাই শিউরে ওঠে। কিন্তু কি করা যায়? অবোধ যে, তার আর পাপ কি? ক্রমে ক্রমে খিদের জ্বালায় সে আমাদের দরজায় আসে কিন্তু শুধু দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমার স্ত্রীর তখন অল্পবয়স। হাতে কিছু খাবার দিতেই ভিক্‌টোরকা তা নিয়ে ছুটে বনে চলে যায়। আমিও যখন বনে যাই তাকে রুটি দিয়ে আসি। সে হাত পেতে নেয়। কিন্তু কথা বলতে গেলেই সে ছুটে পালায় কিছু না নিয়েই। সে ফুল ভালবাসে। হাতে না থাকলেও তার কোমরবন্ধনীতে ফুল থাকে। ছোট ছেলে মেয়েদের দেখলেই সে ফুল দিয়ে দেয় তাদের।

কে জানে, তার নিজের কাজের বোধ আছে কিনা। তার মাথায় কি হচ্ছে জানতে ইচ্ছে হয় কিন্তু কে জানে? ওতো নিজেই জানে না।

'মারী আর এণ্টনের বিয়ের দিন ওরা যখন রেডহুরার গির্জায় গেল সেদিন ভিক্‌টোরকা বাড়ির উঠান পর্যন্ত এল। কে জানে সে বিয়ের খবর শুনে এসেছিল, না, দৈবাৎ এসে পড়েছিলো। ফুল নিয়ে এসেছিলো এবং সারা বাড়ি তা ছড়িয়ে দিল। মা তাকে দেখে ডাকলেন, তার জন্য কোলাচ্ নিয়ে এলেন কিন্তু সে ছুটে পালিয়ে গেল।

'বাপ দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন, কয়েক বছর পরেই মারা যান। সেসময়ে আমি গ্রামে ছিলাম। এণ্টন্ ও মারী আমাকে জিজ্ঞেস করে ভিক্‌টোরকাকে দেখেছি কিনা, তারা তাকে বাড়ি নিয়ে আসতে চায়, কিন্তু কি ক'রে আনবে? তাকে না দেখে বাপ মরতেও পারছে না। সবাই বলে ভিক্‌টোরকা তার আত্মাকে ধরে আছে। বনে যেতে যেতে ভাবলাম ভিক্‌টোরকাকে দেখতে পেলে বলবো, সে বুঝুক আর না বুঝুক। দেখি সে ফার গাছের তলায় বসে আছে। সামনে দিয়ে যেতে যেতে বললাম, : ভিক্‌টোরকা, তোমার বাবার শেষ অবস্থা, তুমি একবার গিয়ে দেখে এসো।

'যেন শুনতেই পায়নি এমনি ভাবে সে বসে রইলো। কোন ফল হবে না ভেবে আমি ফিরে গেলাম। তারপর মারীর সঙ্গে কথা বলছি, কে এসে খবর দিলো যে ভিক্‌টোরকা বাগানে এসেছে।

'এণ্টন তোমরা যাও এখান থেকে, তা না হলে ও ভয় পাবে। মারী বাগানে ছুটে গেল। তারপর সে ভিক্‌টোরকার হাত ধরে তাকে ঘরে নিয়ে এল। তার হাতে একটি গোলাপফুল, তাই নাড়াচাড়া করছে কিন্তু একবারও চোখ দুটি তুলে তাকাচ্ছে না। মারী যেন একটি অন্ধ মেয়ের হাত ধরে নিয়ে চলেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। বিছানার একপাশে মা হাঁটু পেতে বসে আছেন, পায়ের দিকে তাঁর ছেলে,

বিছানায় বুকের ওপর দুহাত রেখে পড়ে আছেন বাবা···মৃত্যুপথযাত্রী। মেয়েকে দেখে তাঁর মুখে যেন এক শান্তির ঢেউ খেলে গেল—হাত তুলতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। ভিক্‌টোরকা ভাবে বাবা হয়তো কিছু চাইছে। হাতের গোলাপফুলটি সে তাঁর হাতে দেয়। বাপের শেষ দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। মা কেঁদে ওঠেন—এত লোক দেখে ভিক্‌টোরকা চারদিক চেয়ে ভয় পেয়ে ছুটে চলে যায়।

'জানি না, তারপর সে কখনও আর বাড়ি এসেছে কিনা। এই পনের বছর আমি এখানে আছি, শুধু একবার তাকে কথা বলতে শুনেছি। আমার মরবার দিনও সেকথা ভুলবো না। একদিন সাঁকো পার হচ্ছি। নীচে রাস্তায় মজুরেরা কাঠ নিয়ে চলেছে। দেখি, মাঠে 'সোনালী চুলের' লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাসেলের কার্যাধ্যক্ষকে মেয়েরা এই নামেই ডাকতো—তার জার্মান নাম তাদের মনে থাকতো না। তার মাথায় বড় বড় সোনালী চুল। সে মাঠে পায়চারি করছে। গরমের জন্য মাথার টুপি খুলে ফেলেছে।

'হঠাৎ যেন সেখানে আকাশ থেকে নেমে এল ভিক্‌টোরকা। ছুটে এসে সে সেই লোকটির মাথার চুল ধরে টেনে তার ওপর হামলা শুরু করে। জার্মানটি চিৎকার ক'রে ওঠে। আমি নেমে এলাম কিন্তু ভিক্‌টোরকা তখন রেগে মারধোর করছে : "বদমাশ, শয়তান, আজ তোকে হাতে পেয়েছি—আজ তোকে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবো। আমি যাকে ভালবাসি তার তুই কি করেছিস? কোথায় পাঠিয়েছিস তাকে? ফিরিয়ে দে।" ভীষণ রাগে তার স্বর ভেঙ্গে গেছে। সব কথা বোঝা যায় না। জার্মানটি বুঝতে না পেরে বোবার মত দাঁড়িয়ে রইলো। সেদিন সেখানে মজুরেরা না থাকলে তাকে ভিক্‌টোরকার হাত থেকে ছাড়িয়ে আনা যেত না। মজুরেরা মারধোর দেখে ছুটে এসে কার্যাধ্যক্ষকে ছাড়িয়ে দেয়। ভিকটোরকাকে কিন্তু

ধরে রাখা যায় না। সে এক ঝাপটায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বনের মাঝে ছুটে যায়। সেখান থেকে সে পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে এমন অভিশাপ করতে থাকে যে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। তারপর অনেকদিন তাকে আর কেউ দেখিনি।

'জার্মানটি ভয়ে অসুস্থ হয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

'এই হচ্ছে দিদিমা ভিক্টোরকার ইতিহাস। এর কিছু শুনেছিলাম কামার বৌ-এর কাছে, কিছু মারীর কাছে। আর কি ঘটেছিল তা জানি না, তবে হতভাগিনী মেয়েটির বড় দুর্দিন আর যে তার সর্বনাশ করেছে তারও না জানি মনের ওপর কত বড় পাথর চাপা।'

শিকার-রক্ষক তার গল্প শেষ করে।

দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে দিদিমার। তা মুছে দিদিমা বলেন : 'অনেক ধন্যবাদ, এমন সুন্দর বলতে পারেন আপনি, শুনতে শুনতে কখন সূর্য ডুবে গেছে তা খেয়ালই নেই।' তিনি তখন উঠে পড়তে চান।

শিকার-রক্ষকের স্ত্রী বলেন : 'একটু অপেক্ষা করুন, হাঁসমুরগীদের খেতে দিয়ে আমি আপনাদের এগিয়ে দিয়ে আসবো।'

'আমিও আপনাদের সঙ্গে সাঁকো পর্যন্ত যাবো। আমাকে এখন বনে যেতে হবে।' এই বলে শিকার-রক্ষক টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

ঘরের বাইরে 'চিক্ চিক্' শব্দ শুনে চারদিক থেকে হাঁসমুরগী ছুটে আসে। সবচেয়ে প্রথমে উড়ে আসে এক ঝাঁক চড়ুই। গৃহকর্ত্রী বলেন : 'তোদের ডেকেছে কে ?'

দিদিমা দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে নেন পাছে তারা হাঁসমুরগীদের তাড়িয়ে দেয়। হাঁসমুরগীর পালে সাদা ও ধূসর রঙের রাজহাঁস, তাদের বাচ্ছা, পাতিহাঁস, নানা জাতের ঝুঁটিওয়ালা মোরগ, ময়ূর, রংবেরঙের মুরগী—তারা সবাই খাবারের ভাগ পাবার জন্য তাড়াতাড়ি

ছুটে যেতে যেতে ধাক্কাধাক্কি করে। দূরে খরগোসগুলো বসে আছে আর গাছের ওপর পোষা কাঠবিড়ালটি লেজ তুলে চেয়ে আছে ছেলেমেয়েদের দিকে। বেড়ার ওপর বিড়ালটি বসে একদৃষ্টে চড়ুই-পাখিদের দিকে তাকিয়ে আছে। বারুক্কা হরিণটির মাথা চুলকে দেয়। পাশেই বসে আছে কুকুরগুলো। কাল মোরগটি একটা হাঁসের বাচ্চার পেছনে তাড়া ক'রে আসে, সে তার মুখের খাবার ছিনিয়ে নিয়েছে। হাঁসের বাচ্ছাটি যেই ছুটে হেক্‌টারের মুখের কাছে এসেছে, সে আর লোভ সামলাতে পারে না।

'দেখ দেখ বদমায়েশের কাণ্ড,' গৃহকর্ত্রী এক ঘা বেত মারেন কুকুরটিকে।

গৃহকর্ত্রী দিদিমাকে কয়েকটি টাইরল্ মুরগীর ডিম দেন তা দেবার জন্য। তারপর ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে চলেন দিদিমার সঙ্গে। শিকার-রক্ষকও গলায় কোটটি ঝুলিয়ে নিয়ে হেক্‌টারকে ডেকে চলে তাদের পিছুপিছু।

পাহাড়ের তলে শিকার-রক্ষকের স্ত্রী বিদায় নিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যান। সাঁকোর পারে শিকার-রক্ষক করমর্দন ক'রে বনে চলে যায়। জন্ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর বারুক্কাকে বলে : 'আমি বড় হলে বনে যাবো শিকারে।'

বাঁধের ধার দিয়ে যেতে যেতে শেওলাপড়া গাছের গুঁড়িটার দিকে চেয়ে দিদিমার ভিক্‌টোরকার কথা মনে পড়ে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর : 'হতভাগিনী—'

ছয়

পর দিন দুপুরের আগেই ছেলেমেয়েরা দিদিমার সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

'মনে রেখো দুষ্টুমি করো না যেন,' মা দরজা পর্যন্ত এসে তাদের মনে করিয়ে দেয় : 'ক্যাসেলের কোন কিছুতে হাত দিয়ো না। গিয়েই রাজকুমারীর হাতে সবিনয়ে চুমো দিয়ো।'

'আমি দেখবো যেন কোন ত্রুটি না হয়,' দিদিমা জবাব দেন।

সদ্যফোটা ফুলের মত দেখতে ছেলেমেয়েরা। দিদিমার পরনের পোশাকও সুন্দর—খোবানি রঙের ঘাগরা, সাদা বরফের মত অ্যাপ্রন, ফিকে নীল রঙের জ্যাকেট্ এবং টুপি, আর গলায় পাথরের মালা, তার সঙ্গে সেই ডলারটি। হাতে ভাঁজ করা একখানি শাল। মেয়ে বলে : 'শাল নিয়ে চলেছো কেন? বৃষ্টি হবে না।'

'হাতে কিছু না থাকলে মনে হয় যেন আমার হাতখানিই নেই।' ক্ষীণ হেসে দিদিমা জবাব দেন।

বাগান ছাড়িয়ে তারা সংকীর্ণ পথ ধরে চলে।

'সাবধানে চল, তা না হলে ভিজে ঘাসে তোদের জামাকাপড় নষ্ট হয়ে যাবে। বারুস্কা তুই আগে আগে যা—আমি আডেল্‌কাকে নিয়ে যাবো, ও রাস্তা দিয়ে চলতেই পারে না—' এই বলে দিদিমা আডেল্‌কার হাত ধরেন।

কিছুক্ষণ চলার পর এক নতুন বিপদ এল। কুকুরগুলি পাহাড়ের গায়ে ছোটাছুটি করছিলো। দিদিমাকে দেখে তারা জল ঠেলে গা ঝাপটা দিয়ে ছুটে এল। তাদের গালমন্দ করে ওঠেন দিদিমা : 'দূরহ! কে তোদের ডেকেছে?' ছেলেরাও তাদের গাল দেয়। জন্ একটি ঢিল ছুঁড়ে মারে তাদের দিকে—কিন্তু তা তাদের গায়ে না লেগে গিয়ে পড়ে জলে। কুকুরগুলির অভ্যাস ছুড়ে-দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে আনা—তাই তারা এক লাফে জলে গিয়ে আবার ছেলেদের কাছে ছুটে আসে। ভয় পেয়ে ছেলেমেয়েরা দিদিমার পেছনে গিয়ে লুকোয়। দিদিমাও ভাবেন, কি করবেন এখন।

'আমি বাড়ি গিয়ে বেটিকে ডেকে আনি,' বারুস্কা বলে।

বারণ করেন দিদিমা : 'না না, একবার যাত্রা ক'রে ফিরে যেতে নেই।'

ভাগ্যক্রমে মিলার সেই সময়ে সেখানে এসে পড়ে, কুকুরগুলিকে সেই তাড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করে : 'কি ব্যাপার, কোথায় চলেছেন? বিয়েতে, না, অন্য কোন উৎসবে?'

'বিয়ে নয়, উৎসবও নয়। ক্যাসেলে চলেছি আমরা।'

'ক্যাসেলে! কি ব্যাপার সেখানে?' মিলার আশ্চর্য হয়ে যায়।

'রাজকুমারী আমাদের যেতে বলেছেন,' ছেলেমেয়েরা বলে। দিদিমা তখন বলেন কি ভাবে সেদিন রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।

'আচ্ছা আচ্ছা,' একটিপ নস্য নিতে নিতে মিলার বলে : 'ফিরে এসে আডেল্‌কা আমায় ব'লো কি দেখলে সেখানে। আর জন্, রাজকুমারী যদি তোমায় জিজ্ঞেস করেন : "পাখী সোজা উড়ে গেলে কোথায় যাবে বলতো—" তখন কি বলবে?'

'না, আমায় জিজ্ঞেস করবেন না—' এই বলে জন্ ছুটে চলে যায়। মিলার তুষ্ট হাসি হেসে বিদায় নিয়ে বাঁধের দিকে এগিয়ে যায়।

সরাইখানায় এসে তারা দেখে কুডারনার ছেলেমেয়েরা খেলছে। ছেলিয়ার কোলে ছোট বাচ্চাটি।

'কি করছো এখানে?' বারুস্কা জিজ্ঞেস করে।

'কিচ্ছু না,' তারা ছেলেমেয়েদের ভাল ভাল পোশাকের দিকে চেয়ে থাকে।

জন্ বুক ফুলিয়ে বলে : 'আমরা ক্যাসেলে চলেছি।'

মাথা নেড়ে লরেন্স জবাব দেয় : 'কি হয়েছে তাতে?'

'আমরা ওখানে কাকাতুয়া দেখবো,' উইলির বড় আনন্দ।

'বড় হয়ে আমি কাকাতুয়া কেন অনেক কিছু দেখবো। বাবা

বলেন আমি সারা পৃথিবী দেখে বেড়াবো,' লরেন্স দমবার পাত্র নয়।

ছেলিয়া ভাবে : 'আমরাও যদি যেতে পারতাম !'

তাদের সান্ত্বনা দিয়ে জন্ বলে : 'তোদের জন্য কিছু নিয়ে আসবো। আর সব গল্প বলবো।'

তারপর তারা বাগানে এসে পড়ে। সেখানে তাদের বাবা তাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে। বাগানটি ক্যাসেলের হলেও সকলেরই সেখানে যাবার হুকুম ছিল। এটি 'পুরানো বাড়ি'র কাছেই। তবু দিদিমা ক্বচিৎ সেখানে যেতেন, বিশেষ ক'রে ক্যাসেলের মালিকেরা এখানে থাকলে। সুন্দর সাজানো বাগান—নানা রঙের ফুল, দুষ্প্রাপ্য গাছ, ফোয়ারা, জলে রং-বেরঙের মাছ। দিদিমা ছেলেমেয়েদের মাঠে বা বনে বেড়াতে নিয়ে যেতেই ভালবাসতেন। সেখানে সবুজ মলমলের মত ঘাসের ওপর তারা গড়াগড়ি দিয়ে, ইচ্ছেমত ফুল তুলে মালা বা ফুলের তোড়া ক'রে আনন্দ পায়। মাঠে কমলালেবুর গাছ ছিল না তবে দু-একটি চেরী বা বন্য পিয়ার গাছ ফলে ভরে থাকতো। যার যত খুশি তা থেকে নিয়ে যেতে পারতো। তা ছাড়া বনে স্ট্রবেরী, হাকেল্‌বেরী, ব্যাঙের ছাতা ও হিজল্ ফলের অভাব ছিল না। বনে ফোয়ারা ছিল না, কিন্তু ছেলেমেয়েরা সেখানে বাঁধের দিকে থাকতো চেয়ে—জলের স্রোত ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে লক্ষ লক্ষ জলবিন্দু হয়ে নিচে ধূমায়িত জলের সঙ্গে মিশে বয়ে চলেছে। বাঁধের জলে সোনালী মাছ ছিল না, কিন্তু রুটির টুকরো ফেলে দিলেই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ জলে ভেসে উঠতো।

মাঠেও অনেকের সঙ্গে দেখা হতো দিদিমার। কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো তারা। কত খবর শুনতে পেতেন তিনি সেখানে।

ক্যাসেলে এসে দিদিমা একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। এখানে এক উর্দিপরা বেয়ারা, ওখানে সিল্কের পোশাক পরা ঝি। এই একজন

অভিজাত ব্যক্তি, এই আর-একজন—সবাই ময়ূরের মত ঘাঁড় উঁচু ক'রে বসেছেন। দিদিমার সঙ্গে কারও দেখা হলেই চাপাগলায় 'গুটেন্ মর্গেন' বা 'বঁজুর' (সুপ্রভাত) বলে অভিবাদন জানায়। দিদিমা লজ্জা পান। জানেন না কি জবাব দেবেন।

ক্যাসেলের দরজায় বসে দু'জন উর্দিপরা চাকর—দু'জন দু'ধারে। একজন দু'হাত একসঙ্গে ক'রে চেয়ে আছে, আর একজন হাত দু'খানি বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রশেককে দেখেই তারা দু'জনে জার্মান ভাষায় অভিবাদন জানায়। দু'জনের উচ্চারণই দু'রকমের।

সামনের ঘরের মেঝে মারবেল পাথরের। তার মধ্যে কারুকার্য করা একখানি টেবিল। দেওয়ালের চারদিকে সবুজ পাথরের স্তম্ভের ওপর প্ল্যাস্টারের মূর্তি। মূর্তিগুলি পৌরাণিক। একটি দরজায় বসে লম্বা কোট পরা একটি লোক ঝিমোচ্ছে। প্রশেক দিদিমা ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সেই শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রশেকের দিকে তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

প্রশেক বলে : 'মাননীয়া রাজকুমারী আমার শাশুড়ী ও ছেলেমেয়েদের আজ দেখতে চেয়েছেন। লিওপার্ড, আপনি যদি দয়া করে খবর দেন।'

লিওপার্ড ভ্রূ কুঁচকে বলে : 'জানিনা আজ রাজকুমারী কারও সঙ্গে দেখা করবেন কিনা। তিনি এখন কাজে ব্যস্ত—তবে আমি খবর দিচ্ছি। ক্ষণকাল পরেই সে হাসিমুখে ফিরে এসে যাবার অনুমতি দেয়। প্রশেক ফিরে যায়।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিদিমা সুন্দর বৈঠকখানা ঘরে এলেন। দমবন্ধ হয়ে আসে ছেলেমেয়েদের। কাঁচের মত মসৃণ মেঝেয় তাদের পা পিছলে যায় বারবার। দিদিমা যেন স্বপ্ন দেখেন—সুন্দর কার্পেটের ওপর পা দিতে ভয় হয় তাঁর।

রাজকুমারীর বসবার ঘরটি সবুজ রঙের কাপড় দিয়ে আবৃত। তার ওপর সোনার কাজ করা। দরজায় ও জানালায় সেই একই রকমের পর্দা। জানালা ঠিক দরজার মতই বড়। দেওয়ালে নানা আকারের ছবি, সবগুলিই অর্ধাকৃতি। জানালার উল্টো দিকে আগুন-রাখা চুল্লি—ধূসর রঙের মারবেল্ পাথরের, তাতে সবুজ ও কাল রঙে চিত্রবিচিত্র করা। তার ওপর দুটি জাপানী পোরসিলিনের ফুলদানী—তাতে সুন্দর ফুল, গন্ধে ঘর ভরে আছে। দু'পাশে দামী কাঠের তৈরি তাক—তাতে নানা রকমের মূল্যবান সামগ্রী। কোনটিতে রয়েছে ভ্রমণের স্মরণচিহ্ন, আবার কোনটি সাজানো রয়েছে বন্ধুবান্ধবের দেওয়া উপহার দিয়ে। ঘরের এককোণে জানালার ধারে মারবেল্ পাথরের একটি এপলো মূর্তি। তারই সামনে একখানি লেখার টেবিল। একটি হাতল দেওয়া ঘন সবুজ রঙের লোমশ কাপড়ে ঢাকা চেয়ারে বসে আছেন রাজকুমারী—সকালের সাদা রঙের পোশাকে। দিদিমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি কলম রেখে তাদের সম্বর্ধনা জানান।

দিদিমা সসম্ভ্রমে ঝুঁকে বলে ওঠেন: 'যিশুর জয় হোক!'

'চিরকাল,' জবাব দিয়ে রাজকুমারী অতিথিদের সম্বর্ধনা জানালেন।

ছেলেমেয়েরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, তারা বুঝতে পারে না কি করবে। দিদিমা চোখ ইশারা করতেই তারা গিয়ে রাজকুমারীর হাতে চুমো খায়। তিনি তাদের কপালে চুমো খেয়ে রেশমী চিকণে কাজ করা আসনে সবাইকে বসতে বলেন।

'মাননীয়া রাজকুমারী, আপনাকে ধন্যবাদ, তবে আমরা একটুও ক্লান্ত নই,' বৃদ্ধা বলেন। আসল কথা দিদিমার ভয় হয় পাছে আসনখানি ভেঙ্গে যায় বা গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু রাজকুমারী দ্বিতীয়বার বলতেই তিনি নিজের শালখানি বিছিয়ে বসেন। ছেলেমেয়েরা তখন দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে এক এক ক'রে সব কিছুর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তাই

দেখে রাজকুমারী তাদের জিজ্ঞেস করেন : 'তোমাদের ভাল লাগছে এখানে ?'

'আজ্ঞে হাঁ—' সমস্বরে বলে ওঠে তারা।

দিদিমা বলেন : 'এখানে অনেক কিছুই দেখে ওরা খুশি হবে। ওদের আর এখানে থাকবার জন্য বলতে হবে না।'

'আর তুমি ? তোমারও এখানে ভাল লাগবে না ?' রাজকুমারী জিজ্ঞেস করেন।

'এ তো আমার কাছে স্বর্গের মত। তবু এখানে আমি বাস করতে চাই না।'

বিস্মিত হ'য়ে রাজকুমারী জিজ্ঞেস করেন : 'কেন ?'

'এখানে থেকে আমি কি করবো ? এখানে না আছে ঘরের কাজ—'

'কিন্তু এই বয়সে তুমি কি কাজকর্ম না ক'রে নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করতে চাও না ?'

'তাহ'লে অল্প দিনেই তো আমি ঘুমিয়ে পড়বো। তবে যতদিন বেঁচে আছি, ভগবান করুন, আমার যেন কাজ করার মত স্বাস্থ্য থাকে।'

এমনি সময়ে দরজার পর্দা সরিয়ে একটি ছোট মেয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল। মাথায় তার সোনালী চুল।

'ভিতরে আসতে পারি কি ?'

নিশ্চয়ই। এসো, এসো, এখানে তোমার অনেক বন্ধু পাবে তুমি।' রাজকুমারী জবাব দেন।

কাউণ্টেস্ হোরটেন্সে ঘরে প্রবেশ করে। কৃশ দেহ। রাজকুমারীর রক্ষণাবেক্ষণেই সে থাকে। পরনে সাদা পোশাক, খড়ের টুপিটি এক হাতে ঝোলানো, আর এক হাতে একগোছা গোলাপ ফুল। 'কি সুন্দর—' সে বলে ওঠে : 'নিশ্চয়ই প্রশেকের ছেলেমেয়ে, আমায় এমন মিষ্টি ষ্ট্রবেরী পাঠিয়েছে !'

রাজকুমারী মাথা নেড়ে সায় দেন। কাউণ্টেস্ প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে একটি ক'রে ফুল দেয়, দিদিমাকে একটি, রাজকুমারীকে একটি, সব শেষেরটি নিজের কোমরবন্ধনীতে রেখে দেয়।

ফুলের গন্ধ নিয়ে দিদিমা বলেন: 'কাউণ্টেস্ ফুলগুলি তোমার মতই সজীব! ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবী করুন।'

'আমারও তাই প্রার্থনা,' রাজকুমারী কাউণ্টেস-এর কপালে চুমো খেয়ে বলে ওঠেন।

'আমি ওদের বাইরে নিয়ে যাবো?' কাউণ্টেস্ একবার রাজকুমারী ও একবার দিদিমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে। রাজকুমারী মাথা নেড়ে সম্মতি দেন। কিন্তু দিদিমা বলেন: 'ওরা কিন্তু ভারী দুষ্টু।'

হোরটেন্‌সে হেসে হাতবাড়িয়ে দেয়।

হাতধরে সবাই সমস্বরে হেসে উঠে দাঁড়ায়। অভিবাদন ক'রে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও। রাজকুমারী একটি রূপোর ঘণ্টা নিয়ে বাজান আর সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা এসে দরজায় দাঁড়ায়। তিনি তখন তাকে খাবার ঘরে সকলের খাবার দিতে বলেন। হুকুম পেয়ে বেয়ারা অভিবাদন করে আর রাজকুমারীর দেওয়া কিছু কাগজপত্র নিয়ে চলে যায়।

দিদিমা এতক্ষণে দেওয়ালের ছবিগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। তিনি বলে ওঠেন:

'কি আশ্চর্য পোশাক! কি মুখশ্রী! এঁর পোশাক যেন পরলোকগতা শ্রীমতী হালাস্‌বোভার মত। তিনি সর্বদাই উঁচু গোড়ালির জুতো, উঁচু মস্তকাবরণ আর ফোলানো ঘাগরা পরতেন। কোমর এমন কষে বাঁধা থাকতো যে দেখে মনে হতো কে যেন কোমর থেকে দু'ভাগ ক'রে কেটে দিয়েছে। তাঁর স্বামী ছিলেন ভবকম্‌কার নগরপাল। ওখানে তীর্থে গেলে আমরা প্রায়ই শ্রীমতী হালাসকোভাকে দেখতে পেতাম। ছেলেমেয়েরা

তাঁকে বলতো পপির পুতুল। সেই ঘাগরা আর পাউডার মাখা মুখখানিতে তাঁকে ঠিক পপি ফুলের মত দেখাতো। যেন পাঁপড়িগুলি ওপরে না হয়ে নিচে ঝুলে পড়েছে। লোকে বলতো এ ফরাসী কায়দার পোশাক।'

রাজকুমারী বললেন: 'তিনি হলেন আমার দিদিমা।'

'তাই নাকি! ভারী সুন্দরী!' দিদিমা মন্তব্য করেন।

'ডান দিকের ছবিখানি আমার দাদামশায়ের—আর বাঁ দিকে আমার বাবার ছবি—' রাজকুমারী দেখিয়ে বলেন।

'কি সুন্দর ছবি! আপনার মার ছবি এখানে নেই?'

লেখার টেবিলের ওপর দু'খানি ছবি দেখিয়ে রাজকুমারী বলেন: 'এই আমার মা আর এই আমার বোন।'

'চমৎকার! দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু আপনার বোনকে আপনার মা বা বাবা কারও মতই দেখতে নয়। সত্যিই কখনও কখনও চেহারা কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মত হয়। এই যুবকের ছবিখানি খুব পরিচিত বলে মনে হয়। কোথায় যেন দেখেছি।'

'এ হচ্ছে রাশিয়ার সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডার। এঁকে জানো না!'

'নিশ্চয়ই জানি। তাঁর প্রায় কুড়ি হাত কাছে আমার আসার সৌভাগ্য হয়েছিলো। খুব সুপুরুষ ছিলেন তিনি। এ ছবিখানি খুব অল্প বয়সের, তাহলেও আমি চিনতে পেরেছি। তিনি আর সম্রাট জোসেফ দুজনেই কি মহানুভবই না ছিলেন।'

রাজকুমারী এবার আর এক দেওয়ালের দিকে দেখালেন। একখানি পূর্ণ প্রতিকৃতি।

দিদিমা দু'হাত একসঙ্গে ক'রে বলে ওঠেন: 'সম্রাট জোসেফ। স্বপ্নেও ভাবিনি আজ তাঁকে দেখতে পাব। এত দয়ালু ছিলেন তিনি, বিশেষ ক'রে গরীবের ওপর। এই ডলারটি তিনি নিজ হাতে আমায় দিয়েছিলেন।' এই বলে দিদিমা গলার ডলারটি দেখান।

রাজকুমারী দিদিমার সরল কথায় খুশি হয়ে ডলায়ের কাহিনীটা জানতে চান। সব শুনে তিনি হাসেন। এবার তাকিয়ে দিদিমা রাজা ফ্রেডারিক্-এর ছবি দেখে বলে ওঠেন: 'ইনি তো প্রুশিয়ার রাজা! আমি ভালভাবেই জানি। আমার পরলোকগত স্বামী প্রুশিয়ার ফৌজে কাজ করতেন আর আমিও পনের বছর সাইলেসিয়াতে ছিলাম। একবার তিনি আমার স্বামীকে ডেকে উপহার দিয়েছিলেন। লম্বা লোক তিনি পছন্দ করতেন। আমার স্বামী ছিলেন দলের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা আর তেমনি গঠন ছিল তাঁর দেহের। কোনদিন ভাবিনি যে আমাকে তাঁর শেষ-সমাধি দেখতে হবে। এমনি পাথরের মত দেহ তাঁর,···আজ কতদিন হয় চলে গেছেন, আর আমি আজও বেঁচে আছি—' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিদিমা চোখের জল মুছে ফেলেন।

'তোমার স্বামী কি যুদ্ধে মারা যায়?' রাজকুমারী জিজ্ঞেস করেন।

'না যুদ্ধে ঠিক নয়। তবে যুদ্ধে আহত হয়েই পরে মারা যান। পোলাণ্ডে যখন বিদ্রোহ শুরু হয় আর প্রুশিয়ার রাজা রুশদের সঙ্গে সেই দেশ আক্রমণ করে, তখন সৈন্যদলে ছিলাম আমরা। আমিও ছেলে মেয়েদের নিয়ে ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে যেতাম। তখন আমার দু'টি ছেলেমেয়ে—তৃতীয়টির জন্ম হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। সেই ইয়োহানা এখন ভিয়েনায় আছে। জন্মের পরে থেকেই সে সৈন্যদের মত নানা দুঃখকষ্টে অভ্যস্ত হয়েছে বলেই ও খুব সাহসী।—সেই যুদ্ধই হলো কাল। প্রথম আক্রমণের পরই আমার স্বামী আহত হন। তাঁকে তাঁবুতে আমার কাছে নিয়ে এল। কামানের গোলায় তাঁর একখানি পা এমন জখম হয় যে তা কেটে বাদ দিতে হয়। সাধ্য মত আমি তাঁর শুশ্রূষা করি। একটু সুস্থ হলেই তাঁকে নাইসে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমি আবার সেখানে আসি তাঁর কাছে। ভেবেছিলাম যে সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর মত পঙ্গুকে তারা ছেড়ে দেবে—আমরা বোহেমিয়ায় ফিরে

আসবো। কিন্তু সে-আশা আর সফল হয় নি। দিনে দিনে তাঁর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। বুঝতে পারলাম যে আর বাঁচবেন না। যা কিছু সামান্য টাকা ছিল আমার হাতে তা চলে গেল ওষুধে। তবু কিছুই করতে পারলাম না তাঁর। মনে হলো আমার বিচার বুদ্ধি হারিয়ে গেছে—দুঃখে ভেঙে পড়লাম। তবু মানুষের সহ্য ক্ষমতা অসীম। তিনটি অনাথা আমার ওপর, কপর্দকহীন অবস্থায় তখন আমি। সেই সৈন্যদলে লেহোট্স্কী নামে ছিলেন আমার স্বামীর এক বন্ধু। তিনি আমায় আশ্বাস দিলেন। আমি কম্বল বুনতে পারি শুনে তিনি একখানি তাঁত এনে দিলেন আমাকে। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। অল্প বয়সে যে কাজ সখ ক'রে শিখেছিলাম, তাই তখন আমার সাহায্যে এল। আমার হাতের কাজ ভালই বিক্রি হতে থাকে। আমি লেহোট্স্কীর দেনা শোধ ক'রে দিলাম। আমার উপার্জনেই এখন ছেলেমেয়েদের ভাল ভাবেই চলে যায়। শহরের সবাই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে। কিন্তু স্বামী মারা যাবার পর আমি যেন ফসলের ক্ষেতের গাছের মত একা হয়ে পড়লাম।

'ভাবলাম বাড়িতে ভাল লাগবে। একদিন তাই লেহোট্স্কীর কাছে কথা পাড়লাম। তিনি কিন্তু উৎসাহ দিলেন না। বললেন : আমি নিশ্চয়ই পেনসান্ পাবো আর সম্রাট আমার ছেলেদের একটা হিল্লে ক'রে দেবেন। আশ্বস্ত হলাম—তবু বাড়ি ফেরা মনস্থ করলাম। জার্মান ভাষা আমার কাছে এক বাধা হয়ে দেখা দিল। আমরা যখন গ্রাট্সে ছিলাম সেখানে জার্মানের চেয়ে বোহেমিয়ান ভাষা বেশী চালু ছিল—কিন্তু নাইসে ঠিক তার উল্টো। আমি এই নতুন ভাষা শিখতে পারলাম না। আমরা সবে একটু গুছিয়ে বসেছি এমন সময় এলো বন্যা। সে যে কি বন্যা, বর্ণনা করা যায় না। জলের যখন রাগ হয়—তার হাত থেকে রেহাই নেই—ঘোড়ায় চড়েও পালাবার উপায় নেই।

এত হঠাৎ বান এসে গেল যে পালিয়ে বাঁচা দায়। যা কিছু হাতের কাছে পেলাম তাই বোঁচকা বেঁধে নিলাম। ছোট বাচ্চাটাকে কোলে ক'রে দুটোকে হাতে ধরে বেরিয়ে পড়লাম। লেহোট্স্কী এসে সাহায্য করলেন। শহরের উঁচু জায়গায় এসে পৌঁছোলাম। দয়া ক'রে লোকে আমাদের আশ্রয় দিলে।

'আমার সব কিছু খোয়া গিয়েছে শুনে সবাই ছুটে এলো সাহায্য করতে। সৈন্যাধ্যক্ষ আমায় ডেকে পাঠালেন, বললেন: বছরে আমার কয়েক ডলার মিলবে আর সেই সঙ্গে স্থায়ী কাজ। ছেলেটি সৈন্যদের স্কুলে ভর্তি হতে পারে আর মেয়েরা রাজকীয় কন্যা বিদ্যালয়ে। শুনে ভাল লাগলো না আমায়। বললাম, তাঁরা যদি দয়া ক'রে আমায় কিছু সাহায্য দেন, তবে আমি বোহেমিয়ায় ফিরে যাই। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে থাকতে আমি পারবো না। আমার মাতৃভাষায় যা দখল ছিল, তারই সাহায্যে তাদের আমি লেখাপড়া শেখাবো। তাঁরা রাজী হলেন না। বললেন—যদি আমি এখান থেকে চলে যাই তবে কোন সাহায্যই পাওয়া মুস্কিল হবে।

'না মেলে না মিলুক,' ভাবলাম আমি—ভগবান আমাদের দেখবেন।'

'মনে হয় তোমার ছেলেমেয়েদের ভালই ব্যবস্থা হতো—' রাজকুমারী মন্তব্য করেন।

'মাননীয়া রাজকুমারী, তা হয়তো হতো; তবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতো। কে তাদের দেশপ্রেমের শিক্ষা দিত? কোথায় শিখতো তারা তাদের মাতৃভাষা? তারা শিখতো বিদেশী-ভাষা, বিদেশী আচার-ব্যবহার। তারপর ভুলে যেত তারা নিজেদের দেশ। ভগবানের কাছে এর কি জবাব দিতাম আমি? বোহেমিয়ান্ রক্ত যাদের দেহে তারা বোহেমিয়ান্ ভাষাতেই কথা বলতে শিখুক। আমি যাত্রা করলাম। পেছনে পড়ে রইলো সেই শহর যেখানে আমার কত হাসি-কান্নার দিনগুলি কেটেছে।

লোকেরা আমার ছেলেমেয়েদের যত পারে খাইয়ে পথের জন্য কয়েকটি ডলার হাতে দিয়ে দিলে।...ভগবান যেন তাদের ছেলে-মেয়েদের সেই প্রতিদান দেন।...লেহোট্স্কী ইয়োহানাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রায় ছ মাইল পথ এলেন। আমরা চলে যাওয়ায় তাঁর বড় দুঃখ। বিদায় নেবার সময় দু'জনেই কাঁদলাম। নাইসে থাকাকালে তিনি আমার স্বামীর কবরে নিয়মিত প্রার্থনায় যেতেন। আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর ছিল ভাইয়ের মত ভালোবাসা। বেচারী পরে ফরাসী যুদ্ধে মারা যান।...তাঁর আত্মার যেন শান্তি হয়।'

'তারপর তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কি ক'রে বোহেমিয়ায় ফিরে এলে— ?' রাজকুমারী জিজ্ঞেস করলেন।

'পথে অনেক কষ্ট পেলাম। পথ না জানায় অনেক ঘুরতে হয়েছিলো। পা আমাদের রক্তাক্ত হয়ে যায়। কখনও কখনও ক্ষুধায়, শ্রান্তিতে, যন্ত্রণায় কাতর হয়েও কোন আশ্রয় খুঁজে পাইনি। তবু নির্বিঘ্নে ক্লাড্রন্ পাহাড়ে এসে পৌঁছোলাম। তখন মনে হলো যেন এসে গেছি। সাইলেসিয়ার সীমানা ওলেস্‌নিক থেকে আমি এসেছিলাম। বাড়ির কাছে এসে আর এক চিন্তা আমান মনে প্রবল হয়ে দেখা দিল। বাপ-মা বেঁচে আছেন কি না। তাঁরা আমাদের কি ভাবে গ্রহণ করবেন ? বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় তাঁরা আমায় কত কি দিয়েছিলেন— আর আজ আমি খালি হাতে ফিরে আসছি—সাথে তিনটি অনাথা। কি বলবেন তাঁরা আমাকে ? এ সব প্রশ্নই বারবার আমার মনে আসতে থাকে। আরও ভয় হয় আমার—দু'বছরে তাঁদের যদি কিছু ঘটে থাকে ! গত দু'বছর তাঁদের কোন খবর জানি না।'

'তুমি চিঠি লিখতে না তাদের ? তোমার স্বামীও না ?' রাজকুমারী আশ্চর্য হয়ে যান।

'চিঠি লেখার আমাদের খুব রেওয়াজ ছিল না। আমরা পরস্পরের

কথা চিন্তা ক'রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম। তারপর বন্ধুবান্ধব কারুর সেখানে যাবার সুযোগ হলে তাকে দিয়ে খবর বলে পাঠাতাম। চিঠি কখন কোথায় পৌছোবে তার কি স্থিরতা আছে? আমাদের গ্রাম থেকে যারা ফৌজে গিয়েছিলো তাদের বাবা তাদের কাছে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন—তাঁরা জানতে চাইতেন ছেলেরা বেঁচে আছে কি না—বা কখনও সামান্য টাকা পাঠানোর জন্য লিখতেন। কিন্তু তারা গাঁয়ে ফিরে এলে বলতো যে কোন চিঠিই তাদের হস্তগত হয়নি। গরীবের চিঠির তো পা থাকে না, এখানে-ওখানে পড়েই থাকে।

'না, না তুমি জান না—' রাজকুমারী তাড়াতাড়ি জবাব দেন : 'যারই চিঠি হোক না কেন, তা লেখা ঠিকানায় নিশ্চয়ই পৌছোবে। কেউ তা খুলতেও পারে না বা রেখে দিতেও পারে না। তা হলে তারা সাজা পাবে।'

'তাই তো হওয়া উচিত—তবু আমরা জানা লোককে দিয়ে খবর বলে পাঠাই। কাগজে সব কথা লেখা যায় না। তাছাড়া কেউ যদি বিশেষ কিছু জানতে চায় তার জবাব দেবে কে? তীর্থযাত্রী বা ফেরিওয়ালারা সব খবর হুবহু বলে। আমিও তাদের কাছে বাড়ির অনেক খবর পেতাম, কিন্তু হাঙ্গামার জন্য তারাও আর আসতো না।

'গ্রামে এলাম যখন তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। তখন গ্রীষ্মকাল। জানতাম এমনি সময়ে সবাই খেতে বসেছে। রাস্তা ছেড়ে আমরা বাগানের মধ্য দিয়ে চলেছি যেন কেউ না দেখতে পায়। আমাদের বাড়ি থেকে কুকুরগুলি বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে ডেকে ওঠে। আমি তাদের ডাকি, তারা আরও জোরে ডেকে ওঠে। আমার চোখে জল আসে, দুঃখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। ভুলে যাই যে পনের বছর আগে আমি এই বাড়ি ছেড়ে গিয়েছি—আর কুকুরগুলোও আর সেদিনের কুকুর নেই। বাগানে দেখলাম অনেক নতুন গাছ—বেড়া মেরামত

হয়েছে—গোলার ওপর নতুন ছাদ উঠেছে। যে পিয়ার গাছটির তলে আমি জর্জের সঙ্গে বসতাম সেটিকে ভগবানের দূত (বাজ) ছুঁয়ে গেছে। তার মাথাটি আর নেই। সামনের ছোট বাড়িটার কোন পরিবর্তন নেই। বাবা সেটি পরলোকগতা বিধবা নভতনির কাছ থেকে বার্ষিক ভাড়া নিয়েছিলেন। এই বিধবাই কম্বল তৈরি করতেন। আমার স্বামী তাঁরই ছেলে।

'একটি বুড়ো কুকুর, চোখে প্রায় দেখতে পায় না, হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। তাকে বললাম: তুই আমায় চিনতে পেরেছিস? সে আমার পায়ে গা ঘষতে থাকে। এমনি একটি বোবা পশু আমায় চিনতে পেরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে—দেখে আমি অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। দু'চোখ বেয়ে জল পড়ে আমার। বেচারী ছেলেমেয়েরা! তারা আমায় কাঁদতে দেখে বিস্মিত চোখে চেয়ে থাকে। আমি তাদের বলিনি যে তাদের দাদুর বাড়ি নিয়ে চলেছি—পাছে তারা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়। ক্যাস্‌পার জিজ্ঞেস করে: মা কাঁদছো কেন? এখানে কি আমাদের রাতের আশ্রয় মিলবে না? এখানে একটু জিরিয়ে নিই। আমি বোঁচকাটি বয়ে নিয়ে যাবো। এখনও আমাদের খিদে পায়নি।...ইয়োহানা ও থেরেসা দু'জনেই রাজী হয়। কিন্তু আমি জানি তাদের খিদে পেয়েছে—তারা সারাদিন হেঁটেছে।...

'না বাছা, সেজন্য কাঁদছি না। আজ আমাদের পথের শেষ। এই বাড়িতেই তোমাদের বাবার জন্ম আর দূরে ঐ বাড়িটায় তোমাদের মা'র। এ তোমাদের দাদুর বাড়ি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো যে নির্বিঘ্নে বাড়ি এসেছি। প্রার্থনার পর আমরা ছোট বাড়িটায় গেলাম। বাবা মা সেখানেই থাকতেন। দরজার ওপর কুমারী মেরীর সঙ্গে চোদ্দজন সন্ন্যাসীর ছবি। এখানি জর্জ ভ্যাম্বেরিট্‌স তীর্থ থেকে মায়ের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। আমার মন থেকে এক গুরুভার লঘু

হয়ে গেল। ভাবলাম আমি চলে যাবার সময় এঁরাই আমায় আশীর্বাদ জানিয়ে ছিলেন—আবার ফিরে আসতে আমার জানাচ্ছেন অভ্যর্থনা। অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলাম।···

'বাবা, মা, বুড়ি বেট্‌সে টেবিলে বসে সকলে স্যুপ খাচ্ছে—দুধের স্যুপ, ময়দার ও ডিম দিয়ে ঘন করা। এ যেন গতকালের ঘটনা···এমনি স্পষ্ট আমার মনে আছে। বললাম: "যিশুর জয় হোক," উত্তর এল "চিরকাল"। এ রাতের মত এখানে আমার বাচ্চাদের জন্য আশ্রয় পেতে পারি কি? অনেক দূর থেকে আসছি আমরা। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে কাতর আমরা—। ব'লে উত্তেজনায় আমার গলা কেঁপে উঠলো। তাঁরা আমায় চিনতে পারলেন না—তাছাড়া ঘরের মধ্যেও কতকটা অন্ধকার। বাবা চামচ রেখে দিয়ে বললেন: বেট্‌স, আর একটু স্যুপ তৈরি ক'রে আনো। তারপর তোমাদের রাতের শোবার ব্যবস্থা ক'রে দেবো। কোথা থেকে আসছো তোমরা?···

'বললাম: সাইলেসিয়ার নাইস্‌ থেকে। বাবা বললেন: আমাদের মেয়েও থাকে সেখানে। মা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন: তার কথা তুমি কিছু শুনেছো? শ্রীমতী নভতনি—তার স্বামী একজন সৈনিক। মেয়ের খবর দু'বছর পাই নি। জানি না সে কেমন আছে। কিছুদিন আগে এক দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম—দেখি আমার একটি দাঁত পড়ে গেছে। সেই থেকে সব সময়ই আমার মেয়ের আর তার ছেলেমেয়েদের কথা মনে হয়। কি জানি জর্জেরই বা কিছু হয়েছে কি না। সবসময়ই তাদের যুদ্ধ লেগে আছে। ভগবানই জানেন কেন তারা একে অন্যকে রেহাই দেয় না।···

'আমি কাঁদলাম। ছেলেমেয়েরা তাদের দিদিমার কথা শুনে আমার ঘাগরা টেনে জিজ্ঞেস করে: মা, ইনিই কি আমাদের দিদিমা-দাদু? তারা এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই মা আমায় চিনতে পেরে গলা জড়িয়ে ধরলেন।

বাবা ছেলেমেয়েদের টেনে নিলেন কোলে। তারপর যা ঘটেছে সব বললাম তাঁদের। বেট্‌সে ছুটে গিয়ে সবাইকে ডেকে আনে। অল্পক্ষণেই সারা গ্রাম ভেঙে পড়লো—তারা আমায় তাদের বোনের মত জানালো অভ্যর্থনা। বাবা বললেন : তুই ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফিরে এসে ভালই করেছিস্‌। পৃথিবী যদিও ভগবানের তবুও নিজের দেশ সবার কাছেই প্রিয়তম। যতদিন আমাদের ভগবানের কৃপায় রুটি মিলবে তোর বা ছেলেমেয়েদের অভাব হবে না—তুই কাজ না করলেও না। তোর কপাল খারাপ—তবে ভগবান যাকে ভালবাসেন তাকেই সাজা দেন।...

'আবার আমি বাড়িতে সবার মধ্যে ফিরে এলাম। আমার ভাই আমাকে তার বাড়িতে থাকতে বললে। কিন্তু আমি বাপ মার সঙ্গে, যেখানে আমার স্বামী বাস করতেন সেখানেই থাকা মনস্থ করলাম। ছেলেমেয়েরা সহজেই মানিয়ে নেয়, বাপ মাও তাদের খুব ভালবাসেন। তাদের আমি স্কুলে পাঠালাম। আমি বাড়ি বসে কম্বল তৈরি ক'রে ভালই রোজগার করি। তখন বড়ই দুঃসময়—চারদিকে যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ। এক বুশেল রাই-এর দাম একশো গিল্‌ডার। তবে ভগবানের দয়ায় আমাদের কোনমতে চলে যায়। এত দুঃসময় যে লোকে টাকা হাতে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কিছুই কিনতে পায় না। আমার বাবার মত বড় একটা মানুষ দেখা যেত না। তিনি সবাইকে যেমন ভাবে পারেন সাহায্য করতেন। প্রতিবেশীরা অনুপায় হয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসতো। গরীব চাষীরা এসে বলতো : আমাদের এক বুশেল রাই দিন কর্তা—ঘরে কিছুই নেই দাঁতে কাটার মত। তিনি বলতেন : আমার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তোমরাও পাবে। মা তাদের ঝুলি ভর্তি ক'রে দিতেন। দাম নিতেন না কখনও। বলতেন : প্রতিবেশীরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য না করলে এ দুনিয়ায় বাস করা যায়? ভগবানের দয়ায় তোমাদের আবার ফসল হলে আমায় ফেরৎ দিয়ো। মাও

ছিলেন তেমনি। কেনই বা সাহায্য করবেন না? আমাদের খাওয়া পরায় অভাব ছিল না। বাকী যা কিছু তা সবার সঙ্গে ভাগ ক'রে খাব না কেন? এ আমাদের দয়া নয়, এ হলো ধর্মের মূল কথা। কেউ যদি নিজেকে অন্যের জন্য বঞ্চিত করে তা পুণ্যেরই কাজ। তারপর এমন অবস্থা দেখা দিল যে আমরা একবেলা খেয়ে অন্যকে সাহায্য করছি। এমনি ক'রে দুঃসময় কেটে গেল। দেশে আবার শান্তি ফিরে এল।

'ক্যাস্‌পার স্কুল শেষ ক'রে তাঁতবোনা শিখতে চায়। আমি আপত্তি করলাম না। হাতের কাজই তো ঘরের লক্ষ্মী। সে শিক্ষানবিশী শেষ ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। স্বামী বলতেন, যে কারিগর বাড়ি থেকে বেরোয় না সে হতভাগা। এখন তার ভাল অবস্থা।

'মেয়েদের আমি ঘরের কাজ শিক্ষা দিই। সেই সময় আমার মামাতো বোন ভিয়েনা থেকে আমাদের গ্রামে বেড়াতে এল। থেরেসাকে তার খুব ভাল লাগে, তাকে ভিয়েনা নিয়ে যেতে চায়। আমার কিন্তু তাকে ছেড়ে বড় কষ্ট হয়, তবু তার সৌভাগ্যে বাদ সাধতে ইচ্ছে হলো না। ডরথি বড় ভাল, তাদের অবস্থাও ভাল কিন্তু ছেলেমেয়ে নেই। সে থেরেসাকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করে এবং তার বিয়ের সময় ঘরসংসারের অনেক জিনিসপত্র দেয়। প্রথমে আমি মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম যে সে এক জার্মানকে বিয়ে করলো বলে। কিন্তু এখন আর তা ভাবি না। জন্‌ ভালমানুষ—আমরা এখন পরস্পরকে বুঝতে পারি। তাছাড়া ছেলেমেয়েরা—তারা তো আমার। থেরেসা চলে গেলে ইয়োহানা আবার ডরথির কাছে গেছে। সেও তার ঘরসংসার পেতে বসেছে, এখন খুব সুখী। এই নতুনদের যুগ একেবারে অন্যরকম। আমি কখনও বাড়ি ছেড়ে এদের মধ্যে আসতে চাই নি।...

'কয়েক বছর পরে বাবা মা মাত্র ছ' সপ্তাহের ব্যবধানে মারা

গেলেন। প্রদীপের শিখার মত নীরবে নিবে গেলেন তাঁরা। একে অন্যের জন্য বেশীদিন শোক ভোগ করেন নি। ষাট বছর তাঁরা একসঙ্গে বাস করেছিলেন। ভগবান তাঁদের আত্মার মঙ্গল করুন।'

রাজকুমারী জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমার ছেলেমেয়েরা চলে গেলে তোমার একা একা বোধ হয় নি?'

'রক্ত আর জল এক নয়। কখনও চোখের জল ফেলেছি—তবে তাদের সুখের জন্য কখনও অভিযোগ করিনি। তাছাড়া আমিও একা ছিলাম না। পাড়া প্রতিবেশীদের ঘরে যখন ছেলেমেয়েদের জন্ম হয়, তারা যখন বেড়ে ওঠে—তাদের আমি নিজের ছেলেমেয়ে বলেই মনে করতাম। আমরা যদি অন্তর থেকে কাউকে ভালবাসি তবে অন্যের ভালবাসাও বুঝতে পারি। মেয়েরা আমায় ভিয়েনা যেতে বলে বার বার। জানি, সেখানেও ভাল লোকের বাস। আমার অভাব হবে না। কিন্তু সে অনেক দূর, এ বয়সে আর নড়াচড়া চলে না। তারপর কে জানে ভগবান কখন ডাকবেন—আমার হাড় কখানি যেন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের পাশে বিশ্রাম পায়। মাপ করবেন আমায়—এত কথা বলছি আপনাকে—' দিদিমা এবার উঠে পড়লেন।

'না, না তোমার কথা আমার শুনতে ভাল লাগছে।' এই বলে রাজকুমারী দিদিমার কাঁধে হাত দিয়ে বলেন: 'এবার এসো আমার সঙ্গে, অল্প কিছু মুখে দেবে। ছেলেমেয়েদেরও এতক্ষণে নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।' দিদিমাকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি। সেখানে কফি, চকোলেট্, আরও কত কি। বেয়ারা হুকুমের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে। রাজকুমারী তাকে কাউণ্টেস্ ও ছেলেমেয়েদের ডেকে আনতে বললেন।

কয়েক মিনিটেই তারা এসে গেল। ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে বলে: 'দিদিমা, দিদিমা, দেখ কাউণ্টেস হোরটেন্‌সে আমাদের কি

দিয়েছেন।' প্রত্যেকেই সবচেয়ে আগে তার পাওয়া উপহার দেখতে যায়।

'কি সুন্দর! সারাজীবনেও আমি এমন সুন্দর জিনিস দেখিনি; কাউণ্টেসকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলনি নিশ্চয়ই।'

ছেলেমেয়েরা ঘাড় নাড়ে।

দিদিমা তখন বলেন: 'না জানি মান্‌চিক্কা এসব দেখে কি বলবে? চিক্কা ও ভাখ্‌লাভই বা কি বলবে?'

'মান্‌চিক্কা, চিক্কা, ভাখ্‌লাভ তারা কে?' রাজকুমারী জিজ্ঞেস করেন।

'আমি জানি—এরা আমায় বলেছে,' কাউণ্টেস্ জবাব দেয়: 'মানচিক্কা মিলারের মেয়ে, চিক্কা ও ভাখ্‌লাভ অর্গান-বাজিয়ের ছেলেমেয়ে। বারুক্কা বলে—ওরা বিড়াল, কাঠবিড়াল, কাক সব কিছুই খায়। তাই সবাই ওদের এড়িয়ে চলে।'

'কেন, ওরা গরীব বলে? না বিড়াল, কাঠবিড়াল খায় বলে?' রাজকুমারী জিজ্ঞেস করেন।

দিদিমা জবাব দেন: 'বিড়াল, কাঠবিড়াল খায় বলে।'

'কেন কাঠবিড়াল খেতে খারাপ নয়। আমি নিজেও খেয়েছি।'

'কিন্তু সখ ক'রে খাওয়া আর অভাবে পড়ে খাওয়া তো এক নয়।'

কথাবার্তার মাঝে রাজকুমারী টেবিলে বসলেন। হোরটেন্‌সে তার দু'ধারে ছেলেমেয়েদের বসিয়ে দিলে। দিদিমাকেও বসতে হলো। কাউণ্টেস্ তাঁকে কফি বা চকোলেট্ দিতে গেলে দিদিমা বললেন: তিনি কফি বা চকোলেট্ কিছুই খান না।

'তাহ'লে সকালে তুমি কি খাও,' জিজ্ঞেস করেন রাজকুমারী।

'ছোটবেলা থেকেই আমার টক্ স্যুপ খাওয়া অভ্যেস। টক্ স্যুপ আর আলু—এই হলো আমার সকালের খাওয়া, দুপুরেও তাই, রাত্রেও।

রবিবারে কখনও কখনও স্যুপ আর আলুর সঙ্গে এক টুকরো ওটের রুটি। রিসেন্ পাহাড়ে এই হলো লোকের সাধারণ খাবার। এই মিললেই তারা সুখী। পাহাড় ছাড়িয়ে মটর, সাদা ময়দা, কপি বা কখনও কখনও মাংসও মেলে। কিন্তু গরীবদের এর প্রয়োজন কি? তাছাড়া এসব পুষ্টিকরও না।'

'তা ঠিক নয়। এসব খুব পুষ্টিকর। তাছাড়া রোজ যদি এরা একটু ক'রে মাংস ও ভাল পানীও পায় তাহলে এরা আরও শক্তি পাবে দেহে।' রাজকুমারী বলেন।

'তা হবে, রোজই আমরা নতুন নতুন তথ্য জানতে পাই। আমার ধারণা ছিল, বড়লোকেরা এত রোগা, কারণ তাদের সুখাদ্য পুষ্টিকর নয়।'

রাজকুমারী হাসেন, জবাব দেন না। তিনি দিদিমাকে একটি ছোট গ্লাসে মিষ্টি মদ দিয়ে বলেন: 'এটুকু খেয়ে নাও, তোমার শরীর গরম হবে। তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল।'

দিদিমা গ্লাসটি তুলে ধরে বলেন: আপনার স্বাস্থ্যর উদ্দেশ্যে।' গ্লাস থেকে পানও করেন একটু। পাছে রাজকুমারী কিছু ভাবেন তাই তিনি একখানি কেক তুলে নেন।

জন ফিস্ ফিস্ ক'রে হোরটেন্সেকে জিজ্ঞাসা করে: 'রাজকুমারী ঝিনুক থেকে খাচ্ছেন ওটা কি?'

'ওটা সমুদ্রের এক প্রাণী।'

'মনে হয় না চিক্কা এ খায়,' জন মন্তব্য করে।

কথাবার্তার মাঝে বারুস্কা দিদিমার জামার পকেটে কি যেন রেখে দিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে: 'দিদিমা রেখে দাও। এ টাকা হোরটেন্সে দিয়েছে কুডারনাদের ছেলেমেয়েদের জন্য। আমার কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে।'

বারুস্কার কথা রাজকুমারীর কানে গেল। তিনি প্রশংসার দৃষ্টিতে কাউণ্টেস্-এর দিকে চাইলেন। দিদিমাও সুখী হলেন। তিনি

কাউণ্টেস্‌-এর দিকে চেয়ে বললেন : 'কাউণ্টেস্‌, ভগবান তোমার ভাল করবেন।'

লজ্জায় কাউণ্টেস্‌-এর মুখখানি লাল হয়ে যায়। সে বারুস্কার দিকে ফিরে হাতের আঙুল দিয়ে ইশারা করে।

'ওরা নিশ্চয়ই খুব সুখী হবে। এব'র ওদের জামা কাপড় হবে।'

'আরও কিছু আমি ওদের পাঠিয়ে দেব,' রাজকুমারী বলেন।

'এ আপনার খুবই দয়া, তবে ওদের যদি অন্য কোন ভাবে সাহায্য করেন, শুধু ভিক্ষে দিয়েই নয়।'

'কি ভাবে?'

'কুডারনা যদি একটি স্থায়ী কাজ পায়। সাহায্য পেয়ে তখনকার মত তার অভাব ঘুচবে বটে কিন্তু আবার তার আগের অবস্থা ফিরে আসবে। ওর যদি একটি স্থায়ী কাজ থাকে তাহলে ওরও সাহায্য হয়, আপনারও একজন বিশ্বাসী ভৃত্যের সংখ্যা বাড়ে।'

'সত্যি কথা। কিন্তু কি চাকরি ওকে দেবো? বাজিয়ে?'

'যে কোন কাজই করতে পারে। বন পাহারা বা মাঠ পাহারা। তাছাড়া ওর অর্গান সঙ্গে নিয়ে তা বাজিয়ে আনন্দ করবে। ওরা ভারী আমুদে।'

'দেখি কি করা যায়,' রাজকুমারী বলেন।

কাউণ্টেস্‌ উঠে গিয়ে রাজকুমারীর হাতে চুমো দেয়। দিদিমা তাদের দিকে চেয়ে বলেন : 'দেবদূত সবসময়ই ভাল মানুষের সঙ্গে থাকে।'

রাজকুমারী চুপ ক'রে থাকেন। তারপর অভিভূত হয়ে বলেন : 'একে পেয়ে আমি সর্বদাই ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই।' দিদিমার দিকে চেয়ে তিনি বলেন : 'তোমার মত একজন—যে সর্বদা সত্য কথা বলে—এমনি একজন বন্ধু পেয়ে আমি খুশি।'

'এমনি বন্ধু পাওয়া কঠিন হবে না, তবে বেশীদিন তাকে রাখা সহজ নয়।'

'কেন? আমি তার কথা শুনবো না।'

'তা নয়, তবে এই স্বাভাবিক। কখনও কখনও সত্য কথা শুনতে ভাল আবার কখনও তা বড় অপ্রিয়। তখনই বন্ধুও অপ্রিয় হয়ে যায়।'

'তোমার কথাই ঠিক। তবে আজ থেকে তোমায় সুযোগ দিলাম —যে যা তোমার ইচ্ছে আমায় এসে বলতে পারো। তোমার কোন দরখাস্ত এলে আমার সাধ্য থাকলে তা মঞ্জুর করবো।' এই বলে রাজকুমারী টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়াল। দিদিমা নিচু হয়ে রাজকুমারীর হাতে চুমো খেতে যান কিন্তু রাজকুমারী বাধা দিয়ে দিদিমার গালে চুমো খেলেন। ছেলেমেয়েরা তাদের উপহারগুলি গুছিয়ে নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হয়।

আডেল্‌কাকে হোরটেন্‌সের হাত থেকে কোলে নিয়ে দিদিমা বলেন: 'আমাদের ওখানে একবার এসো।'

'হাঁ এসো,' ছেলেমেয়েরা সমস্বরে বলে ওঠে: 'তোমার জন্য ষ্ট্রবেরী কুড়িয়ে রাখবো।'

বিদায় নিয়ে দিদিমা বলেন: 'মাননীয়া রাজকুমারী, আপনাকে সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ জানাই। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।' কাউন্টেস্ সবাইকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

টেবিল পরিষ্কার করতে এসে বেয়ারা চোখ দুটি ওপরে তুলে যেন বলতে চায়: 'এ আবার কি সখ! রাজকুমারীর আবার এই বুড়ীর সঙ্গে এত গল্প কিসের!'

জানালায় দাঁড়িয়ে থাকেন রাজকুমারী। ছেলেমেয়েদের সাদা পোশাক আর দিদিমার সাদা টুপি যতক্ষণ গাছপালার মধ্যে দেখা যায়

তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন। তারপর বসবার ঘরে ফিরে এসে মনে মনে বলেন: 'কি সুখী এই বৃদ্ধাটি!'

সাত

ক্যাসেলের মাঠে ফুলের হাট বসেছে। মাঠের মধ্যে একটি ছোট ঢিবি, তার ওপর থাইমি গাছের ঝোপ। সেখানে আডেলকা বসে তাকিয়ে আছে একটি লেডীবার্ড পোকার দিকে। পোকাটি তার কোল থেকে পায়ে, পা থেকে জুতোয় এমনি ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে। পোকাটিকে সে বলে: 'পালিয়ে যেয়ো না। আমি তোমায় মারবো না।' এই বলে সে পোকাটিকে কোলের ওপর তুলে নেয়।

আডেলকার কাছেই জন্ আর উইলি একটি পিঁপড়ের ঢিবির পাশে বসে পিঁপড়ের ঝাঁকের ছুটোছুটি দেখে। 'দেখ উইলি, কেমন ছুটে যাচ্ছে এই পিঁপড়েটি। দেখ ও একটি ডিম ফেলে দিয়েছে, অন্যগুলো সেটা নিয়ে ঢিবির দিকে চলেছে।'

'দাঁড়া,—আমার পকেটে রুটির গুঁড়ো আছে। দিয়ে দেখি কি করে ওরা,' এই বলে সে রুটির গুঁড়ো পিঁপড়ের ঝাঁকের কাছে ছিটিয়ে দেয়।

'দেখ দেখ, ওরা কেমন ছুটে আসছে। চারদিক থেকে ছুটে আসছে। কি ক'রে জানলো ওরা যে এখানে রুটি আছে?'

এমনি সময় এক মিষ্টি গলার আওয়াজ: 'কি করছো তোমরা এখানে?' কাউণ্টেস্ হোরটেন্সে একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা এতক্ষণ দেখতেই পায়নি।

আডেলকা কাউণ্টেসকে তার হাতের মুঠো দেখিয়ে বলে: 'আমার হাতে একটি পোকা।'

কাউণ্টেস ঘোড়া থেকে নেমে তার কাছে এসে বলে: 'দেখি!'

হাত খুলে আডেলকা দেখে হাত খালি। সে বলে ওঠে: 'পালিয়ে গেছে।'

'দাঁড়াও, এখনও পালায়নি,' এই বলে কাউণ্টেস ছোট মেয়েটির কাঁধ থেকে পোকাটিকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে: 'কি করবে এটা দিয়ে?'

'উড়িয়ে দেবো। দেখ কেমন ক'রে উড়ে যায়।' আডেলকা তার হাতে পোকাটিকে রেখে উঁচু ক'রে বলে: 'পিঙ্কো, পিঙ্কো, পিঙ্কো, লিঙ্কো—যা স্বর্গের জানালায় উড়ে যা।'

'যা তাড়াতাড়ি উড়ে যা,' এই বলে উইলি আডেলকার হাতে ধাক্কা দিয়ে দেয়। পোকাটি তখন পাখা খুলে উড়ে যায়।

'ধাক্কা দিলি কেন?' আডেলকা রেগে ওঠে।

'যাতে তাড়াতাড়ি যায়—' হেসে ছেলেটি কাউণ্টেস-এর দিকে চেয়ে তার হাত ধরে বলে: 'দেখে যাও পিঁপড়ের মজা। তাদের রুটির গুঁড়ো দিয়েছি আর তা তারা ছেঁকে ধরেছে।'

কাউণ্টেস তার পকেট থেকে এক ডেলা চিনি বের ক'রে উইলিকে দিয়ে বলে: 'ঘাসের ওপর রেখে দাও, দেখবে এখনই কেমন পিঁপড়ের ঝাঁক এসে যায়। ওরা মিষ্টি খুব ভালবাসে।'

উইলি ঘাসের ওপর চিনি রেখে দিতেই, চারদিক থেকে পিঁপড়ের ঝাঁক এসে তা থেকে এক এক দানা টেনে নিয়ে যায়। তাই দেখে সে আশ্চর্য হয়ে কাউণ্টেসকে জিজ্ঞেস করে: 'ওরা কি ক'রে জানতে পারলো যে এখানে চিনি পড়ে আছে? আর ঢিবি থেকে ওরা ডিম-গুলো একবার ভিতরে একবার বাইরে নিয়ে এসে করছে কি?'

'এই ডিমগুলোই হচ্ছে ওদের ছেলেমেয়ে, আর যারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা ওদের ধাই। গরমের দিনে ডিমগুলিকে গর্ত থেকে বাইরে রোদে নিয়ে এলে এগুলি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।'

আডেলকা জিজ্ঞেস করে: 'ওদের মা কোথায়?'

'তারা ঘরে বসে শুধু ডিম পাড়ে, যেন পিঁপড়ের বংশ মরে শেষ না হয়ে যায়। বাপেরা মার চারদিক থেকে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে তাদের খুশি রাখে। আর যে সব পিঁপড়ে বাইরে দেখছো এরা সব কর্মী।'

'কি করে এরা ?' জন জিজ্ঞেস করে।

'এরা খাবার যোগায়, বাড়ি তৈরি করে, বাচ্ছাদের দেখাশুনো করে, তাছাড়া অন্য পিঁপড়ের ঝাঁক এসে আক্রমণ করলে এরাই যুদ্ধ করে।'

'এরা তো কথা বলতে পারে না, তবে একে অন্যকে কি ক'রে বুঝতে পারে ?'

'ভাষা না থাকলেও এরা একে অন্যকে ঠিক বুঝতে পারে। দেখনি একটি পিঁপড়ে চিনি দেখতে পেয়েই, ছুটে গিয়ে অন্যদের খবর দেয়, তখন ঝাঁকে ঝাঁকে আরও পিঁপড়ে এসে হাজির হয়। দেখ, দেখ, একে অন্যের সাথে দেখা হলে ওরা পরস্পর কেমন কথা বলে। আর ঐ দেখ এক-একটি ঝাঁক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে কেমন পরামর্শ করছে !'

আডেল্‌কা জিজ্ঞসা করে : 'ওদের বাড়িতে রান্নাঘর, বসবার ঘর আছে ?'

'ওদের রান্নাঘরের দরকার কি ? ওরা তো রান্না করে না। তবে ওদের বাচ্ছাদের আর মায়ের জন্য ঘর আছে আর কর্মীদের জন্যও থাকার জায়গা আছে। ওদের বাড়িগুলি দু, তিন, চারতলা পর্যন্ত হয়। আর একতলা থেকে অন্য তালায় যাবার জন্য চিবির তল দিয়ে রাস্তাও আছে।'

'ওরা বাড়ি তৈরি করতে শিখলো কি করে ?' উইলি জিজ্ঞস করে।

'ওরা বাড়ি তৈরি করতে ওস্তাদ। কেউ ভেঙ্গে না দিলে তা অনেকদিন থাকে। ছোট ছোট পাথরের টুকরো, খড়, শুকনো পাতা,

ঘাস আর মাটি দিয়ে ওরা ওদের বাড়ির দেওয়াল আর ছাদ তৈরি করে। মুখে ক'রে মাটি ভিজিয়ে নিয়ে, তাই দিয়ে গাঁথে যেমন ক'রে মিস্ত্রী ইঁট দিয়ে বাড়ি করে। মাটিতে শিশির পড়ার সময়ই ওদের মরস্থম, কারণ তখনই ওদের কাজের স্থবিধে।'

ছোট্ট উইলি আবার জিজ্ঞাসা করে: 'কে ওদের এ সব কাজ শিখিয়েছে ?'

'ভগবান ওদের এক ক্ষমতা দিয়েছেন যার নাম স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই কারও কাছে না শিখেও ওরা ওদের কাজ করতে পারে। ওরা কখনও কখনও ওদের ঘরবাড়ির কাজে ও খাবার যোগাড়ের কাজে এত দক্ষ যে মনে হয় যেন মাহুষের মত ক্ষমতা ওদের। তোমরা যখন স্কুলে যাবে তখন তোমরাও আমার মত সব জানতে পারবে,' কাউণ্টেস্ বলে।

এমনি যখন কথাবার্তা চলছে তখন দিদিমা বারুস্কাকে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন। তাদের এপ্রন্ ভরা ফুল, আর দু'হাতে নানা রকমের ওষুধের গাছগাছড়া। ছেলেমেয়েরা তাদের নতুন জানা পিঁপড়ের কথা সবিস্তারে বলে।

কাউণ্টেস্ জিজ্ঞেস করে: 'কি হবে এই সব গাছগাছড়া দিয়ে ?'

'এর কতকগুলি কারাওয়ে আর কতকগুলি এগ্রিমনি গাছগাছড়া। কারাওয়ে শুকিয়ে তার বিচি দিয়ে রুটি তৈরি হয়। শুকনো গাছগুলি বাচ্ছাদের স্নানের জলে ব্যবহার হয়। এগ্রিমনি গলা ব্যথার পক্ষে খুব ভাল। সব সময়ই আমার কাছে কিছু ওষুধের গাছগাছড়া থাকে। পাড়া প্রতিবেশীদের দরকার হলে আমি পাঠিয়ে দিই। হাতে কিছু থাকা ভাল, কি জানি কার কখন দরকার পড়ে।'

'গ্রামে কি ওষুধের দোকান নেই ?' কাউণ্টেস্ জিজ্ঞেস করে।

'গ্রামে নেই। শহরে আছে, তা এখান থেকে এক ঘণ্টার পথ।

আর গ্রামে থাকলেই বা কি ? সে তো খরচের ব্যাপার। যা আমরা ঘরে তৈরি করতে পারি তার জন্য বেশী দাম দেব কেন—'

'ডাক্তার নিশ্চয়ই ওষুধ তৈরির পদ্ধতি বলে দেয়।'

'তা ঠিক। তবে ছোটখাটো অসুখে ডাক্তার ডাকতে হলেই হয়েছে আর কি! ডাক্তারের বাড়ি এখান থেকে এক ঘণ্টার পথ। তাকে ডাকলে আসতে আসতে অর্ধেক দিন কেটে যাবে। ততক্ষণে রুগী হয়তো মরেই যাবে যদি না ঘরে কিছু ওষুধ থাকে। তারপর ডাক্তার এলেও কম ঝঞ্ঝাট নাকি! নানা রকমের ওষুধ, পুলটিস্, জোঁক আরও কত কি! বাড়ির সবাই তটস্থ আর রুগীও ভয়ে প্রায় মরমর। ডাক্তারে আমার বিশ্বাস নেই বাপু! এই গাছগাছড়ায় সবসময়ই আমার ও ছেলেমেয়েদের ভালই হয়েছে। তবু অন্য কারও অসুখ করলে আমি বলি: ডাক্তার ডেকে আনো। তাছাড়া কঠিন অসুখ করলে ডাক্তারই বা কি করবে, তারা তখন রুগীকে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেয়। ভগবানই সবচেয়ে সেরা ডাক্তার। কেউ যদি বাঁচে তা হলে ডাক্তারের দরকার হয় না আর যদি মরে তাহলে সারা দোকানের ওষুধেও কোন কাজ হবে না।'

'তোমার এপ্রনে কি সব ওষুধের গাছ ?' কাউন্টেস্ জিজ্ঞেস করে।

'না, না,' বারুস্কা জবাব দেয়: 'এ ফুলে আমরা মালা তৈরি করবো। কাল "করপাস্ ক্রিষ্টি" উৎসব। আমি আর মান্‌চিস্কা মালা নিয়ে শোভাযাত্রায় যাবো।'

'আমিও যাবো হেলার সাথে,' আডেলকা বলে।

ছেলেরা বলে ওঠে: 'আমরা হবো ছোট চাষী।'

'হেলা কে ?' কাউটেস্ জিজ্ঞেস করে।

'হেলা শহরে থাকে। আমার ধর্মমার মেয়ে। সিংহওয়ালা বড় বাড়িটা ওদের।'

'বলো হোটেল-বাড়িটা,' দিদিমা বুঝিয়ে দেন।

বারুষ্কা জিজ্ঞেস করে : 'হোরটেন্‌সে, তুমিও যাবে শোভাযাত্রায় ?'

'নিশ্চয়ই,' মাটিতে বসে ফুল বাছতে বাছতে কাউন্টেস্ জবাব দেয়।

বারুষ্কা আবার জিজ্ঞেস করে : 'কখনও তুমি করপাস্ ক্রিষ্টিতে ফুলের মালা নিয়েছো ?'

'না, যখন আমি ফ্লোরেন্সে ছিলাম তখন একবার ম্যাডোনার উৎসবে ফুলের মালা নিয়েছিলাম।'

'ম্যাডোনা কে ?'

'ইটালীতে কুমারী মেরীকে ম্যাডোনা বলে।'

দিদিমা বলেন : 'হোরটেন্‌সে তাহলে ইটালীর মেয়ে ? ওখানেই তো আমাদের সৈন্যদের ছাউনি ছিল।'

'হাঁ, তবে ফ্লোরেন্সে নয়। ফ্লোরেন্সে খড দিয়ে কি সুন্দর টুপি তৈরি হয়। পাকা ফসল আর ধানের ক্ষেত, বনে বনে মিষ্টি বাদাম আর অলিভ্! সাইপ্রেস্ আর লরেলের ঝোপ, ফুল আর নীল আকাশ! কি যে সুন্দর !'

'জানি আমি,' বারুষ্কা বলে : 'এই ছবিই তো তোমার ঘরে দেখেছি। তাই না ? মাঝখানে একটি বড নদী, তার পাড়ে উঁচু পাহাড়। তার ওপর একটি শহর। দিদিমা, কি সুন্দর সুন্দর বাড়ি গির্জা সেখানে! এক দিকে ছোট ছোট বাড়ি আর বাগান। একটি বাড়ির সামনে একটি ছোট মেয়ে খেলা করছে—তার পাশে বসে এক বুড়ী। হোরটেন্‌সে আর তার ধাত্রী। তাই না? ক্যাসেলে তুমি বলেছিলে আমাদের—', বারুষ্কা কাউন্টেস্-এর দিকে চায়।

কাউন্টেস্ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় না। হাত দু'খানি তার নিশ্চল, কোলের ওপরে পড়ে আছে। গভীর চিন্তামগ্ন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে : 'ওগো আমার প্রিয় জন্মভূমি! ওগো আমার প্রিয় বন্ধু !'

আডেল্‌কা স্নেহভরে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে : 'কি বললে ?'

হোরটেন্‌সে স্নেহভরে আডেল্‌কার মাথার ওপর রাখে। দু'গাল বয়ে তার চোখের জল টপ্ টপ্ ক'রে পড়ছে।

দিদিমা বলেন : 'হোরটেন্‌সের বাড়ির কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা মনে পড়েছে। তোমরা ছেলেমানুষ, ছোটবেলায় মানুষ যেখানে থাকে তা ছেড়ে আসা যে কি, তা তোমরা বুঝবে না। যতই সুখে সে থাকুক না কেন, সে-কথা ভুলতে পারা যায় না। তোমরাও হয়তো কখনও তা অনুভব করবে। তোমার কি ফ্লোরেন্সে কোন আত্মীয় স্বজন আছে ?'

'জগতে কোথাও আমার কোন আত্মীয় আছে বলে জানি না,' কাউণ্টেস্ ক্লিষ্ট কণ্ঠে জবাব দেয় ; 'গিয়োভান্না আমার ধাত্রী, এখনও ইটালীতে আছে। কখনও কখনও আমার বড় একা মনে হয়—তাকে আর আমাদের পুরোনো বাড়ি দেখার জন্য মন কেমন করে। রাজকুমারী আমার দ্বিতীয় মা, আমায় আবার সেখানে নিয়ে যাবেন বলেছেন।'

'তুমি যখন অতদূরে ছিলে রাজকুমারী তোমায় জানলেন কেমন ক'রে ?'

'রাজকুমারী আর আমার মা খুব বন্ধু ছিলেন। তাঁরা পরস্পরকে অনেকদিন থেকে জানতেন। আমার বাবা লাইপ্‌জিক-এর যুদ্ধে আহত হয়ে ফ্লোরেন্সে আমাদের বাড়িতে ফিরে আসেন। সেখানে কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান। গিয়োভান্নার কাছে শুনেছিলাম এ-কথা। দুঃখে মাও বেশীদিন বাঁচলেন না। তখন আমি জগতে একেবারে একা—অনাথা। এই খবর শুনে রাজকুমারী ফ্লোরেন্সে এলেন। আমার ধাত্রী আমায় খুব ভালবাসতো—তা' না হলে তিনি তখনই আমায় নিয়ে যেতেন। রাজকুমারী তখন ভিলা ও সবকিছুর ভার আমার ধাত্রীর ওপর দিয়ে আমাকে সেখানে রেখে গেলেন।

আমার ধাত্রীই আমায় মানুষ করেছে—সেই আমার পালিকা, আমার মা! তার কাছেই আমি সব কিছু শিখেছি··

'তারপর আমি বড় হলে রাজকুমারী আমায় নিয়ে আসেন তাঁর কাছে। আমি তাঁকে আমার নিজের মায়ের মত মনে করি।'

দিদিমা বলেন : 'রাজকুমারীও তোমাকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসেন। আমি ক্যাসেলে নিজ চোখে তা দেখেছি। কুডারনাদের কথা মনে পড়ে? বারুস্কা যখন তোমার দেওয়া টাকা তাদের দেয় তারা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। তাদের বাপ যখন শোনে যে তাকে তোমাদের ক্ষেতের পাহারায় নিযুক্ত করা হবে, তখন আনন্দে আর বিস্ময়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে তোমার ও রাজকুমারীর জন্য প্রার্থনা করতে ভুলবে না।'

'কিন্তু দিদিমা এ ধন্যবাদ তোমারই প্রাপ্য, এ তোমারই কথার ফল,' কাউণ্টেস্ বলে।

দিদিমা বলেন : 'আমার কথায় কি হতো যদি না তা যোগ্য পাত্রে বলতাম।'

মালা গাঁথা হলে দিদিমা ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাবার উদ্যোগ করেন।

কাউণ্টেস্ তার ঘোড়ার-লাগাম ধরে বলে : 'আমিও মোড় পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যাব। ছেলেরা ইচ্ছে করলে আমার ঘোড়ায় চড়তে পারো।'

আনন্দে ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জন্ উঠে বসে ঘোড়ার জিনের ওপর। তার সাহস দেখে দিদিমা বলেন : 'তুই পাগল নাকি?' উইলিও ভয় পায় না। কাউণ্টেস্ তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিলে ভয়ে তার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু জন্ তা দেখে হেসে উঠতেই আবার তার সাহস ফিরে আসে। ছোট আডেলকাও ঘোড়ায় চড়ে।

তবে কাউণ্টেস্ তাকে ধরে ধরে পাশে পাশে হাঁটে। তাই দেখে ছেলেরা হাসে, বলে: 'তুই বাঁদরের মত বসে আছিস—!'

রাস্তায় মোড়ে এসে কাউণ্টেস্ নিজে ঘোড়ায় চড়ে রেকাবের ওপর দিয়ে তার নীল ঘাগড়া ঝুলিয়ে দেয়। তারপর মাথার টুপি ঠিক ক'রে বেঁধে নিয়ে দিদিমা ও ছেলেমেয়েদের কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে যায়। গাছের সারির মাঝ দিয়ে ঘোড়া যেন চড়াই পাখীর মত উড়ে যায়। দিদিমা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পুরোনো বাড়ির দিকে হাঁটেন।

পরের দিনটি ছিল অতি সুন্দর। আকাশ পরিষ্কার, যেন কেউ ঝাঁট দিয়ে গিয়েছে। বাড়ির সামনে একখানি গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়িতে জন্ ও উইলি। তাদের পরনে সাদা ট্রাউজার আর লাল জ্যাকেট্। হাতে ফুলের মালা। প্রশেক দাঁড়িয়ে গাড়ির ঘোড়াগুলোকে দেখছে, কখনও বা তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সে বাড়ির দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে বলে: 'কই তোমরা তৈরি হলে? তাড়াতাড়ি করো।'

বাড়ির মধ্য থেকে জবাব আসে: 'আসছি বাবা, এক মিনিট—' কিন্তু একমিনিটের আর শেষ হয় না। শেষ পর্যন্ত দিদিমা ছোট মেয়েদের সাথে বেরিয়ে আসেন। মান্চিস্কাও সেই সঙ্গে। তাদের পেছনে শ্রীমতী প্রশেক, বেট্সে ও ভোরসা। রওনা হতে হতে দিদিমা বলেন: 'সবকিছুর ওপর নজর রেখো। হাঁসমুরগীগুলি দেখো।'

সুলতান আডেল্কার সঙ্গে খেলা করতে চায়। মেয়েটির হাতে ফুলের মালা শুঁকতে যায় কুকুরটি আর মেয়েটি তা মাথার ওপর তুলে ধরে। তাই দেখে দিদিমা কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিয়ে বলেন: 'হতভাগা দূর হ! এখন ও কি ক'রে খেলবে তোর সঙ্গে।'

মেয়েরা গাড়িতে ওঠে। তাই দেখে বেট্সে ভোরসাকে বলে: 'ওদের যেন দেখতে ঠিক দেবদূতের মত।'

প্রশেক উঠে গাড়োয়ানের পাশে বসে। তারপর লাগাম হাতে নিয়ে মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ করতেই ঘোড়া দুটি মাথাতুলে মিল পর্যন্ত গাড়িখানি টেনে আনে। কুকুরগুলি পেছনে ছুটে আসছিলো—কিন্তু তাদের মালিক তাদের দিকে চাবুক দেখাতেই তারা বাড়ি ফিরে গিয়ে রোদে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

শহরটি কি সুন্দর। প্রতিটি বাড়ি সবুজ গাছপাতায় সাজানো। রাস্তায় রাস্তায় সার্বজনীন ভ্রমণস্থানগুলো কুঞ্জবনের মত দেখতে। তার পাশেই বেদী। সবুজ লিন্‌ডেন গাছের তলে যেখানে সেণ্টজনের মূর্তি সেখানে একটি কামান। তার চারদিকে ছেলেদের ভিড়।

প্রশেক ছেলেদের দেখিয়ে বলে : 'এখান থেকে ওরা গুলী ছুড়বে।'

আডেল্‌কা বলে : 'ভয় করছে আমার।'

'কেন ? হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে যেমন শব্দ হয় এও তেমনি—' মান্‌চিস্কা ছোট মেয়েটিকে অভয় দেয়।

এমনি শব্দ আডেল্‌কা বাড়িতে অনেক শুনেছে। তাই সে আশ্বস্ত হয়।

একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়িখানা থামে। বাড়িখানির ওপর একখানি চাল ঝুলছে, তাতে একটি সাদা সিংহ ও এক থোকা আঙুর।

বাড়ির দরজায় স্টানিচ্‌কি এসে সবাইকে মাথার টুপি খুলে অভ্যর্থনা জানায়। পশমের টুপি, তাতে রেশমি ঝাপ্পা। শ্রীমতী স্টানিচ্‌কি তার রূপার কাজ করা টুপি ও খাট সিল্কের পোশাকে পাশে এসে দাঁড়ায়। ছোট হেলা যেই লুকিয়ে পড়তে যায় সে তার হাত ধরে টেনে এনে আডেল্‌কার পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে : 'আয় দেখি, তোদের দু'জনকে এক সঙ্গে কেমন দেখায় দেখি।'

দিদিমা বলেন : 'যেন ঠিক যমজ !' মেয়ে দু'টি পরস্পর আড়চোখে চেয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে।

স্টানিচ্কি প্রশেক-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সবাইকে বাড়ির মধ্যে আসতে অনুরোধ করে : 'শোভাযাত্রা শুরু হবার আগে আসুন আমরা একপাত্র ক'রে মদ নিয়ে বসে একটু কথাবার্তা বলি।'

শ্রীমতী প্রশেক এগিয়ে যায়। দিদিমা কিন্তু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাইরে থেকে বলেন : 'তোমাদের এখনও অনেক সময় আছে,—তোমরা তো যাবে গণ্যমান্যদের সঙ্গে। আমরা যদি অপেক্ষা করি তাহলে গির্জায় এর মধ্যে এত ভিড় জমে যাবে যে আমরা আর ভেতরে যেতেই পারবো না।' দিদিমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

কয়েক মিনিট পরেই দেখা যায় লাল জ্যাকেট্ পরা দু'টি ছেলেকে রাস্তার মোড়ে, তাদের পেছনে আরও দু'জন। জন্ চেঁচিয়ে ওঠে : 'ঐ যে ওরা আসছে !'

'আডেল্কা তুই আর হেলা—তোরা যখন শোভাযাত্রার সঙ্গে যাবি তখন ভাল ক'রে চেয়ে দেখবি, রাস্তায় যেন হোচট্ খেয়ে না পড়িস। বারুস্কা সবার ওপর নজর রেখো। ছেলেরা দুষ্টুমি করো না, গির্জায় বেদীর সামনে গিয়ে তোমরা মনপ্রাণে প্রার্থনা করো, ভগবান যেন খুশি হয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করেন।'

দিদিমা যখন ছেলেমেয়েদের এমনি ভাবে শাসন করছেন, তখন এক স্কুলমাস্টার তাঁর ছাত্রদের নিয়ে হাজির হলেন।

'নমস্কার। আমি আপনার দলে আরও ক'জনকে নিয়ে এসেছি। আশা করি এদের নিয়ে আপনার বিশেষ অসুবিধা হবে না।'

বৃদ্ধ স্কুলমাস্টার হেসে জবাব দেন : 'দিদিমা, এরা সবাই স্বাগত ! আমার দলে ছোট বড় সবাই আছে।' এই বলে তিনি শোভাযাত্রায় সবারই জায়গা ক'রে দেন।

গির্জায় এসে ছেলেমেয়েরা বেদীর সামনে দাঁড়ায়, দিদিমা প্রতিবেশীদের সঙ্গে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। শেষ ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চারদিক থেকে গির্জার মাঝে চলে আসে। গির্জার পরিচালক ছেলেদের হাতে প্রতিনিধিরূপী চাষীদের জ্বলন্ত মোমবাতি ধরতে দেন। ঘণ্টা বেজে ওঠে। পাদ্রী বেদীর ওপর এগিয়ে আসেন। প্রার্থনা আরম্ভ হয়। ছোট মেয়েরা হাত জোড় ক'রে বেদীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে একমনে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করে। তারপর তারা ক্লান্ত হয়ে চারদিকে তাকায়, দেখে কাউণ্টেল্ বসে আছে। তার পিছনে প্রশেক ও শ্রীমতী প্রশেক। তারা চোখ ইশারা ক'রে ছেলেমেয়েদের বেদীর দিকে চাইতে বলে। ছোট আডেল্‌কা তা বুঝতে না পেরে হেসে ওঠে। বারুস্কা তখন তার জামা টেনে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে : 'বেদীর দিকে তাকিয়ে থাক।'

আশীর্বাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। পাদ্রী তখন যিশুর প্রাণদান-স্মারক ভোজ হাতে ক'রে দাঁড়ান। সবাই গেয়ে ওঠে: 'যিশু আমাদের দয়া করো।' গির্জার ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে সবার মিলিত কণ্ঠস্বর মিশে যায়।

শোভাযাত্রার প্রথমে ছেলেরা—তাদের হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি, তারপর মেয়েরা—ফুলের তোড়া ও মালা হাতে নিয়ে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তা ছড়িয়ে দেয়। তারপর পাদ্রী, শহরের গণ্যমান্য ও বয়স্করা এবং সব শেষে সাধারণ লোকেরা—দিদিমা চলেছেন তাদের সঙ্গে। মাথার ওপর নানা রকমের নিশান উড়ছে, ধূপের গন্ধের সঙ্গে এসে মিশেছে ফুলের গন্ধ। ঘণ্টার শব্দে যেন উৎসবের রূপ আরও হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। যারা শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারেনি তারা বাড়ির দরজায় আর জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছে। কি মনোমুগ্ধকর! কি বেশভূষা! কি জাঁকজমক! ঝকঝকে পোশাক পরেছে ছেলেমেয়েরা,

পাদ্রীর পরনে দামী আলখাল্লা, এখানে এক ভদ্রলোকের নীল পোশাক, ওখানে এক চাষীর কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরের পুরোনো বেশ। মেয়েদের পোশাক জাকজমক কম হলেও দেখতে সুন্দর।

শহরের স্ত্রীলোকেরা লেসের বা সোনারুপোর এমব্রয়ডারী করা টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাষী-বৌদের মাথায় কড়া ইস্ত্রি-করা ক্যাম্‌ব্রিক-এর টুপি বা শাদা শাল। মেয়েদের মাথায় লাল রুমাল বা খালি মাথা। চুল মাথার পিছনে সুন্দর ফিতায় বাঁধা।

স্টানিচ্‌কির বাড়ি একটা হোটেল। সবার পোশাক দেখেই তাদের পেশা এমনকি তাদের মনের খবরও পাওয়া যায়। ধনীদের সহজেই ব্যবসাদার ও সরকারী কর্মচারীদের থেকে পার্থক্য বোঝা যায়। চাষীদের থেকে দিনমজুরের পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ে। বেশভূষা থেকে বোঝা যায় কারা সনাতনপন্থী আর কারা নতুন মতবাদের অনুসরণকারী।

দিদিমা সব সময়েই ছেলেমেয়েদের কাছে কাছে চলেছেন, কি জানি কখন কি হয়। সবকিছু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। কেবলমাত্র তোপ ছাড়ার সময় আডেল্‌কা লাফিয়ে উঠে দু'হাতে কান চেপে ধরল।

উৎসবের পর সবাই হোটেলে এল। সেখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গির্জা থেকেই ক্রিষ্টিনা তাদের সঙ্গে এসেছে। দিদিমা তাকে গাড়িতে উঠতে বলেন। প্রশেক ও তার স্ত্রীর রাতের খাবার পর্যন্ত থাকবার কথা।

ক্রিষ্টিনা জবাব দেয় : 'আমি আপনাদের সঙ্গে গাড়ি ক'রে যেতাম। কিন্তু আমার ইচ্ছে অন্য মেয়েদের সঙ্গে যাবার।' এই বলে সে গির্জার সামনে একদল ছেলেদের দিকে চায়। তারা দাঁড়িয়ে আছে মেয়েদের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য।

তাদের মধ্যে এক ছোকরা, মুখখানি ভারী সুন্দর আর লম্বায় প্রায়

পপ্লার গাছের মত, দু'চোখ দিয়ে ভিড়ের মধ্যে কি যেন খুঁজছে। ক্রিষ্টিনার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জায় সে লাল হয়ে ওঠে।

দিদিমা ছেলেমেয়েদের ও হেলাকে নিয়ে বাড়ি যান। শ্রীমতী স্টানিচকি কিন্তু তাদের একটু কিছু খেয়ে যাবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন। দিদিমা একগ্লাস মদ নিয়ে ক্রিষ্টিনাকে দিতে যান। এত লোকের ভিড়ে ও ঘরের মাঝে আসতে চাইছে না—কিন্তু দিদিমা দেবার আগেই একটি লম্বা যুবক ঘরে এসে এক গ্লাস মিষ্টি মদ হাতে নিয়ে দাঁড়াল ক্রিষ্টিনার পাশে।

এমনি অবস্থায় মেয়েদের লজ্জা হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রিষ্টিনা মদের গ্লাসটি হাতে নিতে আপত্তি করে। যুবকটি বারবার অনুরোধ ক'রে আহত স্বরে বলে : 'তাহলে তুমি নেবে না ?' মেয়েটি তখন গ্লাসটি হাতে নিয়ে যুবক বন্ধুটির স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে মদটুকু খেয়ে নেয়। তারপর তারা দু'জনেই দিদিমার গ্লাস থেকেও একটু খায়।

দিদিমা বলেন : 'জ্যাকব তুমি ঠিক সময়েই এসেছো। ভাবছিলাম কাকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলবো। প্রশেক বা অন্য কেউ যখন সঙ্গে নেই, তখন এই তেজী ঘোড়ার গাড়িতে যেতে আমার ভয় হয়। ওয়েন্‌ছেল্ বড় অসাবধানী। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—' ব'লে জ্যাকব মদের দাম দিতে যায়।

ছেলেমেয়েরা হেলার কাছে বিদায় নিয়ে বাপ মার সঙ্গে ও স্টানিচ্কি ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে এসে গাড়িতে বসে। ক্রিষ্টিনাও তাদের সঙ্গে আসে। জ্যাকব মিলো এক লাফে গাড়ির ওপর উঠে বসে। গাড়ি ছুটে চলে।

রাস্তায় ছেলেরা গাড়ির দিকে চেয়ে বলে : 'দেখ, দেখ মিলোর কাণ্ড দেখ !'

'দেখ, ভাল ক'রে দেখ !' এই বলে সে গাড়ির ভিতরে ইশারা করে।

তখন একটি ছেলে টুপি নেড়ে তাকে অভিবাদন ক'রে গুন্ গুন্ করে গায় :

'কোথায় প্রেম ? কোথায় প্রেম ?
কোথায় দেখা পাই ?
জন্মে না তা পাহাড় চূড়ায়,
জন্মে না তা ভুঁয়ে…'

শেষ কথাগুলি গাড়ির শব্দে শোনা যায় না।

দিদিমা বলেন : 'জানিনা তোরা সবাই প্রার্থনা করেছিস কিনা !'

'আমি করেছি দিদিমা, তবে উইলি করেছে বলে মনে হয় না,' জন্ বলে।

'ওর কথা বিশ্বাস করোনা দিদিমা। আমি বারবার প্রার্থনা করেছি। জন্ শুধু আমায় ধাক্কা দিচ্ছিল, কিছুতেই আমাকে শোভাযাত্রায় থাকতে দেবে না,' উইলি অভিযোগ করে।

দিদিমা রেগে বলেন : 'জানি তুই ভারি নাস্তিক। এবছর আমি তোর নামে সেণ্ট নিকোলাস্‌কে নালিশ ক'রে দেব।'

আডেল্‌কা বলে : 'তাহলে তুই কিছুই পাবি না দেখবি।'

ক্রিষ্টিনা বলে : 'দিদিমা বারলা রেডাহুরাতে যে নতুন গান লিখেছে তা শুনেছো তুমি ?'

'না মা, এসব সাংসারিক গান আর আমার এখন ভাল লাগে না। যে বয়সে নতুন গান শুনতে যেতাম অনেকদূরে, সে-বয়স তো আর নেই আমার ! এখন শুধু আমার ভজন গানই ভাল লাগে।'

মিলো গাড়ির ভিতর চেয়ে বলে : 'ক্রিষ্টিনা আজ যখন তোমাদের বাড়ি আসবো তখন আমায় গান গেয়ে শোনাতে হবে কিন্তু।'

'শোনাব।' জবাব দেয়। তারপর শুরু করে : 'মাঠে আমরা যখন বিচালি সাজিয়ে রাখছি তখন বারলা এল। তারপর যেই আমরা পাহাড়ের

ধারে বসে বিশ্রাম করছি এনা অনুরোধ করলে বারলাকে একটা গান গাইতে। একটু ভেবে বারলা হেসে গান ধরে :

"শুক্‌ গাছে বসে পাখি সারাদিন গান গায়।
জানো ওগো! ছোট পাখি কি কথা কয়?
গান গায় ছোট পাখি পুলক ভরে,
প্রেমজালে সদা মেয়ে মলিন রহে।"

'শুনে এনা বিরক্ত হয়—ভাবে তাকে নিয়েই এ গান। জানতো তার সঙ্গে টমেস্‌-এর বিয়ের কথা। তাই লক্ষ্য ক'রে বারলা সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ছড়া বলে :

'চুপ চুপ ছোট পাখি। বৃথা কেন মন ভাঙা?
প্রেমিক আছে মোর, তবু গাল রাঙা!'

'গানটি আমাদের খুব ভাল লাগে। ছেরনভের মেয়েরা আশ্চর্য হয়ে যাবে যে তারা এখনও এ গান শোনেনি।'

গাড়ি ক্যাসেলের সামনে দিয়ে চলে যায়। দরজায় কাল পোশাক পরা কর্মচারী দাঁড়িয়ে। এক হাত তার কাল গোঁফে, আর-এক হাত ঘড়ির সোনার চেনে এমন ভাবে রেখেছে যেন আঙুলের সব কটা আংটি দেখা যায়।

গাড়িখানি চলে যেতে তার চোখ দুটি বিড়ালের চোখের মত জ্বলে ওঠে। ক্রিষ্টিনার দিকে চেয়ে হেসে হাত নেড়ে সে অভিবাদন জানায়। মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, মিলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথার টুপিটি তুলে ধরে।

ক্রিষ্টিনা বলে : 'শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাৎও ভাল তবু এই ইটালিয়ান-টিকে আমি দেখতে পারি না। আবার ও এখানে শিকারের সন্ধানে দাঁড়িয়ে আছে। একা একা মেয়েদের আসতে দেখলেই ও বাজপাখির মত ছোঁ দেবে।'

'বেশীদিনের কথা নয়, ওর ওপর বেশ এক ধোলাই হয়েছে—' মন্তব্য

করে ওয়েন্‌ছেল্: 'ও নাচে এসেছিলো। তারপর অল্পক্ষণেই সবকটি সুন্দর মেয়েদের দখল ক'রে বসে, যেন তারা ওর জন্যই এসেছে। তাছাড়া ও বোহেমিয়ান ভাষা একেবার জানে না—শুধু বলতে শিখেছে : "সুন্দরী মেয়ে আমি পছন্দ করি।"

'আমাদের বাড়ি এসেও বারবার সেই একই কথা আমাকে বলে।' ক্রিষ্টিনা অভিযোগ করে : 'কমপক্ষে দশবার তাকে বলেছি—তোমায় আমি পছন্দ করি না—তবু আমার পেছনে লেগে আছে।'

'ছেলেরা ভাল ক'রে ওর জ্যাকেট্ খুলে পরিয়ে দিয়েছে। আমি না থাকলে বাছাধন মরেই যেত।' ওয়েন্‌ছেল্ বলে।

'এতেও যদি ওর হুশ না এসে থাকে তো দেখিয়ে দেবো কিসে কি হয়—,' মিলো হাত নেড়ে বলে।

সরাইখানায় এসে গাড়ি থামে। মিলো ক্রিষ্টিনার হাত ধরে তাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করে। মেয়েটি ধন্যবাদ জানায়।

'আর একটি কথা,' দিদিমা জিজ্ঞেস করেন : 'ছেবুনভের লোকেরা কখন স্বাতোনোভিংসের তীর্থে যাবে জানিস ?'

'অন্যান্য বছরে যে সময়ে যায়—সেণ্ট জনের পরের উৎসবেই। আমিও যাবো।'

'আমিও যাব—, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'আমিও যাব দিদিমা,' বলে ওঠে মানচিস্কা।

অন্য ছেলেমেয়েরাও চিৎকার করতে থাকে যে তারাও বাড়ি বসে থাকবে না, তারাও যাবে। এতটা পথ, তারা হাঁটতে পারবে না—এই বলে বারুস্কা সেই সমস্যার সমাধান করে। ওয়েন্‌ছেল্ ঘোড়া দুটির গায়ে চাবুক ছুঁতেই তারা মিলের সামনে এসে হাজির হয়। মান্‌চিস্কা সেখানে নেমে পড়ে কয়েকটি ফুলের মালা নিয়ে। দিদিমা সেগুলো মিলারের স্ত্রীর জন্য গির্জা থেকে পবিত্র করিয়ে এনেছেন।

গাড়ি বাড়ির দিকে আসতেই সুলতান্ ও টাইরল্ ছুটে আসে। গৃহকর্ত্রীকে দেখে তারা আনন্দে লাফাতে থাকে। দিদিমা মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দেন যে সবাই ভালয় ভালয় ফিরে এসেছে। গাড়ি চড়ার চেয়ে হাজার বার তিনি হেঁটে যাওয়া পছন্দ করেন। ঘোড়া দুটো এত জোরে ছোটে, যে মনে হয় এই বুঝি গাড়ি ভেঙে পড়ে।

বেটসে ও ভোরসা দরজায় অপেক্ষা করছিলো। দিদিমা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাড়ি ঢুকতেই গল্পপ্রিয় বেটসে জিজ্ঞেস করে :

'ওয়েনছেল্ তোমার মালা কোথায় ?'

গাড়ি ঘুরিয়ে দুষ্টু হেসে ওয়েনছেল্ জবাব দেয় :

'প্রিয়ে, কোথায় হারিয়ে গেছে মনে নেই !'

ভোরসা বলে ওঠে : 'ওর সাথে কথা বলিসনি ! উৎসবের দিনও ওর এই রকম কথা !'

ওয়েনছেল্ হেসে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায় রাস্তায়। দিদিমা ফুলের মালাগুলি ছবির চারধারে আর দুই জানালার মাঝে টাঙ্গিয়ে দিয়ে গত বছরের মালাগুলি আগুনে ফেলে দেন।

আট

আজ দিদিমার ঘরখানি ঠিক একটি ফুলবাগানের মত দেখাচ্ছে। যেদিকেই চাও শুধু গোলাপ, মিগনোনেট্, চেরী—এমনি সব নানা ধরনের ফুল। তাছাড়া একগাদা ওক্‌গাছের পাতা। বারুস্কা ও মানচিস্কা ফুলের তোড়া তৈরি করছে আর ছেলিয়া বসে গাঁথছে ফুলের মালা। উনুনের ধারে বেঞ্চির ওপর বসে আডেল্‌কা ও ছেলেরা আবৃত্তি করছে।

আজ সেন্টজন্ ইভ্, কাল হবে বাবার নামোৎসবের দিন। পরিবারের

বড় আনন্দের দিন। বোহেমিয়ায় জন্মদিন অপেক্ষা নামের দিনেই উৎসব হয় বেশী। তাই সেণ্টজনের দিনটি সবাই পালন করে।

প্রশেক তার কয়েকজন প্রিয় বন্ধুদের রাতের খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করেছে। তাই বাড়িতে এত চাঞ্চল্য। ভোরসা সকাল থেকে বাড়ি পরিষ্কার করছে, বেটসে নিয়ে পড়েছে হাঁসমুরগীগুলি, সেগুলি ধোওয়া, পরিষ্কার করা। শ্রীমতী প্রশেক কোলাচ্ ভাজছে। দিদিমা একবার রুটি ভাজা দেখছেন, একবার হাঁসমুরগীর কাছে আসছেন। এককথায় সর্বত্রই তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন। বারুস্কা তাঁর কাছে এসে বলে জনকে ডেকে নিতে, কারণ সে কাউকে কিছু করতে দিচ্ছে না। জন বাইরে এলেই বেটসে, ভোরসা অভিযোগ করে যে সে তাদের কাজ করতে দিচ্ছে না। উইলি তাঁকে ধরে গল্প বলতে চায়, আডেল্কা তাঁর এপ্রন্ ধরে একখানি কোলাচ্ চায়। এদিকে উঠানে হাঁসমুরগীগুলি খাবারের দেরি দেখে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

দিদিমা বলে ওঠেন: 'তোদের কি একটু দয়ামায়া নেই। আমি সব কিছু এক সাথে করি কি ক'রে?'

এমনি সময় ভোরসা খবর দেয়: 'প্রশেক আসছেন।' শুনে বাড়িতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সব কিছু লুকিয়ে রাখার জন্য, কারণ সব আয়োজন তারা গোপন রাখতে চায়। শ্রীমতী প্রশেক তার তৈরি সব কিছু লুকিয়ে রাখে। দিদিমা ছেলেমেয়েদের সাবধান ক'রে দেন যেন তারা কিছু না বলে।

বাপ উঠানে আসতেই ছেলেমেয়েরা ছুটে যায়। সম্ভাষণের পর বাপ তাদের মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই তারা কথা বলতেও ভয় পায়, পাছে সবকিছু ফাঁস হয়ে যায়। বাপের আদুরে আডেল্কা গিয়ে কোলে উঠে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে: 'মা আর দিদিমা কোলাচ্ ভাজছেন, কাল যে তোমার নামের দিন!'

'দাঁড়া, তুই সব বলে দিলি!' ছেলেরা মায়ের কাছে ছুটে যায়।

আডেল্‌কার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। ভয় পেয়ে সে কেঁদে ফেলে।

বাপ তাকে আদর ক'রে বলে : 'কেঁদোনা তুমি, আমি জানি কাল আমার নামের দিন আর মা তোমাদের কোলাচ্‌ ভাজছেন!'

জামার আস্তিন দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে আডেল্‌কা চেয়ে দেখে মা আসছে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ক'রে। মা আসতেই সব কিছু মিটে যায়। ছেলেরা তখন দেখে আডেল্‌কা এমন কিছু বলেনি যা বলা উচিৎ নয়। তবু তাদের কাছে এ বড় গোপন তথ্য। তাই বাপ সবকিছু দেখেও কিছু দেখেন না আর শুনেও কিছু শোনেন না। রাতে খেতে বসে বারুস্কা চোখের ইশারায় বা জামা টেনে ছেলেমেয়েদের কিছু বলতে দেয় না।

গত কালের উৎসব অন্তে চাকরেরা শুয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র সারা বাড়িতে দিদিমার চলা-ফেরার শব্দ। বিড়ালগুলিকে বন্ধ ক'রে তিনি উনুনের আগুন নিভিয়ে দেন। তারপর তাঁর মনে পড়ে যে বাড়ির বাইরে উনুনে আজ কেক্ ভাজা হয়েছে, সেখানে হয়তো আগুন থাকতে পারে। বাইরে গিয়ে দেখে আসাই ভাল।

সুলতান্ ও টাইরল্ কুকুর দুটি তখন পুলের ওপর বসে। তারা দিদিমাকে এই অসময়ে বাড়ির বাইরে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। কিন্তু দিদিমা তাদের মাথায় হাত রাখতেই তারা দিদিমার পায়ে গা ঘসতে থাকে। তিনি টিলার ওপর উনুনটা দেখতে যান। সঙ্গে সঙ্গে কুকুর দুটিও চলে। উনুনটা খুলে সব ছাই সরিয়ে মধ্যে একটিও আগুনের ফুলকি না দেখতে পেয়ে দিদিমা বাড়ির দিকে ফেরেন। গাঙের পারেই একটি বড় ওক্ গাছ—তার ডালপালায় মুরগীদের বসবার জায়গা। দিদিমা সেদিকে চাইতেই চাপা শব্দ শুনতে পান—নিশ্বাস

নেওয়া ও কিচিরমিচির শব্দ। ভাবেন : 'ওরা স্বপ্ন দেখছে।' এগিয়ে যান তিনি। কিন্তু বাগানে এসে থমকে দাঁড়ান। কিসের শব্দ? বাগানের ঝোপে দুটি নাইটেঙ্গল্ পাখির মধুর কূজনধ্বনি। বাঁধের জলে প্রতিধ্বনিত ভিক্‌টোরকার করুণ ও ভাঙ্গা গানের সুরও হতে পারে। পাহাড়ের গায়ে আকাশের তারার মত হাজার হাজার জোনাকীর মিটিমিটি আলোর দিকে চেয়ে দেখেন তিনি। পাহাড়ের তলে মাঠের ওপর দিয়ে ঢেউ খেলানো মাকড়শার জালের মত মেঘ ভেসে যায়। লোকে বলে এ মেঘ নয়···তিনিও তাই বিশ্বাস করেন···এ হলো স্বচ্ছ রূপালী আবরণে বনের পরীদের চাঁদের আলোয় নাচ, হয়তো তা নয়। তিনি মিলের দিকে মাঠের ওপর চেয়ে থাকেন।

সরাইখানার ধার দিয়ে ছোট নদীর পার দিয়ে একটি মেয়ে ছুটে চলেছে। তার কাঁধে একখানি সাদা ওড়না। ক্ষণকালের জন্য সে থমকে দাঁড়িয়ে আবার ছুটে যায় হরিণীর মত। চারদিক নিঃস্তব্ধ—শুধু শোনা যায় নাইটেঙ্গল্-এর গান, মিলের শব্দ আর এল্‌ডার ঝোপের তলে জলের কলকল ধ্বনি। ওড়নাখানি ডান হাতের ওপর বেঁধে নিয়ে মেয়েটি নয় রকমের ফুল তোলে: মালা গেঁথে সে নতুন শিশিরে মুখ ধুয়ে ছুটে সরাইখানায় চলে যায়, ডানে বাঁয়ে কোনদিকে চেয়েও দেখে না। দিদিমা তার দিকে চেয়ে মনে মনে বলেন: 'এ-তো দেখছি ক্রিষ্টিনা। সেণ্টজনের মালা গাঁথছে! আমি ঠিকই ভেবেছিলাম যে ও সেই ছেলেটিকে ভালবাসে।' মেয়েটি দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। চিন্তামগ্ন দিদিমা দাঁড়িয়ে থাকেন।

তাঁর সামনে প্রশান্ত মাঠ, একটি পাহাড়ী গ্রাম—ওপরে আকাশে চাঁদ আর মিটিমিটি তারা—সেই চাঁদ, সেই তারা—যাদের পরিবর্তন নেই—যারা শাশ্বত—সর্বদা যৌবনদীপ্ত অনন্ত সৌন্দর্যের অধিকারী। তিনিও একদিন যুবতী ছিলেন। সেণ্টজন্ ইভএ নয়টি ফুলের মালা তিনিও

গেঁথেছিলেন একদিন। সে যেন আজকের কথা—কি ভয়ে ভয়ে ছিলেন তিনি, কে জানে কেউ এসে যদি সেই যাদুমন্ত্র নষ্ট ক'রে দেয়! চোখের ওপর ভেসে ওঠে তাঁর ঘরখানি—ফুলে-ঢাকা বিছানা। বালিশের তলে মালাটি রেখে মনেপ্রাণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—স্বপ্নে যেন তাঁকে দেখতে পান, যে তাঁর মনখানি দখল ক'রে নিয়েছে। মালার ওপর বিশ্বাস তাঁর নষ্ট হয়নি। স্বপ্নে দেখলেন এক যুবককে,—লম্বা চেহারা সুন্দর সরল মুখখানি—তার তুলনা তিনি খুঁজে পাননি জগতে। সূর্য ওঠার আগেই তিনি আপেল গাছের কাছে ছুটে গিয়ে পেছন ফিরে ফুলের মালাটি গাছের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। গাছ থেকে যতটা দূরে মালাটি গিয়ে পড়বে তা থেকে বোঝা যাবে জর্জের ফিরে আসতে কত দেরী হবে। সেদিনের সেই ছেলেমানুষী বিশ্বাসের কথা মনে ক'রে আজ তাঁর হাসি পায়। আজও মনে আছে, সেদিন বাগানে বসে কত কেঁদেছিলেন। মালাটি গাছ থেকে অনেকদূর গিয়ে পড়েছিল—জর্জের বাড়ি ফিরে আসার অনেক দেরী।

চিন্তামগ্ন দিদিমা দাঁড়িয়ে থাকেন অনেকক্ষণ। অজ্ঞাতে একখানি হাত দিয়ে আর-একখানি হাত চেপে ধরেন—একদৃষ্টে তারার দিকে চেয়ে মনে মনে বলেন: 'জর্জ, কবে আবার মিলব আমরা?' হাল্কা হাওয়া তাঁর মলিন গাল দু'খানি ছুঁয়ে যায়। এই কি তার সেই পরলোক-গত প্রিয়র চুম্বনস্পর্শ? সমস্ত দেহটা শিরশিরিয়ে ওঠে, দু'চোখ বয়ে জল পড়ে হাত দু'খানির ওপর। দেহে ক্রুশ চিহ্ন ক'রে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরেন।

পরের দিন দুপুরের আগেই ছেলেমেয়েরা জানালার কাছে বাবা মা'র জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে। বাবা সেদিন গির্জায় প্রার্থনার খরচ দিয়েছেন, আর দিদিমা বংশলতিকা ধরে কয়েক পুরুষ জনদের জন্য প্রার্থনার ব্যবস্থা করেছেন। সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা, অভিনন্দন,

উপহার—সবকিছু বাপের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়। বারুন্ধা কিছু শোনে, আর-একজন অভিনন্দন আবৃত্তি করে, কিন্তু সবকিছুতেই অনেক ভুল হয়ে যায়। আবার নতুন ক'রে সবকিছু আরম্ভ করতে হয়। দিদিমার হাতে প্রচুর কাজ, তবু মাঝে মাঝে সময় ক'রে তিনি বসবার ঘরের দিকে চেয়ে ছেলেমেয়েদের সাবধান করেন: 'চুপ ক'রে বসে থাকো।' আবার কাজে চলে যান তিনি।

কয়েকটি স্যুপের পারস্‌লি গাছ কাটতে বাগানে যেতে যেতে দিদিমা দেখেন ক্রিষ্টিনা আসছে। তার হাতে রুমালে কি যেন বাঁধা। 'সুপ্রভাত দিদিমা—' দিদিমা তার আনন্দে ডগমগ মুখখানির দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকেন। তারপর হেসে বলেন:

'তোকে দেখে মনে হয় যেন তুই গোলাপ ফুলের ওপর ঘুমিয়ে ছিলি—!'

'ঠিকই বলেছো দিদিমা, আমার মাথার বালিশের ওয়াড়ে ফুল-তোলা—' মিষ্টি হেসে জবাব দেয় ক্রিষ্টিনা।

'আমার কথা তুই বুঝতে চাস্‌নি। তা থাক্, ভাল হলেই ভাল। তাই না রে—?'

'হ্যাঁ দিদিমা—' মেয়েটির মুখখানি লাল হয়ে ওঠে।

'তোর হাতে কি?'

'জনের জন্য একটি উপহার এনেছি। ও আমাদের পায়রা-গুলো খুব ভালবাসে। তাই ওর জন্য দুটি বাচ্চা এনেছি—ও ওদের পালবে।'

'কি দরকার ছিল?'

'তা হোক দিদিমা। ছোট ছেলেমেয়েদের আমার এত ভাল লাগে আর ওরা এতে আনন্দ পাবে। বলিনি তোমায় পরশু আমাদের বাড়িতে কি হয়েছে?'

'কাল যেন তোদের বাড়ি খানা প্রাগের পুল* হয়ে উঠেছিলো। হ্যাঁ, আমায় তুই সেই ইটালিয়ান ছোকরাটির সম্বন্ধে কি যেন বলতে চেয়েছিলিস্? তখন আমার একেবারে সময় ছিল না। এখন বল— তবে একটু সংক্ষেপে বলবি। এখনি সবাই এসে পড়বে।'

'সেই পাজী ইটালিয়ানটি রোজই আমাদের বাড়িতে বিয়ার খেতে আসতো। তাতে ক্ষতি ছিল না কারণ সরাইখানায় সবাই আসতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকের মত টেবিলে না বসে সে সারা উঠানময় ঘুরে বেড়াবে—এমনকি গোয়াল ঘরেও। এক কথায় যেখানেই আমি যাই সে যাবে আমার পিছু পিছু। তাই দেখে বাবা চোখ রাঙিয়ে ওঠেন। তবে তিনি কি রকম ভালমানুষ তা তো জানো। তা ছাড়া আমাদের খদ্দের, বিশেষ ক'রে ক্যাসেলের লোক, তাকে তাড়িয়ে দেবেন কি ক'রে! কয়েকবার ইটালিয়ানটিকে আমি কাটা কাটা কথা শুনিয়ে দিই— কিন্তু ফল হলো উল্টো। সে এমনি করতে আরম্ভ করলো যেন তাকে আমি সোহাগের কথা বলেছি। জানি সে বোহেমিয়ান্ ভাষা বলতে না পারলেও বুঝতে পারে। সর্বদাই তার এককথা: "সুন্দর মেয়েদের আমি খুব ভালবাসি,"—এই বলে সে আমার সামনে হাঁটু পেতে বসে।'

'হতচ্ছাড়া!' দিদিমা গর্জে ওঠেন।

'জানতো দিদিমা এসব লোকের বক্‌বকানির শেষ নেই। শুনে শুনে কান ঝালা পালা হয়ে যায়। বিকেলে আমরা মাঠে যাই কাজে। হঠাৎ সেখানে মিলো গিয়ে হাজির।' ("হঠাৎ" কথাটি শুনে দিদিমা হেসে ওঠেন।) 'অনেক কথা হয় তার সঙ্গে। তাকে বলি ইটালিয়ানটি আমাকে বড় বিরক্ত করছে। মিলো বললে: ওকে একবার

* তখন প্রাগে মাত্র একটি পুল ছিল। তার ওপর তাই ভিড় জমে উঠতো। "প্রাগের পুলের মত" তাই একটি প্রবাদ।

একা পেলে হয়, তারপর আর তোমায় বিরক্ত করতে আসবে না। বললাম : এমন কিছু আবার ক'রে বসো না যাতে বাবার ক্ষতি হয়। ছেরনভের ছেলেদের তো আমি জানি। একবার কিছু আরম্ভ করলে আর রক্ষে নেই। সন্ধ্যাবেলা আবার সেই ইটালিয়ান ছোঁড়া এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও এসে পড়ল। চারজন তারা। মিলো আর তার বন্ধু টমেস্। টমেসকে তো তুমি চেনো দিদিমা। আমার বন্ধু এনার সঙ্গে তার বিয়ের কথা। তাদের আসতে দেখে আমিও ভারী খুশি। মনের আনন্দে আমি সবারই গ্লাস ভর্তি ক'রে দিচ্ছি আর সবার সঙ্গেই একচুমুক ক'রে খেয়ে নিচ্ছি। ইটালিয়ানটি মুখ গোঁজ ক'রে বসে আছে—তার সঙ্গে কিন্তু আমি খাইনি। তাকে বিশ্বাস কি? হয়তো গ্লাসে প্রেমের ওষুধ মিশিয়ে দেবে। ছেলেরা টেবিলে তাস খেলতে বসেছে—বুঝলাম ওটা একটা ছুতো। আসলে তারা ইটালিয়ানটিকে ঠাট্টা করছে। একজন বলে : দেখ যেন পেঁচার মত দেখতে। টমেস্ সায় দিয়ে বলে : ভাবছি কখন ও ওর নাকটি কামড়াবে—নাকটি ওর থুতনি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। এমনি নানা কথা শুনে ইটালিয়ানটি চুপ ক'রে বসে থাকে। তারপর সে দাম দিয়ে, বিয়ার ফেলে রেখে, একটি কথাও না ব'লে চলে গেল। আমি আমার কাজ করতে থাকি—মার অসুখ করার পর সব কাজই তো আমাকে করতে হচ্ছে। ছেলেরা চলে গেল। আমার কাজ শেষ হ'লে প্রায় রাত দশটায় আমার ঘরে এসে জামকাপড় ছাড়ছি, এমন সময় শুনি জানালায় টক্ টক্ শব্দ। ভাবলাম : বোধহয় মিলো, কিছু হয়তো ভুলে গেছে। ভারী ভুলো মন ওর। ওকে তাই আমি বলি : তুমি বোধ হয় কোনদিন তোমার মাথাটিও আমাদের বাড়ি ফেলে যাবে।'

দিদিমা হেসে বলেন : 'ও যেন এখনও ফেলে যায়নি!'

'ঘাড়ের ওপর শালখানি চাপিয়ে জানালা খুলতে গেলাম—দেখি

সেই ইটালিয়ানটা দাঁড়িয়ে আছে! ঝট ক'রে জানালা বন্ধ ক'রে দিলাম। ভয়ে তখন আমি কাঁপছি। ও তখন কাকুতি মিনতি আরম্ভ করেছে। ওর কোন কথাই আমি বুঝতে পারি না। শেষ পর্যন্ত ও তার হাতের আংটিটা খুলে আমায় দিতে আসে। তখন রাগে আমার মাথার ঠিক নেই। আমি ঘরে জলের কুঁজোটি নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বলি: চলে যাও এখান থেকে। তা না হলে তোমার মাথায় জল ঢেলে দেব।...

'ও জানালা থেকে সরে গেল। কিন্তু তখনই ঝোপ থেকে ছেলেরা বেরিয়ে এল। তারা এসে ইটালিয়ানটিকে চেপে ধরে মুখে রুমাল গুঁজে দিল যাতে চিৎকার করতে না পারে। মিলো বলে ওঠে: দাঁড়া তোকে এবার ভাল ক'রে শিক্ষা দেব। মিলোকে বললাম ওকে মেরোনা। তারপর জানালার ফাঁকে দাঁড়িয়ে দেখি ওরা কি করে।...

'মিলো, কি করবো একে নিয়ে? এ ব্যাটার দেখছি এরই মধ্যে মরমর অবস্থা। একজন বুদ্ধি দেয়, আয় জলবিছুটি দিয়ে দিই। আর একজন বলে: না, না আলকাতরা আর তুলো মাখিয়ে দিই। না, মিলো বলে: টমেস্ একে ধরে রাখ, আর তোরা সবাই আমার সঙ্গে আয়। দেখলাম, ও ছুটে চলে গেল।...

'একটু পরেই দেখি ওরা ফিরে এসেছে, সঙ্গে একখানি বড় লাঠি আর আলকাতরা। মিলো বলে: এবার জুতো খুলে প্যাণ্ট গুটিয়ে দে। ওরা সেইমত কাজ আরম্ভ করে। ইটালিয়ানটি পা ঝাপ্টা দেয়, আর সবাই তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে: ভয় কি বাছা, তোমার পায়ে নাল পরিয়ে দেব না, ভয় কি! তোমার পায়ে শুধু একটু তেল মালিশ ক'রে দেব, তাতে তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি দৌড়ে চলে যেতে পারবে! টমেস্ বলে: যে সুগন্ধি মেখে এসেছ বাছাধন, তার চেয়ে ভাল গন্ধই তোমাকে দেব! তার দু'পায়ে আলকাতরা মাখিয়ে দিতে

মনে হলো যেন দুপায়ে জুতো পরিয়ে দিয়েছে কেউ। তারপর তারা লাঠিখানি তার বুকের ওপর রেখে হাত দু'খানি তার সঙ্গে ক্রুশের মত ক'রে বেঁধে দিলে। বেচারী চেঁচাতে গেলেই টমেস্ তার মুখ আরও চেপে ধরে।

'এবার ওর জুতো-জোড়া ওর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে ওকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আয়। যেখান থেকে এসেছে সেখানে চলে যাক্। মিলো বলে। না, একটু দাঁড়া, ওর জামার বোতামঘরে একটি ফুলের তোড়া দিয়ে দিই। লোকে তাহলে জানতে পারবে যে ও ওর বান্ধবীর কাছে গিয়েছিলো! এই বলে ভিট্‌কোভ একটি বিছুটি পাতা ও একটি থিসিল্ ফুল তার কোটে পরিয়ে দেয়। তারপর তারা তাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসে।

'তারপরই মিলো জানালায় এসে আমায় দেখায় : ইটালিয়ানটি কেমন ক'রে বাঁধা হাতখানি নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম : কি করে জানলে যে ও এখানে আসবে? সে বললে : যে ছেলেমেয়েদের সাথে ও যেতে যেতে মিলের কাছে সবাইকে দাঁড় করিয়ে আমার সঙ্গে জানালায় দেখা করতে এসেছিল। দেখে কে যেন চোরের মত দেওয়ালের ধার দিয়ে গুড়িসুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। তাকে চিনতে পেরেই মিলো মিলে গিয়ে সবাইকে ডেকে নিয়ে আসে—ইটালিয়ানটাকে শিক্ষা দেওয়ার প্ল্যান মাথায় আসে।'

'যাক্ এবার ওর শিক্ষা হয়েছে আর কোনদিন বিরক্ত করবে না।'

'কাল সারা দিনই মিলোদের কীর্তি মনে করে আমার হাসি পেয়েছে। সন্ধ্যায় পাহারাদার কহুটেক্ এল। রোজই সে আসে। কয়েক গ্লাস বিয়ারের পর গল্প শুরু করে। বললো : ইটালিয়ানটা আধমরা অবস্থায় বাড়ি ফিরেছে। গ্রামের লোকেরা তাকে মারধোর করেছে, তাছাড়া তার চেহারা দেখে কুকুর তাড়া করেছিল। শ্রীমতী

কন্ডটেক্ সকাল পর্যন্ত তার পা থেকে আলকাতরা ঘসে ঘসে তুলেছে। অবশ্য সেজন্য তার একটি ডলার মিলেছে—কিন্তু ক্যাসেলের কাউকে সেকথা বলার হুকুম নেই। ···ইটালিয়ানটা ছেলেদের ওপর প্রতিশোধ নেবেই। মিলোর জন্য আমার ভয়। লোকে বলে ইটালিয়ানরা বড় প্রতিশোধপরায়ন। তাছাড়া কন্ডটেক্ বললে যে ইটালিয়ানটা মাঝে মাঝে কর্মাধ্যক্ষের মেয়ে মারীর সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ করে। তারা আপত্তি করে না এই ভেবে যে শিগ্‌গিরই ওর চাকরিতে পদোন্নতি হবে। মিলো জমিদারীতে এক বছর কাজ করতে চেয়েছিলো ফৌজে যাবার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য। ইটালিয়ানটি যদি কর্মাধ্যক্ষকে তার পেছনে লাগিয়ে দেয় তাহলে সব ভেস্তে যাবে। সব ভেবে এখন আমার মনে হয় সেদিন ছেলেরা ওকে ছেড়ে দিলেই পারতো। কাল রাতের স্বপ্নের পর একটু মনে সাহস পেয়েছি, তবে এ তো স্বপ্ন। তোমার পরামর্শ চাইছি দিদিমা ?'

'ছেলেরা ভাল করেনি। তবে ছেলেদের কাছে এ ছাড়া আর কি আশা করা যায়, বিশেষ ক'রে প্রেমের প্রেমঘটিত ব্যাপারে ? আমার জর্জও একবার ঠিক এমনি কিছু করেছিল তার জন্য আমাদের কম ভুগতে হয়নি।'

'কি করেছিলেন ?' ক্রিষ্টিনা জিজ্ঞেস করে।

'এখন কি ক'রে সে কথা বলি ? সবাই গির্জা থেকে বোধ হয় এসে পড়লো। গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আয় বাড়ির ভিতর যাই। তোর সব ঘটনা ভেবে দেখি, পরে পরামর্শ দেব—' দিদিমা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেন।

ক্রিষ্টিনার গলা শুনে ছেলেমেয়েরা ছুটে হল্ ঘরে আসে। জন্‌কে পায়রা দু'টি দিতেই সে দু'হাতে এমন ক'রে ক্রিষ্টিনার গলা জড়িয়ে ধরে যে বেচারীর সাদা গলায় লাল দাগ পড়ে যায়। জন্ তখনই পায়রা

দু'টিকে খাঁচায় রেখে দিতে চায়। বারুস্কা বলে ওঠে: 'সবাই এসে গেছে।' গাড়ি আসার পরপরই মিলার ও শিকার-রক্ষক এসে হাজির হলো। তারা দিনটি প্রশেক-পরিবারেই কাটিয়ে যাবে।

আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত হয়ে প্রশেক আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। বেচারী বছরের বেশীর ভাগ সময়ই এ সঙ্গ থেকে বঞ্চিত। বারুস্কা যেই অভিনন্দন আবৃত্তি করে, তখন তার চোখে জল এসে যায়। ছেলেমেয়েরা তাই দেখে আর মা ও দিদিমার চোখেও জল দেখে ইতস্ততঃ করে। তারপর তারাও কাঁদতে মোছে। দরজায় দাঁড়িয়ে বেট্‌সে ও ভোরসা মুখ ঢেকে চোখের জল মোছে। মিলার তার হাতে নস্যির কৌটোটি ঘুরিয়ে ও শিকার-রক্ষক জামার হাতার ওপর একখানি ছুরি ধার দিতে দিতে তাদের অনুভূতি চেপে রাখার চেষ্টা করে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ক্রিষ্টিনা চোখের জল ফেলে। মিলার তার কাছে এসে নস্যির কৌটো দিয়ে তার কাঁধে টোকা দিয়ে বলে: 'ভাবছো বুঝি কবে আমায় এমনি ভাবে অভিনন্দন জানাবে?'

চোখের জল মুছে মেয়েটি জবাব দেয়: 'ঠাট্টা না করলে বুঝি চলে না আপনার!'

মনে আনন্দ ও চোখে জল নিয়ে প্রশেক টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে এক গ্লাস মদ ঢেলে মুখের কাছে তুলে বলে: 'সবার স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে।' তার পান হয়ে গেলে সবাই তার স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে পান করে। সকলের মুখেই আনন্দের দীপ্তি। জনই সবচেয়ে সুখী। শিকার-রক্ষক তাকে এক জোড়া খরগোশ দিয়েছে। মিলারের স্ত্রী তার জন্য মস্ত একখানি কেক্ নিয়ে এসেছে—তার পছন্দ মত। দিদিমা তাঁর কাঠের সিন্দুকের মধ্যে সবুজ ঝোলা থেকে একটি মুদ্রা উপহার দিয়েছেন।

খাবার পর রাজকুমারী ও কাউন্টেস্ এসে হাজির হলেন বাগানে।

সবাই বাইরে যায় তাদের অভ্যর্থনা করতে। কাউণ্টেস্ জনিকে একখানি জন্তু-জানোয়ারের সুন্দর ছবির বই উপহার দেন।

রাজকুমারী প্রশেককে বলেন: 'তোমাদের আনন্দোৎসব দেখতে এলাম।'

'আমাদের পরিবার আর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়েই আমাদের উৎসব, মাননীয়া রাজকুমারী,' প্রশেক জবাব দেয়।

'কে কে এসেছে?'

'আমাদের প্রতিবেশী মিলাররা আর রিসেন্ পাহাড়ের শিকার-রক্ষক।'

রাজকুমারী বলেন: 'খুব খুশী হলুম। এবার তোমায় ধরে রাখবো না, তুমি তোমার অতিথিদের কাছে গিয়ে বসো, আমি চলি।'

প্রশেক অভিবাদন জানায়। রাজকুমারীকে কিছু বলার কথা তার মনে আসে নাই। সরল মনেই দিদিমা তখন বলে ওঠেন:

'রাজকুমারী ও হোরটেন্সেকে একখানি কোলাচ্ মুখে না দিয়েই চলে যাবেন? যাও থেরেসা কিছু প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এসো। অপ্রত্যাশিত জিনিস প্রায়ই কিন্তু সুস্বাদু হয়। বারুস্কা তুমি একটা ঝুড়ি নিয়ে এসে কয়েকটা চেরী তুলে দাও। ম্যননীয়া রাজকুমারী আশা করি ক্রিম আর একটু মদে আপনার অরুচি হবে না।'

প্রশেক ও তার স্ত্রী একটু অপদস্থ হয়ে পড়ে, ভাবে তাদের সামান্য আহার্যে রাজকুমারীর সম্মানের ক্রটি হবে। রাজকুমারী কিন্তু হেসে ঘোড়া থেকে নেমে প্রশেকের হাতে লাগাম দিয়ে পিয়ার গাছের তলে বেদীতে বসে বলেন:

'তোমাদের আতিথেয়তায় কিন্তু আমি খুব খুশী হয়েছি। তবে আমার জন্য তোমরা অতিথিদের অবহেলা করছো না তো'! তাদেরও এখানে ডাক না!'

প্রশেক ঘোড়াটিকে গাছে বেঁধে একখানি ছোট টেবিল নিয়ে

আসে। শ্রীমতী প্রশেক বাড়ির মধ্যে গিয়ে অন্যদের ডেকে আনে। আহ্বান শুনেই শিকার-রক্ষক নিচু হয়ে অভিবাদন করতে করতে আসে। তারপরেই আসে মিলার কিন্তু সে লজ্জায় নুয়ে পড়েছে। রাজকুমারী তাকে তার ব্যবসার কথা জিজ্ঞেস করেন। মিলার তখনই এত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে যে তালজ্ঞান হারিয়ে রাজকুমারীর দিকে নস্যির কৌটোটি এগিয়ে দেয়। দু'জনের সঙ্গেই দু'একটা কথা বলার পর রাজকুমারী শ্রীমতী প্রশেকের হাত থেকে একখানি কোলাচ্ ও দিদিমার হাত থেকে এক গ্লাস ক্রিম গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েরা জনকে ঘিরে ধরেছে। সে সবাইকে তার ছবির বই দেখাচ্ছে। কাউণ্টেস্ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নির্মল আনন্দ উপভোগ করছে আর মাঝে মাঝে তাদের নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

হরিণের ছবির পাতায় আসতেই বার্টি বলে ওঠে: 'মা, মা দেখ আমাদের হরিণটা!' তারপর সবাই ভিড় ক'রে ছবি দেখে।

উইলি চেঁচিয়ে ওঠে: 'সুলতান্, ঐ যে সুলতান্!' সুলতান্ ডাক শুনে ছুটে আসতেই জন্ কুকুরের ছবিটা তাকে দেখিয়ে বলে: 'দেখ, তোর ছবি!' হাতীর ছবি দেখে আডেল্কা ভয় পায়। এছাড়াও বইতে রয়েছে আরও নানা রকমের ছবি—ঘোড়া, গরু, খরগোশ, কাঠবিড়াল, মুরগী, গিরগিটি, সাপ, মাছ, ব্যাঙ, প্রজাপতি, পোকামাকড় এমনকি পিঁপড়ে পর্যন্ত। ছেলেমেয়েরা এসব জন্তু-জানোয়ারই চেনে। দিদিমা কাঁকড়াবিছে ও সাপের ছবি দেখে মন্তব্য করেন: 'মানুষের কি আর কাজ নেই, এদের ছবিও এঁকেছে!'

মিলারের স্ত্রী আগুনখেকো দৈত্যের ছবি দেখতে চায়, যে দৈত্যের মুখ দিয়ে আগুন ঝড়ে। কাউণ্টেস্ বলে যে সে-রকম কোন জন্তুর অস্তিত্ব নেই, ও শুধু কাল্পনিক। তাই শুনে মিলার হাতে নস্যির কৌটো

ঘুরিয়ে দুষ্টু হেসে মন্তব্য করে : 'কাউণ্টেস্, এ কাল্পনিক নয়, জগতে এমনি অনেক জীব আছে যাদের জিভে আগুন ঝরে। তারা অবশ্য মনুষ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত! তাই বইয়ের অন্যান্য নিরীহ জন্তুদের সঙ্গে তাদের ছবি নেই—'

কাউণ্টেস্ হাসে। কিন্তু মিলারের স্ত্রী স্বামীর কাঁধে টোকা দিয়ে বলে : 'বড্ড বেশী কথা বলো তুমি!'

রাজকুমারী প্রশেক ও শিকার-রক্ষকের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। জিজ্ঞেস করেন আশেপাশে চোরের উপদ্রব আছে কিনা।

'এখনও দু'টি চোর আছে। তিনটি ছিল। তবে কয়েকবার জরিমানা করতেই একটি এখন বাড়ি বসে থাকে। আর দু'টি খুব সেয়ানা। তাদের গুলি না করলে ধরা যাবে না। তবে সামান্য একটা খরগোশের জন্য একজনকে পঙ্গু করা উচিত নয়।'

'না না, তা করো না।' রাজকুমারী জবাব দেন।

'আমিও তাই ভাবি, সামান্য দু'টি খরগোশের জন্য মাননীয়া রাজকুমারীর কোন আর্থিক ক্ষতি হবে না। তবে বড় শিকারের জন্য কেউ বনে আসতে সাহস করবে না।'

'শুনতে পাই আমার বন থেকে অনেক কাঠ চুরি হয়ে যায়।'

'মাননীয়া রাজকুমারী, আপনি আমাদের অন্নদাতা। জানি অনেকে অনেক কথা বলে। আমি গাছ কেটে বিক্রি করি—তারপর হিসেব না দিতে পারলে বলি চুরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা ক'রে বিবেক ভ্রষ্ট হতে আমি মোটেই রাজী নই। বনে যখন স্ত্রীলোকেরা শুকনো পাতা, শেওলা বা শুকনো ডাল কুড়োতে আসে আমি সব সময়ই থাকি তাদের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের সাবধান ক'রে দিই। কিন্তু তাই বলে এক বুড়ি যখন কয়েকটা গাছের মোটা ডাল ভেঙ্গে বসে, তাকে কি আমি মারতে পারি, বলুন? এ-চুরিতে রাজকুমারীর কোন ক্ষতিই হবে না।

বরং গরীব স্ত্রীলোকদের এতে একটু সাহায্য হয় এবং তারা আপনার হাজার বার শুভকামনা করে। এ ঠিক চুরিও নয়, এতে আপনার কোন ক্ষতিও হয় না।'

'তা ঠিক,' রাজকুমারী বলেন: 'তবে দুষ্ট লোকও তো আছে। পরশু দিনের আগের দিন পিকলো যখন শহর থেকে ফিরছিল তাকে কয়েকজন আক্রমণ ক'রে মারধোর করেছে। আমি তাই শুনেছি।'

প্রশেক মাথা নেড়ে বলে: 'তা কখনই সম্ভব নয় রাজকুমারী।'

শিকার-রক্ষক ও মিলার একসঙ্গে বলে ওঠে: 'সারাজীবনে শুনিনি কখনও যে এখানে ডাকাত এসেছে।'

'কি হয়েছে?' দিদিমা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন। শিকার-রক্ষক তাঁকে সব বলে।

'মিথ্যাবাদী কোথাকার!' গর্জে ওঠেন দিদিমা। রাগে কোমরে হাত রেখে বলেন দিদিমা: 'ওর কি ভয় ডরও নেই? ভগবান যে ওকে সাজা দেবেন! রাজকুমারী আমি আপনাকে ঘটনাটি বলছি।'

দিদিমা সকালবেলায় ক্রিষ্টিনার কাছ থেকে শোনা ঘটনাটি বর্ণনা করেন:

'ছেলেরা যা করেছে তা আমি সমর্থন করছি না তবে তাদেরও খুব দোষ দেওয়া যায় না—সবাই তো নিজের নিজের দেখে। কেউ যদি সে-রাতে ক্রিষ্টিনার জানালার ধারে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতো, তাহলে পরের দিনই আশে পাশে সর্বত্র কি বিশ্রী কথাই না প্রচার হতো। মেয়েটির সুনাম, ভবিষ্যৎ সব কিছু চিরতরে নষ্ট হয়ে যেত। লোকে বলতো: ওর খাতির বড়দের সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে নয়। মেয়েটির এখন ভয় যে, ও ছোঁড়া এখন ওদের ওপর প্রতিশোধ না নেয়।'

'ভয় নেই ওদের। আমি সে-ব্যবস্থা করবো—' রাজকুমারী

কাউণ্টেস্‌কে ডেকে ঘোড়ায় চেপে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্যাসেলের দিকে চলে গেলেন।

শ্রীমতী প্রশেক বলে ওঠে: 'রাজকুমারীর সঙ্গে এমনি ভাবে কথা বলার সাহস এক তোমার ছাড়া আর কারও নেই মা।'

দিদিমা জবাব দেন: 'কখনও কখনও সম্রাটের সঙ্গে কথা বলা সহজ তাঁর কর্মচারীর সঙ্গে বলার চেয়ে। তা'ছাড়া সময় মত কথার দাম আছে। আজ চুপ ক'রে থাকলে না জানি এ থেকেই কি ঘটতো।'

প্রশেক ও মিলারের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে আসতে আসতে শিকার-রক্ষক মন্তব্য করে: 'সব সময়ই তাই আমি বলি যে, লোকে শুধু রাজকুমারীকে মিথ্যা কথা বলে।'

সন্ধ্যায় কুডারনা তার অর্গান নিয়ে আসে। অর্গান বাজাতেই ছেলেমেয়েরা, ক্রিষ্টিনা, বেট্‌সে, ভোরসা নাচতে আরম্ভ করে। রাজকুমারী পাঠিয়ে দিয়েছেন শামপেন্‌, সবাই তাই পান করে। ভিক্টোরকার কথাও কেউ ভোলেনি। অন্ধকার হলেই দিদিমা বাঁধের ধারে গাছের গুঁড়ির পাশে তার জন্য খাবার রেখে আসেন।

নয়

পাঁচজন তীর্থযাত্রী চলেছে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে ছেরনভ পাহাড়ের দিকে—দিদিমা, মিলারের স্ত্রী, ক্রিষ্টিনা, মান্‌চিঙ্কা আর বারুঙ্কা। প্রথম দু'জনের মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা—মুখের সামনে ঘোমটার মত টানা। অন্য মেয়েদের মাথায় খড়ের টুপি। বারুঙ্কা ও মান্‌চিঙ্কা বয়স্ক মেয়েদের মত তাদের পরনের পেটিকোট গুটিয়ে নিয়েছে। তাদের কাঁধে পুঁটুলি, তা'তে খাবার।

পাহাড়ের চূড়ায় এসে ক্রিষ্টিনা বলে : ‘কে যেন গান গাইছে, না—?’

‘হ্যাঁ—’ সমস্বরে সব মেয়েরা বলে ওঠে : ‘এসো আমরা তাড়াতাড়ি যাই, তাহলে ওরা আমাদের ফেলে যেতে পারবে না।’ ওরা সব ছোটে।

দিদিমা বলেন : ‘বোকা কোথাকার! দলপতি যখন জানে আমরা আসছি, তখন কি আমাদের ফেলে যেতে পারে?’ মেয়েরা আবার তখন সবার সঙ্গে আস্তে আস্তে চলে।

পাহাড়ের চূড়ায় মেষপালক সবাইকে দেখে অভিবাদন করে।

মিলারের স্ত্রী জিজ্ঞেস করে : ‘কি মনে হয় তোমার জো, বৃষ্টিতে ভিজব নাকি!’

মেষপালক বলে : ‘চিন্তা করবেন না। এমনি আবহাওয়া চলবে পরশু পর্যন্ত। প্রার্থনার সময় আমার কথা মনে করবেন। যাত্রা শুভ হোক আপনাদের।’

‘না, তোমার কথা ভুলবো না।’

. ‘দিদিমা, জো কি ক’রে জানে কখন বৃষ্টি হবে, কখন আকাশ পরিষ্কার হবে?’ বারুস্কা জিজ্ঞেস করে।

দিদিমা জবাব দেন : ‘বৃষ্টির ঠিক আগে পোকারা মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে আসে। সরীসৃপেরা গর্ত থেকে উঁকি দেয়। গিরগিটি কোথায় লুকিয়ে পড়ে। মাকড়শাও তাই। পাখিরা তখন উড়তে উড়তে একেবারে নিচে নেমে আসে। মেষ-পালকেরা সারাদিনই বাইরে বাইরে থাকে। তারা এসব জন্তুদের চলাফেরা লক্ষ্য ক’রে অনেক কিছুই জানতে পারে। আমার সব চেয়ে ভাল পাঁজি হলো আকাশ আর পাহাড়। আকাশের রং আর পাহাড়ের স্পষ্টতা দেখে আমি বলতে পারি কখন আবহাওয়া ভাল কিংবা খারাপ হবে, কখন বরফ পড়বে বা ঝড় উঠবে।’

ছেরনভ-গির্জার কাছে একদল স্ত্রী, পুরুষ আর ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে। তারা সবাই তীর্থযাত্রী। কয়েকজন স্ত্রীলোক তাদের বাচ্চাদের বালিশের

সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলেছে। বাচ্চাগুলোকে পবিত্র বেদীতে ভার্জিনের কাছে রেখে স্বাস্থ্য ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে।

দলের নেতা মার্টিন গির্জার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার দলের সবাইর ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নেয়। দিদিমা ও আর সবাইকে দেখতে পেয়ে সে বলে: 'এবার সবাই এসে গেছেন। আমরা এবার যাত্রা শুরু করি। কিন্তু প্রথমে আমরা প্রার্থনা সেরে নিই—ভগবান, আমাদের যাত্রা যেন শুভ হয়!'

সবাই হাঁটু পেতে গির্জার সামনে বসে প্রার্থনা করে। গ্রামের লোকেরাও যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। প্রার্থনার পর সবাই গায়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে দেয়। দলের মধ্যে এক যুবক একখানি মস্ত ক্রুশ হাতে নেয় —ক্রুশখানিতে টমেসের কনে একটি মালা ঝুলিয়ে দিলে আর ক্রিস্টিনা তাতে বেঁধে দিলে লাল রঙের ফিতের নিশান। পুরুষেরা দলের নেতার পিছনে দাঁড়াল, তারপর দাঁড়াল স্ত্রীলোকেরা, বয়সের সামঞ্জস্য রেখে সামনে বা পিছনে। কিন্তু তখনও তারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়নি। ঘরের গৃহিণীরা চাকরদের নানা উপদেশ দিচ্ছে ঘরসংসারের কাজ দেখার জন্য। পুরুষদেরও খামারের কাজের জন্য হুকুমের যেন তার শেষ নেই। ছেলেমেয়েরা আব্দার করছে—আমাদের জন্য কিছু নিয়ে এসো—, বৃদ্ধারা অনুরোধ করছে—প্রার্থনার সময় আমাদের কথা মনে করো। দলের নেতা এবার চলার সংকেত দেয় গান গেয়ে। সবাই সেই গান গেয়ে ওঠে এক সুরে। যুবকেরা ফুলের মালা জড়ানো ক্রুশ তুলে ধরে। যাত্রীরা স্তাভোনো-ভিৎস তীর্থের পথে যাত্রা শুরু করে। পথে প্রতি গির্জায় সকলে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করে প্রতি গাছের নিচে যেখানেই কোন পুণ্যবান ভার্জিনের ছবি টাঙ্গিয়ে রেখেছে, প্রার্থনা করে সবাই প্রতি ক্রুশের সামনে যেখানে অতীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বারুস্কা ও মান্‌চিস্কাও দলের নেতার ওপর নজর রেখে সবার সঙ্গে

গাইতে গাইতে পথ চলে। রেডহুরাতে এসে বারুস্কা হঠাৎ দিদিমাকে টুরিনের সেই বোবা ও কালা মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করে।

প্রশ্নের জবাবে দিদিমা ধমকে বলেন: 'যখন তোমরা তীর্থে চলেছো তখন শুধু ভগবানের কথাই মনে করবে, অন্য কথা নয়। গান গাও, নাহ'লে মনে মনে প্রার্থনা কর।' মেয়েরা আবার একসঙ্গে গান গায়।

দলটি এবার বনের পথে এসে পড়ে। ঘাসের ওপর এখানে ওখানে ষ্ট্রবেরী হয়ে আছে। অন্য সময় হ'লে মেয়েরা তা নষ্ট হতে দিত না, সযত্নে তা তুলে নিত। ক্রমে তাদের মাথা থেকে টুপি পড়ে যায়। পেটিকোট নিচে ঝুলে পড়ে। আবার তা গুটিয়ে নিতে হয়। মনে পড়ে পুঁটলিতে খাবারের কথা। তারা আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে ভেঙ্গে ভেঙ্গে রুটি খায়। দিদিমা বা মিলারের স্ত্রী তা দেখতে পান না— ছু'জনেই প্রার্থনায় বিভোর হয়ে আছেন।

স্তাতোনোভিৎসে এসে পৌঁছায়। গ্রামে আসার আগেই মেয়েরা একটু থেমে জুতো ও জামাকাপড় ঠিক ক'রে নেয়। সর্বপ্রথম যাত্রীরা আসে এক পবিত্র ঝরণার ধারে—ঝরণার জল গাছের নিচ দিয়ে ভাগ ভাগ হয়ে বয়ে চলেছে। গাছের ওপর ভার্জিনের একখানি ছবি। সবাই এখানে হাঁটু পেতে বসে প্রার্থনা করে, তারপর প্রত্যেকেই ঝরণার জল পান ক'রে তিনবার ক'রে সেই জল চোখেমুখে ছিটিয়ে দেয়। শোনা যায় এই স্বচ্ছ শীতল জলের বলে অদ্ভুত ক্ষমতা—হাজার হাজার লোক এই জলের গুণে বলে ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে।

ঝরণা থেকে যাত্রীর দল যায় গির্জায়। সেখানে নানা গানের সুর প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন যাত্রীদল আসছে, তাদের গানের ভিন্ন ভিন্ন সুর শোনা যায়।

বারুস্কা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে: 'দিদিমা, কি সুন্দর এখানটা!'

মেয়েটি দিদিমার পাশে নতজানু হয়ে বসে। দিদিমা, মেঝের ওপর মাথা ছুঁইয়ে প্রার্থনা করেন ভক্তিভরে। বেদীর ওপরে মূর্তিটি হাজার হাজার মোমবাতির আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে—ফুলের মালা আর ফুলের তোড়ায় সাজানো। তাছাড়া পুণ্যবতী কুমারী বা বধূদের প্রেমের সফলতা চেয়ে যে প্রার্থনা ক'রে থাকে তার উপহারের সংখ্যাও কম নয়। মূর্তিটি জমকাল পোশাকে আবৃত, তাতে মণিমুক্তার কাজ। এ সবই, যারা মূর্তির কৃপায় রোগমুক্ত হয়েছে, তাদের উপঢৌকন।

প্রার্থনা শেষে দলের নেতা গির্জার পরিচারকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পর যাত্রীদের রাত্রির আস্তানায় নিয়ে যায়। বসন্তে চাতকপাখি ফিরে এসে যেমন পুরোনো বাসা খুঁজে নেয়, তেমনি যাত্রীরা আবার বিগত বছরের আস্তানার খোঁজ করে। প্রাচুর্যময় আতিথেয়তা না হলেও এখানেই আন্তরিক অভ্যর্থনা, নোনতা-রুটি আর পরিচ্ছন্ন শয্যা মেলে। দিদিমা ও মিলারের স্ত্রী বরাবরই এখানে লোহাখনির কর্মাধ্যক্ষের বাড়িতে থাকতেন। তারা বয়স্ক ও পুরোনো প্রথাবলম্বী। দিদিমার তাই এখানে ঘরের মতই মনে হোত। কর্মাধ্যক্ষের স্ত্রী ছেরনভের যাত্রীরা এসেছে খবর পেয়ে ঘরের বাইরে এসে বসে আছে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য। তারপর রাত্রে শুতে যাবার আগে সে সবাইকে তার ধন-সম্পত্তি খুলে দেখায়। এক থান কাপড়, দু-সূতী কাপড়, আর ফেটির পর ফেটি সূতো। এসবই তার হাতের কাজ, বছরের পর বছর সংখ্যায় বেড়ে চলেছে।

মিলারের স্ত্রী জিজ্ঞেস করে: 'কার জন্য আপনি এত সব জমিয়ে রাখছেন? আপনার মেয়ের তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে।'

'আরে ভাই, তিনটি নাতী-নাতনী আছে যে! কাপড় বা সূতা কখনও ফেলা যায়?'

অন্য স্ত্রীলোকেরা সবাই মহিলার কথায় সায় দেয়। এমনি সময়

কর্মাধ্যক্ষ, এসে বলে : 'আবার তুমি এইসব নিয়ে বসেছো? যাই আমি নিলামের জন্য ঢেঁড়া দিয়ে আসি!'

'আর কিছুদিন অপেক্ষা করো। আরও কিছু জমিয়ে নিই—' স্ত্রী জবাব দেয়।

দিদিমা তীর্থে এসে জল ও রুটি ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতেন না। এ ছিল তাঁর কঠোর পণ, কেউ তাঁকে তা থেকে নড়াতে পারতো না। মিলারের স্ত্রীরও এ বাড়িতে ভালই লাগতো। নরম পালকের বিছানায় শুয়ে সে বলতো : 'যেন হাল্‌কা বরফের ওপর শুয়ে আছি।'

ক্রিষ্টিনা ও এনা থাকতো এক বিধবার বাড়ি। বিধবার একখানি ছোট বাড়ি, তার সঙ্গে একটি বাগান। তাদের জন্য চিলেকোঠার খড়ের ওপর বিছানা হতো। আজ তারা বিছানায় না শুয়ে মই বেয়ে নেমে বাগানে এল।

ক্রিষ্টিনা বলে : 'ওপর থেকে এখানে অনেক ভাল। তাই না? গাছের নিচে শুয়ে ভাল ক'রে পেটিকোট জড়িয়ে নিয়ে সে গান ধরে :

'এই বাগানই আমাদের ঘর—
উপরের তারারা আমাদের ঘরের প্রদীপ,
আর এই সবুজ ভূমিতল--
প্রেম, এই হবে আমাদের শয্যা।'

তার পাশে শুয়ে এনা জবাব দেয় : 'এই মধুর শয্যায় আমি তোমার সঙ্গে থাকবো শুয়ে!' তারপর হেসে বলে : 'দেখ, কার যেন নাক ডাকছে, যেন কেউ বস্তা থেকে পাথর ঢালছে!'

'এখানে শুয়ে ভাল লাগছে না। আচ্ছা এনা তোর কি মনে হয় কাল ওরা আসবে?'

'নিশ্চয়ই আসবে—,' এনা জবাব দেয় : 'টমেস্ নিশ্চয়ই আসবে।

আর মিলো যে আসবে না তাতো আমি ভাবতেই পারি না। ও কিন্তু তোকে খুব ভালবাসে।'

'কে জানে! আমাদের কোন কথাই হয়নি এখনও।'

'কথার প্রয়োজন কি? কথা না হলেও লোকে বুঝতে পারে। আমার তো মনেই পড়ে না টমেস্ আমায় কোনদিন বলেছিল কিনা যে আমায় ওর ভাল লাগে। তবু আমাদের দু'জনের দু'জনকেই ভাল লাগে। আমাদের বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেছে।'

'সে কি রে? কবে?'

'বাবার ইচ্ছে আমাদের একটু বাসের জমি দেওয়া—যেখানে এখন নতুন বাড়িটি তিনি করছেন। বাড়িটি হয়ে গেলেই আমাদের বিয়ে হবে। তা—ধর, সেই প্রায় সেণ্ট ক্যাথারিনের উৎসবের সময়। তোর আর আমার একই দিনে যদি বিয়ে হয় তা হলে খুব মজা হয়।'

'রাখ তোর মজা! তোর কথা শুনে যেন মনে হয় যে তার সব কিছু যেন ঠিকই হয়ে গেছে। এদিকে সবকিছুই তো এখনও পাহাড়ের আড়ালে।'

'ঠিক না হয়ে থাকলেও সব ঠিক হয়ে যাবে। মিলোর বাড়ির লোকেরা তোকে পেয়ে খুশীই হবে। আর তোর বাবারও ওর চেয়ে ভাল জামাই জুটবে না। আর তোর দিক থেকে তো সে-কথা ওঠেই না। সবাই জানে ও গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছেলে। কেবল মোড়লের মেয়ে লুসিনার নজর রয়েছে ওর ওপর।'

'দেখ, ওইতো এক বাধা,' ক্রিষ্টিনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

'আরও একটু বাধা আছে। কারণ লুসিনা তো আর শুধু একা নয়, তার সঙ্গে আসবে এক থলি রাইন্-ডলার।'

'তবেই দেখ!'

'এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ডলারের থলি নিয়েও লুসিনা

তোর পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। তাছাড়া মিলোরও নজর ব'লে একটা জিনিস আছে।'

'কিন্তু সবাই যদি ওর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়? ও যদি জমিদারীতে কাজটি না পায়, আর ওকে যদি ফৌজে যোগ দিতে হয়?'

'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা ডেকে আনিস কেন?'

'জানি। সেণ্ট্ জনের রাতে স্বপ্ন দেখলাম যে মিলো আমার কাছে এসেছে। তবে সে তো শুধু স্বপ্ন।'

দিদিমা বললেন: 'এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করা উচিত নয়, তাছাড়া ভগবানের কাছে ভবিষ্যত জানার চেষ্টা করাও ঠিক নয়।'

'দিদিমার কথা তো আর দৈববাণী নয়।'

'তবু তাঁর কথা আমি শাস্ত্রের মতই বিশ্বাস করি। সব সময়ই তিনি সদুপদেশ দেন, আর সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাঁর কথা প্রায়ই খেটে যায়।'

'আমিও তা বিশ্বাস করি। তবে আমাদের বয়সে তিনিও আমাদের মত বিশ্বাস করতেন। বুড়ো হলে সবাই একই রকম হয়ে যায়। মা'ও সবসময় অভিযোগ করেন যে এখনকার ছেলেমেয়েরা আগেকার কালের মত নয়। এরা এখন শুধু নাচ গান আর আমোদ নিয়ে থাকে, আর কোন জ্ঞানই এদের নেই। মা'রা যখন ছোট ছিলেন তখন এমনটি বলেছিলেন না। দিদিমার মা'রাও আমাদের বয়সে আমাদের মতই ছিলেন, আর আমরাও বুড়ী হ'লে তাঁদের মতই এমনি কথাবার্তা বলবো। আয় এখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি—' এই বলে এনা পায়ে পেটিকোট ভাল ক'রে জড়িয়ে নেয়। একটু পরেই ক্রিষ্টিনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

চিলেকোঠায় শুয়ে একটি স্ত্রীলোক তার শিশুটির কান্না থামাবার চেষ্টা করছে। বাচ্ছাটি কিছুতেই চুপ করছে না। কান্না শুনে আর-

একটি স্ত্রীলোকের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে বলে: 'কি গো তোমার বাচ্ছাটি কি রোজ রাতেই এমনি ক'রে কাঁদে?'

'গত দু সপ্তাহ ধ'রে রোজ রাতে কাঁদছে। যে যা বলে তাই তো দিচ্ছি, কোনও ফল হয়নি। কামারবৌ এখন বলে যে বড় দেরী হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম ওকে ভগবানের বেদীতে রেখে প্রার্থনা করবো—হয় ও ভাল হয়ে যাবে, না হয়, ভগবান ওকে তাঁর কোলে টেনে নেবেন।'

পাশ ফিরে শুয়ে স্ত্রীলোকটি বলে: 'কাল ওকে তিনবার জলে ডুবিয়ে নিয়ো। এই ভাবে আমার ছোট মেয়েটির অসুখও ভাল হয়ে ছিল।'

পরদিন সকালে যাত্রীরা গির্জার সামনে পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ ক'রে 'আমরা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করছি—' এই বলে অভিবাদন করতেই ক্রিষ্টিনা আর এনা পিছন থেকে দুই পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পায়: 'আমাদেরও ক্ষমা ক'রো কিন্তু?'

টমেসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এনা জবাব দেয়: 'স্বীকারোক্তির আগেই তোমার স্বেচ্ছাচার মঞ্জুর হ'য়ে গেছে!'

ক্রিষ্টিনাও লজ্জায় মিলোর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। যুবক দু'জনেই মার্টিনের নেতৃত্বে সকলের সঙ্গে গির্জায় প্রবেশ করে।

প্রার্থনার পর সবাই ঝরণার ধারে যায়। সেখানে বয়স্ক স্ত্রীপুরুষেরা নীচু হয়ে জলে চুমুক দেয়। এ বলে তীর্থযাত্রীদের কর্তব্য। তারপর সবাই দল বেঁধে চলে সারিসারি ছোট ছোট দোকানে বাড়ির লোকের জন্য উপহার কিনতে। মিলারের স্ত্রী অনেক ছবি, মালা, মূর্তি ও আরও অনেক কিছু কেনে। বলে: 'সবাই আমাদের বাড়ি ফসল নিয়ে আসে, সবাই আশা করে তাদের জন্য তীর্থ থেকে কিছু নিয়ে আসি। আমায় তাই অনেক কিছু কিনতে হবে।'

ক্রিষ্টিনা দুটি জ্বলন্ত হৃদয়ের মূর্তি আঁকা একটি রূপার আংটি কেনে।

তাই দেখে মিলোও সঙ্গে সঙ্গে দু'খানি যুক্ত-হাত চিহ্নিত একটি আংটি কেনে। যাত্রীরা এ সবকিছুই পুণ্যাত্মার মৃতাবশেষের সঙ্গে ছুঁইয়ে নেয় বা আশীর্বাদ করিয়ে নেয়। তারপর এইগুলিই হবে তীর্থের পুণ্য স্মারক চিহ্ন।

যা কিছু করণীয় ছিল তা হয়ে যাবার পর যাত্রীরা অতিথি-সেবকদের ধন্যবাদ জানিয়ে আর-একবার ঝরণার ধারে প্রার্থনা ক'রে বাড়ির পথে ফিরে চলে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা এক বনে এসে হাজির হয়। সবাই পরিশ্রান্ত, এক ঝরণার ধারে বসে তারা বিশ্রাম করে। ঝরণাটি "নয়টি ক্রুশ" থেকে বিশেষ দূরে নয়। সবাই তৃষ্ণার্ত। ক্রিষ্টিনা দু'হাতের তালুতে ক'রে মিলোকে জল দেয়—তাকে অনুরোধ করতে সে আরও সকলকে জল দেয়। বয়স্করা বসে বসে একে অন্যের সওদা দেখে। মেয়েরা মালা গাঁথার জন্য বনে ফুলের সন্ধানে যায়, আর ছেলেরা "নয়টি ক্রুশের" তলে কবরটি পরিপাটি ক'রে সাজায়।

এনার সঙ্গে ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে বারুস্কা জিজ্ঞেস করে : 'ওখানে নয়টি ক্রুশ কেন ?'

'শোন তাহলে বলি,' এনা আরম্ভ করে : 'এখান থেকে ভিজম্‌বুর্গ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বেশী দূরে নয়। পুরাকালে সেখানে হেরমান্‌ নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করতেন। অদূরের এক গ্রামের একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল। আরও একটি লোক সেই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু মেয়েটির হেরমান্‌কেই পছন্দ এবং তাকেই সে বিয়ের কথা দেয়। বিয়ের দিন সকালে হেরমানের মা ছেলের কাছে একটি লাল আপেল হাতে ক'রে নিয়ে এসে ছেলেকে দুশ্চিন্তিত দেখে তাকে জিজ্ঞেস করেন এত মুশড়ে পড়েছে কেন সে। হেরমান্‌ বলে যে, সে কিছু বুঝতে পারছে না। মা তখন তাকে বলেন যেন সে ঘোড়ায় চড়ে না বেরোয়, কারণ গত রাতে তিনি এক খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন।

হেরমান কিন্তু তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করে। ঘোড়াটিও চলতে চায় না। মা আবার বলেন: যাসনে বাছা, এ অমঙ্গলের চিহ্ন। অশুভ কিছু হয়তো ঘটবে। হেরমান্ কিছু না শুনে পুল পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ঘোড়াটি আবার পিছনের পা দু'খানি তুলে থমকে দাঁড়ায়। মা আবার ছেলেকে যেতে বারণ করেন। হেরমান্ কিছু গ্রাহ্য না ক'রে কনের বাড়ি যায়। বিয়ের শোভাযাত্রা যখন এখানে ফিরে আসে তখন সেই যুবকটি তার দলবল নিয়ে হারমানকে আক্রমণ করে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর যুদ্ধে হেরমান্ মারা যায়। এই দেখে কনেও তার নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। দু'দলের মারামারিতে মোট নয় জন মারা যায়। তাদের এখানে একসঙ্গে কবর দিয়ে নয়টি ক্রুশ তাদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে।'

এনার গল্প শেষ হলে শ্রীমতী ফাউসেক্ একটু দূরে 'ব্যাঙের ছাতা' কুড়াতে কুড়াতে মন্তব্য করে: 'এনা তোর গল্প ঠিক হলো না। কনের বাড়ি পৌঁছানোর আগেই হেরমান্ সদলবলে নিহত হয়। কনে এদিকে অপেক্ষা ক'রে আছে। শোকের গির্জার ঘণ্টা শুনতে পেয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে কেন ও ঘণ্টা বাজছে। মা নীরবে বসে থাকেন। তারপর তারা যখন কনেকে নিহত হেরমানের কাছে নিয়ে গেল, হতাশায় সে নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে। তারপর সকলের এক সঙ্গে সমাধি হয়। আমি কিন্তু এই রকম কাহিনীই শুনেছি।'

'কে জানে কোন্‌টি সত্যি! অনেক দিনের ঘটনা। তবে বড়ই হৃদয়স্পর্শী। ওদের বিয়ে হয়ে সুখে বাস করলেই আনন্দের হতো।'

ফার্ গাছের ক্রুশটিকে মেরামত করতে করতে টমেস্ জবাব দেয়: 'তাহলে আর আমরা এই কবরে ফুল দিতে পারতাম না।'

'তাতে কি এসে যেতো? আমি কখনই এমনি কনে হতে চাই না—' এনা বলে।

মালা হাতে আসতে আসতে ক্রিষ্টিনা বলে : 'আমিও না। বিয়ের দিনে আমি এমনি ভাবে মরতে রাজী নই।'

মিলো বলে : 'তাহলেও হেরমান্ তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ভাগ্যবান। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রণয়ীর পক্ষে ভালবাসার পাত্রীকে অন্যের ঘরে যেতে দেখে বেচারীর কম কষ্ট হয়নি। তাই তার জন্যই আমাদের বেশী প্রার্থনা করা উচিত, সে মনের দুঃখে মারা গেছে। হেরমান্ কিন্তু শান্তিতেই মরেছে।'

মেয়েরা ক্রুশে ফুলের মালা ঝুলিয়ে দিয়ে শেওলা-ঢাকা কবরে ফুল ছিটিয়ে প্রার্থনা ক'রে অন্য যাত্রীদের কাছে ফিরে আসে। দলপতি ছড়ি হাতে নেয়, ছেলেরা ক্রুশ তুলে ধরে। আবার সকলে বাড়ির পথে চলে। ছেরনভের কাছাকাছি যখন তারা এল, দেখল, রাস্তার চৌমাথায় গ্রামের লোকেরা যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে। যাত্রীদের গান শুনতে পেয়ে ও ক্রুশের ওপর লাল নিশান দেখতে পেয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে। গ্রামে পৌছানোর আগেই ছেলেরা তাদের ঢাক বা বাঁশী বাজাতে থাকে, কাঠের ঘোড়া ঠেলে নিয়ে যায়। মেয়েরা পুতুল, ছবি, ছোট ঝুড়ি বা রুটির তৈরি হৃৎপিণ্ড নিয়ে আসে। গির্জায় প্রার্থনার পর সকলে দলের নেতাকে ধন্যবাদ দেয়। ক্রুশটিকে গির্জায় ফুলের মালা আর লাল নিশান দিয়ে সাজানো বেদীর ওপর রেখে যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

বিদায় নেবার সময় ক্রিষ্টিনা, এনার হাত ধরতেই এনা তার বান্ধবীর হাতে রূপার আংটি দেখতে পায়। হেসে জিজ্ঞেস করে : 'এটা তো তোকে কিনতে দেখিনি!'

ক্রিষ্টিনা লজ্জা পায়। কিন্তু সে জবাব দেবার আগেই মিলো এনার কানে চুপে চুপে বলে : 'ও দিয়েছে আমাকে ওর হৃদয় আর আমি দিয়েছি আমার হাত।'

,বাঃ,   সুন্দর, চমৎকার! ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।'

মিল প্রাঙ্গণে লিনডেন্ গাছের তলে মূর্তিটির পাশে বসে আছে প্রশেক পরিবার ও মিলার। মাঝে মাঝে ছেরনভ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তারা দেখছে, তারা তীর্থ-যাত্রীদের অপেক্ষায় বসে আছে। পাহাড়ের ওপর সূর্যের শেষ রশ্মি-রেখায় ওক্ গাছের চূড়াগুলি রক্তিমাভ হয়ে ওঠে, গাছের সবুজ ডালের মাঝ দিয়ে সাদা রুমাল ও খড়ের টুপি দেখা যায়। ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ প্রতীক্ষায় থেকে চিৎকার ক'রে ওঠে: 'ঐ আসছে!' ছুটে যায় তারা। প্রশেক, তার স্ত্রী ও মিলার ধীরে ধীরে তাদের পিছু নেয়। ছেলেমেয়েরা দিদিমার গলা ধরে চুমো খায়, যেন দিদিমাকে তারা কতদিন দেখেনি! বারুস্কা গর্বে বুক ফুলিয়ে বলে ওঠে, সে একটুও ক্লান্ত হয়নি। দিদিমা ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করেন, তারা তাঁর কথা কি ভেবেছে একটুও।

মিলারের স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করে: 'খবর কি গো?'

স্বামী ধীরে জবাব দেয়: 'আমাদের বুড়ো হাঁসটার জুতো হারিয়ে গেছে। বড়ই দুঃসংবাদ!'

স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী বলে: 'তোমার সাথে কথা বলবো না।'

শ্রীমতী প্রশেক মন্তব্য করেন: 'তুমি বাড়ি থাকলে উনি তোমায় বিরক্ত করেন। আর তুমি চলে গেলে উনি যেন জলেভেজা মুরগীর মত ঘুরে বেড়ান।'

'আমরা না থাকলেই পুরুষেরা আমাদের অভাবটা বোঝে।'

কথাবার্তার যেন আর শেষ নেই। স্‌ভাতোনোভিৎস-এ তীর্থযাত্রা ছোট গ্রামটির মানুষের কাছে এক মস্ত খবর। সারা বছর ধরেও সে-কথার শেষ হবে না।

দশ

রাজকুমারী চলে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কাউণ্টেস্‌ও গিয়েছেন। মিঃ প্রশেকও চলে গিয়েছেন তাদের সঙ্গে। ঘরের চালের চড়ুই পাখি-গুলিও গিয়েছে উড়ে। ক'দিন ধরে প্রশেক পরিবারে এক বিষাদের ছায়া। মার চোখে জল, দিনরাত কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। তাই দেখে ছেলেমেয়েরাও কাঁদে। দিদিমা বলতেন: 'থেরেসা এবার তুই চোখের বন্ধ কর। কেঁদে লাভ কি? বিয়ের আগেই তো তুই সব জানতিস্। এবার একটু ধৈর্য ধর। আর ছেলেমেয়েরা, তোরা না কেঁদে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যেন বাবা তোদের ভাল থাকে। আবার বসন্ত কালে তোদের কাছে ফিরে আসে।'

'যখন চড়ুই পাখিরা ফিরে আসবে, তাই না দিদিমা?' জিজ্ঞেস করে আডেল্‌কা।

'হাঁ দিদি,' জবাব দেন দিদিমা। মেয়েটি চোখের জল মুছে ফেলে।

পুরোনো বাড়ির চারদিক নিস্তব্ধ, বিষাদাচ্ছন্ন। বনে গাছের পাতা কমে ফাঁকা হয়ে গেছে। ভিক্‌টোরকাকে এখন দূরে থেকেও দেখা যায়। পাহাড়গুলি হলদে হয়ে এসেছে। নদীর জল আর বাতাস দু'য়ে মিলে রাশি রাশি শুকনো পাতা ভাসিয়ে ও উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কে জানে কোথায়। বাগানের ফল এখন ভাঁড়ারে জমা হয়ে আছে। জোনাকিরা এখন শুধু হলুদ মাঠ আর বাঁধের ধারে উড়ে বেড়ায়। ছেলেরা খেলতে বেড়িয়ে ঘুড়ি ওড়ায় পাহাড়ের ওপর। আডেল্‌কা বাতাসে উড়ে-যাওয়া মাকড়সার জাল ধরে এনেছে। বারুন্কা দিদিমার জন্য কত গাছ-গাছড়া কুড়িয়ে এনেছে। দিদিমা ওষুধে ব্যবহার করবেন। কখনও কখনও সে পাহাড়ী অ্যাস্‌বেরী কুড়িয়ে আনে।

তাই দিয়ে আডেল্‌কার গলার হার আর হাতের ব্রেস্‌লেট বানিয়ে দেয়।

ক্যাসেলের পিছনে পাহাড়ের ওপর দিদিমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে থাকতে ভালবাসতেন। নীচে সুন্দর উপত্যকা ··সেখানে গৃহপালিত পশুর পাল চরে বেড়াচ্ছে। দূরে গ্রামগুলি দেখা যায়। একটু উঁচু জায়গার ওপর ক্যাসেলটি···চারদিকে বাগান। সবকিছু যেন বদলে গেছে। জানালার সবুজ পর্দাগুলি টানা। বারান্দায় ফুল নেই। ছোট ছোট স্তম্ভগুলির ওপরের গোলাপগুলিও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সরকারী বেশে সজ্জিত কর্মচারীদের বদলে মজুরেরা বাগানে ঘুরে ঘুরে গাছের ডাল-পাতা দিয়ে চারাগাছগুলি ঢেকে দিচ্ছে। একটি সুন্দর ফুলও চোখে পড়ে না, তবে এখন ঢাকা থেকে আবার তারা সময়ে গৃহকর্ত্রীর নয়নরঞ্জন করবে। দুর্লভ বিদেশী গাছগুলি সবুজ আবরণের বদলে খড় দিয়ে মোড়া। রূপালী ঝরণাগুলিও শেওলা আর কাঠ দিয়ে ঢাকা। রঙিন মাছগুলি জলের তলে আশ্রয় নিয়েছে। স্ফটিকস্বচ্ছ জল এখন গাছের পাতা আর আগাছায় ছাওয়া। ছেলে-মেয়েরা ক্যাসেলের দিকে চেয়ে সেই দিনটির কথা ভাবে যেদিন তারা হোরটেন্‌সের সঙ্গে বাগানে বেড়িয়েছে। কি সুন্দর ছিল সেদিন বাগানটি!

দিদিমা বিপরীত দিকের পাহাড ছাড়িয়ে, গ্রাম, বন ছাড়িয়ে নতুন শহরের দিকে চেয়ে থাকেন। ডবরউ-এর কাছে থাকতো তাঁর ছেলে। ডবরউ পেরিয়ে ছোট পাহাডে এক গ্রামে থাকতো তাঁর কত প্রিয়জন। পূবদিকে আধখানি মালার মত রিসেম্‌ পর্বতশ্রেণী ·· হেসডের পাথরের ঢিবি থেকে চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত এখন বরফঢাকা। হেসডের দিকে দেখিয়ে দিদিমা বলতেন: 'ওখানে সবকিছু আমি জানি। ওই পাহাডের কোলে ক্লাডরান্‌। সেখানেই তোদের মায়ের জন্ম। ওখানে অনেক সুখের দিন কেটেছে আমার।'

গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন দিদিমা, আবার বারুস্কার প্রশ্নে তিনি জেগে ওঠেন।

'দিদিমা, ওখানেই তো পাথরের ঘোড়ায় চড়ে আছে সিবিলা?'

'ওরই কাছে একটি পাহাড়। একটি পাথরের ঘোড়ায় চড়া প্রস্তরমূর্তি। হাতখানি ওপরে স্বর্গের দিকে। লোকে বলে যে মূর্তিটি যখন মাটিতে ডুবে যায়, তার হাতের একটি আঙুলও দেখা যায় না, তখনই তার ভবিষ্যদ্বাণী নাকি সফল হয়। বাবা বলতেন তিনি তাকে দেখেছিলেন···তখন ঘোড়াটি বালির ওপর তাঁর বুকের সামনে স্পষ্ট দাঁড়িয়ে ছিল।'

আডেল্‌কা জিজ্ঞেস করে: 'সিবিলা কে দিদিমা?'

'সিবিলা এক অতি জ্ঞানী স্ত্রীলোক। ভবিষ্যৎ বলতে পারতো।'

ছেলেরা জিজ্ঞেস করে: 'কি বলতো সে?'

'অনেকবার বলেছি তোদের—' জবাব দেন দিদিমা।

'ভুলে গেছি দিদিমা—'

'কিন্তু অত তাড়াতাড়ি ভুলবি কেন?'

'আমার একটু মনে আছে দিদিমা—' বারুস্কা বলে:

'সিবিলাই তো বলেছিলো যে বোহেমিয়ার দুঃসময় আসবে। যুদ্ধ বাধবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী হবে। সবচেয়ে খারাপ সময় পড়বে যখন বাপের সঙ্গে ছেলের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের মতবিরোধ ঘটবে, যখন কেউ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না। তখন নাকি ঘোড়ার খুরে চড়ে বোহেমিয়া দেশ সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে।'

'তোর ঠিকই মনে আছে। ভগবান করুন যেন এমন কিছু না ঘটে।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন দিদিমা।

দিদিমার পায়ের কাছে বারুস্কা বসেছে। তার হাত দু'খানি দিদিমার হাঁটুর ওপর। দিদিমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে সে জিজ্ঞেস করে:

'সেণ্ট্ ভাখ্লাভ্ ও সেণ্ট প্রকোপ্-এর ব্লানিক্ নাইটের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী কি যেন?'

'সে হচ্ছে অন্ধ যুবকের ভবিষ্যৎ বাণী।'

'দিদিমা, আমার ভয় করে। তোমার কাছে সব প্রকাশ করতে পারি না। তবে আমাদের দেশ যে ঘোড়ার খুরে চড়ে ঘুরে বেড়াবে তা কি তুমি চাও?'

'আমার দেশের এ-দুর্ভাগ্য কি আমি চাইতে পারিরে? রোজ কি আমরা দেশের জন্য প্রার্থনা করি না? দেশই তো আমাদের মা। মা'র দুর্গতি দেখে কি আমি চুপ ক'রে থাকতে পারি? তোর মাকে যদি কেউ মেরে ফেলতে চায় তাহলে তুই কি করবি?'

'আমরা কাঁদবো,' ছেলেরা এক সঙ্গে জবাব দেয়।

'তোরা সত্যিই ছেলেমানুষ—' দিদিমা হাসেন।

'আমরা মাকে সাহায্য করবো। তাই না?' বারুস্কার চোখ দুটি জলজল করে।

'তাই ঠিক্, এই তো তোদের কর্তব্য। শুধ্ কেঁদে লাভ কি?' দিদিমা স্নেহভরে নাতনীর মাথায় হাত রাখেন।

'কিন্তু দিদিমা, আমরা যে ছেলেমানুষ, আমরা কি সাহায্য করতে পারি?' জন্ জিজ্ঞেস করে। মনে মনে সে ভাবে তার ওপর দিদিমার ধারণা এত ছোট।

'মনে নেই তোদের ছোট ডেভিডের কথা? কি ক'রে সে গোলিয়াথকে বধ করিয়াছিলো? ছেলেমানুষ হলেও অনেক কিছু করা যায় যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকে। সে কথা কখনও ভুলবি না। বড় হয়ে তোরা পৃথিবীর কত জায়গায় যাবি, ভালমন্দ কত কি দেখবি। কত প্রলোভন আসবে তোদের সামনে। তখন দিদিমার কথা মনে করিস। মনে করিস কি বলতো সে। তোরা তো জানিস প্রুশিয়ার

রাজা আমায় যে সহজ জীবিকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন, তাও আমি গ্রহণ করিনি—বরং কঠোর জীবন যাত্রাই আমি মেনে নিয়েছিলাম যাতে আমার সন্তানেরা আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। তোদেরও তাই দেশকে ভালবাসতে হবে—যেমন তোরা তোদের মাকে ভালবাসিস। দেশের ওপর তোদের যে কর্তব্য তা পালন করবি, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোদের যা আশঙ্কা তা কোন দিনই আসবে না। তোরা বড় হওয়ার আগেই আমি মরে যাব। তবে আমার বিশ্বাস তোরা আমার কথা মনে রাখবি।' অনুভূতিতে দিদিমার স্বর কেঁপে ওঠে।

দিদিমার কোলে মাথা রেখে বারুঙ্কা বলে: 'কখনও ভুলবো না তোমাকে দিদিমা।'

ছেলেরা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। বারুঙ্কার মত তারা দিদিমার সব কথা বুঝতে পারে না।

আডেল্‌কা দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলে: 'তুমি মরে যাবে না দিদিমা—'

তাকে বুকে চেপে ধরে দিদিমা জবাব দেন: 'জগতে সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী দিদি। আমারও একদিন ডাক আসবে।'

সবাই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। দিদিমা চিন্তামগ্ন। ছেলে-মেয়েরা কথা খুঁজে পায় না। পাখার ঝটপটানির শব্দে সবাই ওপরে চেয়ে দেখে যে একপাল পাখি উড়ে যাচ্ছে।

দিদিমা বলেন: 'এ হচ্ছে বুনো হাঁস। এরা সবসময়ই ছোট ছোট পালে দল বেঁধে যায়। এক এক পরিবার এক এক সঙ্গে। অন্য পাখিদের চেয়ে এদের উড়ে যাবার ভঙ্গীও ভিন্ন। চেয়ে দেখ সামনে দুটি, পিছনে দুটি আর মাঝখানে সবগুলি এক লাইনে। কাক ও সোয়ালো বড় বড় দল বেঁধে উড়ে যায়। তাদের সামনে থাকে অনেকে, তারা পথে

আশ্রয়ের সন্ধান করে। দু'পাশে যারা থাকে, তাহারা পাহারাদার—আপদ বিপদের সময় তারা বাচ্চা ও স্ত্রী পাখিদের রক্ষা করে। প্রায়ই একদলের সঙ্গে শত্রুদলের দেখা হয়ে যায়। তখন লড়াই শুরু হয়।'

উইলি জিজ্ঞেস করে: 'কিন্তু দিদিমা, ওদের যখন স্থান নেই, বন্দুক বা তলোয়ার ধরতে পারে না, তখন লড়াই ক'রে কি করে?'

'ওরা লড়াই করে ওদের প্রথায়। মুখ দিয়ে ঠুকরে বা পাখার ঝাপটা দিয়ে ওরা হাতিয়ার হাতে মানুষের মতই হিংস্র হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধে অনেক পাখি মরে নিচে মাটিতে পড়ে যায়।'

'কি বোকা!' জন্ মন্তব্য করে।

'তা বটে। ভগবান মানুষকে এত বুদ্ধি দিয়েছেন, তবু সামান্য কারণে তারা মারামারি কাটাকাটি করে।' দিদিমা উঠে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য তৈরি হন। 'দেখ দেখ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিমের আকাশে গাঢ় লাল রং, কাল বৃষ্টি হবে।' তারপর পাহাড়ের দিকে চেয়ে তিনি বলেন: 'বরফ ঢাকা চূড়াতেও পাগড়ী বাঁধা।'

রিসেন্ পাহাড়ের শিকার-রক্ষকের কথা মনে ক'রে উইলি বলে ওঠে: 'তাহলে বেয়ারের বড় কষ্ট হবে। বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ানই তার কাজ।'

দিদিমা জবাব দেন: 'সব কাজেই কিছু না কিছু কষ্ট আছে। কিন্তু মানুষকে ভালর সঙ্গে মন্দও সহ্য করতে হয়।'

বুক ফুলিয়ে জন্ বলে: 'আমি শিকার-রক্ষক হবো। বেয়ারের সাথে আমি যাবো।

ঘুড়ি উড়িয়ে সে ছুটে যায় পাহাড়ের নিচে—উইলিও তার পিছু পিছু আসে। মাঠ থেকে রাখাল ছেলেরা গরু নিয়ে চলেছে। গলায় লাল বেল্টে পিতলের ঘণ্টা বাঁধা...গরুগুলিকে ছেলেমেয়েদের বড় ভাল লাগে। ঘণ্টাগুলির শব্দ এক-একটি গরুর এক-এক রকম। তারাও

বোধহয় তাই জেনে বারবার ঘাড় দোলাতে থাকে। তাদের দেখে আডেল্‌কা গেয়ে ওঠে :

'হেই হো! নদীর পাড়ে মাঠের ধারে, গরুরা ফেরে বাড়ির পানে। সঙ্গে আনে দুধ আর ননী।'

দিদিমা বারুস্কার অপেক্ষা করেন। সে এখনও পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যাস্ত দেখছে। উজ্জ্বল আকাশের গায়ে পাহাড়ের সীমারেখা ফুটে ওঠে। ছোট ছোট টিবির ওপর, ক্যাসেল্‌ ও গির্জার ওপর সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। নিচে মাটির ওপর স্তম্ভগুলি ও তাদের ওপর খিলানগুলি গ্রীক্‌ স্থপতি মূর্তির মত মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কাল রঙের মূর্তিগুলিতে মিশরীয় ও আরবীয় স্থাপত্যের সোনালী রেখা ঘিরে ধরেছে। ক্রমে ক্রমে পাহাড়, বন, ক্যাসেল অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর আবার নতুন দৃশ্য ভেসে আসে। দেখে বারুস্কা বিমোহিত হয়ে যায়। দিদিমাকে ডাকে ওপরে উঠে আসতে। দিদিমা বলেন তাঁর পায়ের শক্তি আর নেই। কিছুক্ষণ পর বারুস্কা নিচে সবার কাছে নেবে আসে।

সব সাধুসন্তদের স্মরণ দিবসে দিদিমা ছেলেমেয়েদের জন্য গির্জা থেকে মোমবাতি নিয়ে আসেন। বলেন : 'আমরা যখন সমাধিস্থানে যেতে পারবো না, তখন বাড়িতেই এক-এক জন আত্মার উদ্দেশ্যে বাতি জ্বেলে দেবো।' প্রতি বছর তারা বাড়িতে পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে এই উৎসবটি পালন করে।

'সব সাধুসন্তদের স্মরণ দিবসে'—এদিন প্রতিটি কবরে দীপ জ্বেলে দেওয়া হয় আত্মার উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যায় তারা টেবিলের ওপর মোমবাতি সব জ্বেলে দেয়, জ্বালার আগে কার উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে সেই নামটি উচ্চারণ করে। তারপরও আরও কয়েকটি মোমবাতি জ্বেলে তারা বলে : 'অজানা আত্মাদের উদ্দেশ্যে—'

'হ্যাঁ তোমাদের প্রার্থনা ভগবানের কানে পৌঁছোবে।'

দিদিমা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে টেবিলের পাশে হাঁটু পেতে প্রার্থনা করেন, যতক্ষণ মোমবাতিগুলি জ্বলে। 'অনন্ত আলো যেন তাদের আত্মার পথ প্রদর্শক হয়···তাদের আত্মার যেন শান্তিলাভ হয়।' দিদিমা প্রার্থনা শেষ করেন। ছেলেমেয়েরা বলে: 'তাই হোক।'

'সব আত্মার দিনের' এক সপ্তাহ পরে এক সকালে দিদিমা ছেলে-মেয়েদের ডেকে বলেন সাদা ঘোড়ায় চড়ে সেণ্ট মার্টিন এসে গেছে। তারা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ছুটে জানালার কাছে যায়। চারদিক সাদা। পাহাড়ের গায়ে একটুও সবুজ পাতার চিহ্ন নেই, নদীর ধারে উইলো গাছেও না, পুকুর পাড়ে এল্ডার গাছেও না। বনে একমাত্র সবুজ শুধু ফার্ ও বাল্সাম্ গাছগুলি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির কাছে মাউণ্টেন্ এ্যাস্ গাছে তখনও কয়েক থোকা শীতে জমা বেরী ঝুলছে। একটি কাক বসে আছে। উঠানে হাঁসমুরগীগুলি চারদিকের অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। চড়ুই পাখিগুলি নাচতে নাচতে হাঁসমুরগীর উচ্ছিষ্ট ফসলের দানাগুলি কুড়িয়ে খাচ্ছে। বিড়ালটা পাখিগুলিকে তাড়া ক'রে এসে গা থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে উনুনের ওপর গিয়ে বসে। কুকুরগুলি বরফে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়।

'বরফ! বরফ! ভালই হলো। আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে নামবো!' ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠে শীতকে অভ্যর্থনা জানায়। তাদের সত্যিই আনন্দ। সেণ্ট মার্টিন-এ তাদের ভাল কেক্ এসেছে। তারপর আসবে পালক ছাড়ানোর উৎসব। ছেলেমেয়েরা সূতাকাটা উৎসবই বেশী পছন্দ করে কারণ তাতে তাদের স্বাধীনতা বেশী। মেয়েরা যখন খাবার টেবিলের চারদিকে বসে তার উপর পালকের বস্তা খোলে তখন দিদিমা আডেল্কা ও ছেলেদের সরিয়ে দেন। একবার জন্ যখন টেবিলে বসেছিল, সে পালকের গাদায় পড়ে

গিয়েছিল···সে এক ভুর্ভোগ। সেই থেকে দিদিমা ছেলেমেয়েদের টেবিলেব কাছে আসতে দেন না। তারা কাছেও আসতে পারে না, বা ফুঁ দিতে পারে না, বা দরজাও খুলতে পারে না, তাহলে বকুনি খাবে। পালকের উৎসবে* একমাত্র আনন্দের কথা যে তারা মটরভাজা পাবে আর গল্প শুনতে পাবে ভূতের, দস্যুর ও জলমানুষের। কুয়াশা ঢাকা সন্ধ্যায় স্ত্রীলোকেরা এক গ্রাম থেকে আর-এক গ্রামে যেতে যেতে কিছু দেখে ভয় পেলেই তাদের আর সে-গল্প-বলা শেষ হয় না। এমনি কত ঘটনা ছেলেমেয়েরা শুনেছে।

চোরেরা বসন্তে জেলে যায় আবাব গাছের পাতা পড়ার সময় ফিরে আসে। লোকে বলতো তারা স্কুলে কিছু শিখতে গিয়েছিলো। এই নিয়েও কথা হয়। এই থেকে চোর-ডাকাতের কথা ওঠে। ছেলে-মেয়েরা চুপটি ক'রে বসে গল্প শোনে। ঘরের বাইরে যাবার সাহসও তাদের হয় না। তাই দেখে দিদিমা গল্পের মোড ঘুরিয়ে দেন।

সেণ্ট মার্টিনের পর শহরে হাট বসে। শ্রীমতী প্রশেক বেটসে ও ভোরসাকে সঙ্গে নিয়ে চীনামাটির বাসন ও শীতের প্রয়োজনীয় সব কিছু কিনতে যায়। ছেলেমেয়েরা মা'র ফিরে আসার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে···কারণ তাদের জন্যও আসবে খেলনা বা অন্য কিছু। দিদিমার জন্য প্রতি বছরই পশমের মোজা, গরম জুতো আর চরকার জন্য ছয় ফেটি সুতো আসে।

দেরাজে সুতা তুলে রাখতে রাখতে দিদিমা জনকে বলেন: 'তুই না থাকলে আমার এক ফেটিতেই কাজ হয়ে যেত।'

এবার আডেল্‌কা পেয়েছে একখানি কাঠ, তাতে বর্ণমালা লেখা। 'কাল যখন মাষ্টার মশায় আসবেন তুই পড়া আরম্ভ করবি। সবাই যখন পড়ে তখন তোর কিছু করার থাকে না। এবার অ, আ আরম্ভ করাই ভাল—' মা বলে।

আডেল্‌কা তখনই আনন্দে লাফিয়ে উঠে মন দিয়ে বর্ণমালা পড়তে বসে। উইলি তাকে পড়াতে আসে অ, উ···কিন্তু সে কাঠের টুকরোটি পিছনে সরিয়ে রেখে বলে': 'তোর কাছে পড়বো না। তুই মাষ্টার মশায়ের মত পড়াতে পারিস না।'

উইলি রাগ ক'রে বলে: 'আমি বই পড়তে পারি, আর আমি অক্ষর চিনি না।'

বোন জবাব দেয়: 'কিন্তু এ অক্ষর তো তোর বইয়ের মত নয়।'

'বোকা মেয়ে।' উইলি বলে বিরক্ত হয়ে।

'তাহোক—' আডেল্‌কা মাথা নেড়ে বর্ণমালা হাতে ক'রে জানালায় কাছে গিয়ে বসে।

ভাইবোন যখন এখানে ঝগড়া করছে, তখন জন্‌ রান্নাঘরে স্থলতান্‌ ও টাইলরকে নিয়ে এক সঙ্গীতের আসর বসিয়েছে। মা যে ঢাক আর শানাই নিয়ে এসেছে তাই বাজাচ্ছে সে। কুকুরগুলি এ সঙ্গীতের মর্ম বোঝে না। তাই স্থলতান্‌ ডেকে ওঠে আর টাইরল্‌ হাউ হাউ করে। দিদিমা ছিলেন ভাঁড়ারে, মেয়ের সঙ্গে সওদা গুছিয়ে রাখছিলেন। সঙ্গীত শুনে দু'জনেই রান্নাঘরে ছুটে আসেন:

'বলেছি না আমি, এ-পাজি ছাড়া আর কে হবে—হাড়ে হাড়ে দুষ্টুমি। থাম এবার!'

জন্‌ মুখ থেকে শানাই নামিয়ে হেসে বলে: যেন দিদিমার কথা শুনতেই পায়নি—'দেখ কুকুরগুলো কি পাগল,—গানবাজনা ওদের ভালই লাগে না।'

'ওরা যদি কথা বলতে পারতো তাহলে তোকে বলতো: ভাগ ভাগ এখান থেকে তুই তোর বাজনা নিয়ে। বুঝতে পেরেছিস্‌? যা, রেখে দেগে ওগুলো। এমন দুষ্টুমি যদি করিস তা হ'লে সেণ্ট নিকোলাসকে বলে দেব এবছর তোকে কিছু না দিতে।' দিদিমা ভয় দেখান।

দিদিমার কথা শুনে ভোরসা সায় দিয়ে বলে : 'ভালই হবে তা হ'লে। শুনলাম শহরে এবার সেণ্টনিকোলাস এক গাড়ী খেলনা নিয়ে এসেছে। তবে তা শুধু সেই সব ছেলেমেয়েদের জন্য যারা সত্যিকারের বাধ্য।'

পরদিন মাষ্টার মশাই আসতেই আড়েল্‌কা তার "বর্ণ পরিচয়" নিয়ে সকলের সঙ্গে বসে। মন দিয়ে সে অক্ষরগুলি দেখে। তারপর এক ঘণ্টা পরেই সে আনন্দে ছুটে দিদিমার কাছে এসে বলে যে প্রথম লাইনের সব অক্ষরগুলিই সে পড়তে পারে। মা ও দিদিমা তা দেখে সন্তুষ্ট হন, তাছাড়া পরের দিনও আডেল্‌কা অক্ষরগুলি ভুলে যায় না। বারবার পড়া শুনে দিদিমাও শিখে ফেলেন অক্ষরগুলি। মনে মনে বলেন তিনি : 'বেশ, বেশ, জীবনে ভাবিনি কখনও যে অ, আ শিখতে পারবো আমি। আর এখন শিখে গেছি। ছোটদের সঙ্গে থেকে থেকে আমিও যেন ছেলেমানুষ হয়ে পড়ছি।'

একদিন জন্‌ ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে সবাইকে বলে : 'দেখ দেখ, দিদিমা চাল থেকে চরকা নামিয়েছেন।'

'কি হয়েছে তাতে?' মা দেখে সবাই, এমনকি বারুস্কা পর্যন্ত ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিছু হয় নি সত্যি। তার মনে নেই চরকা দেখে ছেলেমেয়েদের এত আনন্দ কেন হয়। সূতো কাটার সঙ্গে সঙ্গে দিদিমার কত গল্প কত গান। ছেলেমেয়েদের মা'র এসব ভাল লাগে না। সে ঘরে বসে ক্যাসেলের পাঠাগার থেকে আনা বই পড়ে। তাই দেখে দিদিমা বলেন : 'আমাদের ইতিহাসের গল্প বল না, বই থেকে।'

মা গল্প বলে। ছেলেমেয়েদের কিন্তু সে-গল্প ভাল লাগে না। সবচেয়ে ভাল লাগে তাদের ভিয়েনার কথা শুনতে। সূতো কাটতে কাটতে মেয়েরা যেই বলে ওঠে : 'কি জানি কি সুন্দর ভিয়েনা

শহর!' ছেলেমেয়েরা মনে মনে ভাবে: 'আমরাও বড় হয়ে গেছি, আমরা তো দেখে আসতে পারি সে-শহর।'

মা ছাড়া সবাই দিদিমার গল্প শুনতে ভালবাসতো। সোনার টিপ্ কপালে রাজকুমারীর গল্প, রাজকুমার ও নাইট্ অভিশাপে সিংহ কুকুর বা পাথর হয়ে গেছে তাদের গল্প, বাদামের খোলার মধ্যে দামী দামী মসলিনের পোশাক থাকার গল্প, সমুদ্রের তলে সোনার ক্যাসেল্, সেখানকার জলপরীদের গল্প, আরও কত কি। বারুস্কার চুল বাঁধতে বাঁধতে মা দেখতো যে সে বিভোর হয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। বরফ-ঢাকা পাহাড় বা উপত্যকায় তার চোখে ভেসে উঠতো—স্বর্গের বাগান—মণি-মুক্তার রাজপ্রাসাদ—রংবেরঙের পাখি—সোনার চুলের মেয়ে। বরফ-জমা নদী তার কল্পনায় নীল সাগর হয়ে উঠতো, আর তার ওপর মুক্তার ঝিনুকে ক'রে জলপরীরা ভেসে উঠতো। সুলতান্ মেঝেয় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো। বেচারী কখনও কল্পনাও করেনি যে ছেলেরা তাকেই ভাবতো ছদ্মবেশী রাজকুমার ব'লে! সন্ধ্যা হতেই ঘরে কি আনন্দ। ভোরসা খড়খড়ি বন্ধ ক'রে দিতো। উনুনে পাইন কাঠ পোড়ার শব্দ। ঘরের মাঝে একটা মস্ত মোমবাতিদানী, তার লোহার হাতলে জলন্ত কাঠ। তার চারদিকে বেঞ্চি—যারা সুতা কাটবে তাদের জন্যে। দিদিমা সকলের হাতের কাছে শুকনো আপেল বা প্রুন রেখে দিতেন, বলতেন: 'একটু দাঁতে কাটার জন্য।' ছেলেমেয়েরা প্রতীক্ষায় থাকতো, কখন হল্ ঘরের দরজায় শব্দ হয়, সবাই সুতো কাটতে আসবে। সবাই আসার আগে দিদিমা গল্প শুরু করতেন না। দিনের বেলা তিনি গুণ গুণ ক'রে গাইতেন স্তোত্র।

ছেলেমেয়েরা তাঁকে ভাল ক'রে জানলেও ভাবতো একটু বিরক্ত করলেই দিদিমা গল্প বলবেন। তিনি কিন্তু তাদের কথা শুনতেন না। কখনও বা তিনি এক মেষপালকের কথা বলবেন। যে তিনশো ভেঁড়া

চরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে এক ছোট সাঁকোর সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সাঁকোর ওপর দিয়ে একসঙ্গে একজনের বেশী যাবার উপায় নেই। 'এবার তোমরা অপেক্ষা কর ওরা যতক্ষণ না সবাই পার হয়ে যায়।' এই বলে তিনি চুপ ক'রে থাকতেন। একটু পরেই ছেলেরা জিজ্ঞেস করতো : 'এতক্ষণে পার হয়ে গেছে?' তিনি জবাব দিতেন : 'কি ভেবেছিস তোরা—কমপক্ষে দু'ঘণ্টা লাগবে।' এ জবাবের অর্থ ছেলেমেয়েদের অজানা ছিল না। কখনও বা দিদিমা বলতেন : 'মনে কর আমার জামার সাতাত্তরটি পকেট। প্রতি পকেটে একটি ক'রে গল্প। কোন পকেটের গল্প শুনবি তোরা?'

'দশ নম্বর পকেটের!'

'বেশ তাহলে শোন। এক ছিল রাজা। তার ছিল এক চাক্‌তা। রাজা চাক্‌তার ওপর এক বিড়াল তুলে দেন। এবার শোন গল্প, অনেকক্ষণ লাগবে।' এই গল্পের শেষ।

সবচেয়ে ভাল লাগতো ছেলেমেয়েদের 'রেড্ রাইডিং হুডের' গল্প। দিদিমা শুরু করেন : 'আজ তোদের রেড্ রাইডিং হুডের গল্প বলবো।' শ্রোতারা বলে ওঠে : 'বেশ, বেশ।' তখন বক্তা বলেন : 'আমি 'বেশ বেশ'-এর গল্প বলতে চাইনি—রেড্ রাইডিং হুডের গল্প বলতে চেয়েছিলাম।' এমনি ভাবে প্রতিবার তিনি শ্রোতার কথার পুনরুক্তি করেন। সবাই আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতো ছেলেমেয়েরা। প্রথমেই আসতো ক্রিষ্টিনা, আর মিলো; তারপর ছেলিয়া কুডারনা, বেটসে ও ভোরসার বন্ধু, কখনও বা মিলারের স্ত্রী আসতো মান্‌চিঙ্কা ও শিকার-রক্ষকের স্ত্রীর সঙ্গে। সপ্তাহে একবার ক্রিষ্টিনা তার সঙ্গে এনাকে নিয়ে আসতো। এখন সে টমেসের স্ত্রী। সুতো কাটা হয়ে গেলে তার স্বামী এসে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেত। কাজ শুরু হবার আগে আগুন পোয়াতে পোয়াতে স্ত্রীলোকদের নানা আলোচনা

চলতো। গ্রামের কথা, শহরের খবর। সংস্কারের কথা, এমনি অনেক কিছু। সেণ্ট নিকোলাসের আগে ক্রিষ্টিনা আডেল্‌কাকে জিজ্ঞেস করে : 'তোমরা মোজা ঝুলিয়ে রেখেছো? সেণ্ট্‌ নিকোলাস যে গ্রামে এসেছে।' ছোট মেয়েটি জবাব দেয় : 'আমি ঘুমুলে দিদিমা ঝুলিয়ে রাখবে।' ক্রিষ্টিনা তখন বুদ্ধি দেয় : 'তোমার মোজাটি ঝুলিয়ে রেখো না। ওটি বড় ছোট। দিদিমার মোজাটি চেয়ে নিয়ো।'

জন্‌ বলে : 'তা হবে না। তাহলে আমরা ঠকে যাবো।'

ক্রিষ্টিনা ঠাট্টা ক'রে বলে : 'তুমি একখানি চাবুক ছাড়া আর কিছুই পাবে না।'

জন্‌ জবাব দেয় : 'সেণ্ট নিকোলাস্‌ জানে যে গত বছর থেকে দিদিমা একখানি চাবুক লুকিয়ে রেখেছেন। তবে আমায় তো কখনো মারেননি।'

তা শুনে দিদিমা মন্তব্য করেন : 'তুই যে মার খাবার যোগ্য নোস্‌'

'লুসির দিনটি' ছেলেমেয়েদের কাছে বড বিরক্তিকর। প্রবাদ যে এক রাতে লুসি নামে একটি স্ত্রীলোক সাদা পোশাক পরে, আলুথালু চুলে অবাধ্য ছেলেমেয়েদের খুঁজতে যায়। দিদিমা বলতেন : 'ভীরুতাই মূর্খতা।' ছেলেমেয়েরা কখনও যাতে ভয় পায় সে-গল্প বলতেন না তিনি। তাঁর শিক্ষা ছিল একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কাউকে ভয় না করা। তবু ছোটদের বাপের মত তিনিও প্রমাণ দিতে পারতেন না যে ভাল মানুষ, ড্রাগন, আলেয়া ব'লে কিছু নেই। এ সব সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস একেবারে মজ্জাগত। তাঁর ধারণা জগতের সব কিছুতেই শুভ বা অশুভ আত্মার বাস। ভগবান জগতে অশুভ পৈশাচিক আত্মা পাঠিয়ে দেন শুধু মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। একথা তিনি বিশ্বাস করতেন, তবে ভয় ছিল না তাঁর, কারণ ভগবানে বিশ্বাস ছিল তাঁর অসীম, আর সেই ভগবানের অধীনেই স্বর্গ,

মর্ত, পাতাল। তাঁর কৃপা না হলে সাধ্য কি একটি চুল খসে পড়ে। ছেলেমেয়েদের মনে তিনি এই ভগবৎ বিশ্বাস আরোপ করতে চেষ্টা করতেন। তাই 'লুসির দিনে' ভোরসা যখন সেই সাদা পোশাক পরা স্ত্রীলোকটির গল্প আরম্ভ করে দিদিমা তাকে চুপ করতে বলেন।

সবচেয়ে অভ্যাগত অতিথি ছিল মিলো। সে তার ছুরি দিয়ে ছেলেদের জন্য স্লেজ, লাঙল্ বা গাড়ি বানিয়ে দিত বা আগুনে দেবার জন্য কাঠ ঠিক ক'রে দিত। মেয়েরা যেই ভূতের গল্প করতো, উইলি তাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরতো: সে বলতো: 'ভয় করোনা উইলি—শয়তানের জন্য আমাদের ক্রুশ আছে আর ভূতের জন্য চাবুক। দুটোকেই মেরে ঠিক ক'রে দেব।'

তা শুনে ছেলেদের সাহস হতো। মাঝ রাতেও তারা মিলোর সঙ্গে কোথাও যেতে পারতো। তাদের সাহস দেখে দিদিমা বলতেন: 'এই তো চাই। এই তো পুরুষমানুষের মত।'

'সত্যিই মিলো শয়তানকেও ভয় করে না, এমনকি সেই কর্মাধ্যক্ষকেও ভয় করে না—' মন্তব্য করে ক্রিষ্টিনা।

দিদিমা জিজ্ঞেস করেন: 'মিলো তোমার জমিদারের খামারে কাজ পাবার আশা আছে তো?'

জানিনা দিদিমা, আমায় দু'দিক থেকেই চাপ দিচ্ছে—আর কয়েকজন বিদ্বেষপরায়না স্ত্রী-লোক আমার ব্যাপারে বড় মাথা ঘামাচ্ছে—' মিলো জবাব দেয়।

ক্রিষ্টিনা দুঃখের স্বরে বলে: 'এমনি ভাবে বলো না, তা হ'লে হয়তো সব ভেস্তে যাবে।'

'আমারও যে অনিচ্ছা তা নয়, তবে আমি তো কোন উপায়ই দেখি না। ইটালিয়ান ছেঁছাড়াটাকে যে ভাবে জব্দ করেছি, তার জন্য কর্মাধ্যক্ষের মেয়ে আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।' লোকে বলে

তার সঙ্গে ইটালিয়ানটার প্রেম ছিল। তারপর রাজকুমারী যখন ইটালিয়ানটাকে ভৎর্সনা করেন তখন কর্মাধ্যক্ষের মেয়ের সব মতলব ভেস্তে যায়। এখন সে সবরকম ভাবেই তার বাবাকে দিয়ে চেষ্টা করবে আমার যেন চাকরি না হয়। এই হলো এক নম্বর শত্রু। আর এক শত্রু লুসি, মোড়লের মেয়ে। তার মতলব যে সুতা কাটার উৎসবে আমি তার রাজা হই। কিন্তু এতে আমি কিছুতেই রাজী নই। সম্ভবতঃ তার বাবাও আমার ওপর রাগ করবে। তাই বসন্তকাল এসে গেল, হয়তো আমায় গাইতে হবে—

'হায়! আমায় এবার সৈন্য হতে হবে,
সব স্বাধীনতা আমার ঘুচে যাবে।'

মিলোর সঙ্গে সব মেয়েরাও গেয়ে ওঠে। ক্রিষ্টিনা মন খারাপ ক'রে বসে থাকে।

দিদিমা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন: 'এখনও বসন্তকালের অনেক দেরী—চিন্তা করিস না। সবই ভগবানের ইচ্ছা।'

ক্রিষ্টিনা চোখের জল মুছে ফেলে। কিন্তু সারাটি সন্ধ্যা সে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে।

মিলো এসে তার পাশে বসে। বলে: 'মন খারাপ ক'রে লাভ কি? বাবা হয়তো সবকিছু মিটিয়ে ফেলতে পারবে।''

দিদিমা জিজ্ঞেস করেন: 'কিন্তু তুমি কি উৎসবে সেই মেয়েটির 'রাজা' হতে পারো না? অবশ্য তাকে অন্য কোন আশ্বাস না দিয়ে।'

'তা পারি দিদিমা, কেউ কেউ এক সঙ্গে দু'তিনটি মেয়ের সঙ্গে ভাব করে, শেষ পর্যন্ত একজনকে বেছে নেয়। মেয়েরাও ঠিক তাই করে। আমি লুসির প্রথম প্রেমিক হবো না বা শেষ প্রেমিকও হতে চাই না। তবু আমাদের মধ্যে একথা খুব কম লোকই শুনেছে যে, কেউ

এক সঙ্গে দু'টি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। তাছাড়া 'রাজা' হবার অর্থ প্রায় বিয়ে করতে যাওয়া।'

'তাহলে তুমি যেয়ো না,' বলেন দিদিমা।

ক্রিষ্টিনা তিরস্কারের স্বরে বলে: 'লুসিয়ই বা কি হয়েছে যে সে তোমাকেই চায়। গ্রামে কি আর কোন ছেলে নেই?'

দিদিমা হেসে জবাব দেন: 'মিলার এখানে থাকলে বলতো— পছন্দেব কোন কারণ নেই।'

বড়দিনেব ছুটি যেই এগিয়ে আসে, কেক ভাজা সম্বন্ধে কথাবার্তা ওঠে—ময়দা কতখানি মিহি হবে, কতখানি মাখন দিতে হবে—এমনি সব কথা। মেয়েবা আলোচনা করে—ছেলেমেয়েদের ভাল রুটির কথা বা বাদামের খোলায় ক'রে মোমবাতি ভাসিয়ে দেবার পরিকল্পনা। তাছাড়া ছোট যীশু তাদের জন্য উপহার নিয়ে আসবে। [বোহেমিয়ায় দু'টি উৎসবেই উপহার দেওয়া হয়। ৬ই ডিসেম্বর সেণ্ট নিকোলাস্ দিনে ও বড়দিনে। ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস যে বড়দিনে যীশু শিশুব বেশে উপহার নিয়ে আসে।]

এগার

মিলে, শিকার-রক্ষকের বাড়ির বা পুরোনো বাড়ির প্রথা ছিল যে বড়দিনে বা তার আগের দিন যে কেউ বাড়িতে আসুক না কেন, সে যা চাইবে তাই খেতে বা পান করতে দিতে হবে। কেউ যদি না আসতো তাহলে দিদিমা বড় রাস্তায় গিয়ে কারও জন্য অপেক্ষা করতেন। বড়দিনের আগের দিন যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর ছেলে ও ভাগ্নে ওলেস্‌নিক থেকে এসে হাজির হতো, তখন তাঁর কি আনন্দ। প্রায় সারাদিনই তিনি আনন্দে চোখের জল ফেলেন—

তারপর প্রতিমিনিটেই রুটি ভাজা ফেলে ঘরে ছুটে আসেন,—ভাগ্নেকে জিজ্ঞেস করেন—তাঁর আগের বাড়িতে কে কেমন আছে? ও কেমন আছে।' ছেলেমেয়েদের বারবার তিনি বলেন: 'তোদের দাদা-মশাই ঠিক তোদের মামার মত দেখতে ছিলেন। তবে তিনি আরও লম্বা ছিলেন।' ছেলেমেয়েরা বারবার ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখে। তাদেরও এদের মত পছন্দ হয়েছে, কারণ ছেলেমেয়েদের অযথা প্রশ্নের জবাব তারা জুগিয়ে চলেছে।

প্রতি বছরই ছেলেমেয়েরা বড়দিনের আগের দিন উপোশ করার সংকল্প করে, যেন তারা সোনার শূয়রের স্বপ্ন দেখতে পায়। [ছেলে-মেয়েদের বলা হয়েছে, তারা যদি উপোশ ক'রে থাকে, তাহলে তারা ঘরে সুন্দর সোনার শূয়র দেখতে পাবে। কেউই যখন তাদের সংকল্প রাখতে পারতো না, সোনার শূয়রের আর দেখা মিলতো না।] কিন্তু কেউই সে-সংকল্প পালন করতে পারতো না। সেদিন সবারই ভালমন্দ খাবার মিলতো। এমনকি হাঁস-মুরগী বা গরু-ভেড়াও বাদ যেত না—যখন বড়দিনের রুটি কাটা হতো। খাবার পর দিদিমা সব পাত থেকে কিছু কিছু কুড়িয়ে অর্ধেক নদীতে ফেলে দিতেন,—যাতে জল পরিষ্কার থাকে, আর অর্ধেক বাগানে গাছের তলে মাটিতে পুঁতে রাখতেন—মাটি যাতে উর্ব্বর হয়। রুটির টুকরো বা গুড়ো ভাল ক'রে ঝেড়ে তিনি আগুনে ফেলে দিতেন—আগুন যেন মানুষের কোন ক্ষতি না করে।

বেট্সে একটি এল্ডার গাছের ডাল নিয়ে তা দুলিয়ে আবৃত্তি করতো—

এল্ডার তোমায় আমি দোলাই।
বলতো আমায়, কুকুরগুলো, তোমরা তো জেগে,
আজ রাতে আমার মনের মানুষ কোথায়?

তারপর থেকে সে কান পেতে শুনতো কোনদিকে কুকুর ডাকছে। বসবার ঘরে বসে মেয়েরা মোম বা সীসা গলায়, আর ছেলেরা বাদামের খোসায় ক'রে মোমবাতি ভাসিয়ে দেয়। [এ একরকমের ভবিষ্যৎ জানার প্রথা। মোম বা সীসা গলে যেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়, সেই আকার থেকে বুঝতে পারা যায় পরের বছর কেমন কার কাটবে।]

জন্ চুপে চুপে জলের গামলায় ধাক্কা দেয়—আর সেই ধাক্কায় বাদামের খোসা জলের ধার থেকে জলের মাঝখানে ভেসে যায়। তাই দেখে সে চেঁচিয়ে ওঠে: 'দেখ, দেখ পরের বছর আমি অনেক দূরে যাবো।'

মা ধীরে জবাব দেয়: 'বাছা, জীবনস্রোতে যেই ঝড়, ঘূর্ণি বা জলের তলের পাহাড়ের পাশ দিয়ে তুমি ভেসে যাবে, ঢেউ এসে যেই তোমার নৌকায় ঘা দেবে, তখন এই শান্ত মধুর ঘরখানি যেখান থেকে তোমার খেলার নৌকা ভাসিয়েছ, তার কথা মনে পড়বে।' মা 'সৌভাগ্যের' আপেল কাটছিল। আপেলের বীজটি একটি তারার মত হয়ে দেখা দিল, তিনটি দিক বেশ পরিষ্কার, কিন্তু অপর দুটি দিক পোকায় খাওয়া। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেটা সরিয়ে রেখে আবার একটি আপেল বারুস্কার জন্য তুলে নেয়। এবার বীজটি ঠিক একটি সম্পূর্ণ তারার মত হলো না। 'কেউই সম্পূর্ণ সুখী হবে না,'—মনে মনে বলে মা আবার উইলি ও আডেল্‌কার জন্য আপেল কাটতে বসে। কিন্তু সবচেয়ে যার ভাল কাটা হয় তা'তে মাত্র তারার চারটি রশ্মিরেখা পরিষ্কার দেখা যায়—তার বেশী নয়। মা মনে মনে ভাবে: 'এরা হয়তো বেশী সুখী হবে।' এর মধ্যে আডেল্‌কা এসে বলে যে তার নৌকা জলের কিনারা ছেড়ে কিছুতেই যাবে না, আর তার মোমবাতি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

'আমারটাও ফুরিয়ে এসেছে, আর বেশী দূর যায়নি,' বলে ওঠে উইলি।

হঠাৎ কে যেন জলে ধাক্কা দেয়। জল তুলে উঠে মাঝের নৌকাগুলি ডুবে যায়।

আডেল্‌কা ও উইলি এক সঙ্গে বলে ওঠে: 'দেখ দেখ, তোরা আমাদের আগে মরে যাবি!'

'তাহোক, তবুও তো আমরা তোদের চেয়ে বেশী দূর যাবো,' বলে বারুস্কা। জন্‌ও সায় দেয়। মা কেবল নিভে-যাওয়া মোমবাতিগুলির দিকে চেয়ে থাকে। এক ভাবী অমঙ্গলের পূর্ববোধ ভেসে আসে তার মনে। কে জানে এই নির্বোধ ছেলেমেয়েদের খেলার ফলাফলই হয়তো তাদের ভবিষ্যৎ নির্দেশ করবে।

টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেলে ছেলেমেয়েরা দিদিমাকে ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞেস করে: 'ছোট যীশু কি আমাদের জন্য কিছু নিয়ে আসবে?'

দিদিমা জবাব দেন: 'আমি জানি না। ঘণ্টা বাজলেই তোরা শুনতে পাবি।' ছেলেমেয়েরা জানালায় বসে দেখে কখন যীশু যাবে, তারা শুনতে পাবে। দিদিমা তখন বলেন: 'জানিস না তোরা যে যীশুকে দেখাও যায় না বা তাঁর কথা শোনাও যায় না? তিনি স্বর্গে সোনার সিংহাসনে বসে লক্ষ্মী ছেলেমেয়েদের জন্য দেবদূতকে দিয়ে উপহার পাঠিয়ে দেন। দেবদূত সোনার মেঘে চড়ে আসে। তোরা শুধু ঘণ্টার শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাবি না।'

ছেলেরা তখন জানালায় বসে দিদিমার কথায় বিশ্বাস ক'রে তাকিয়ে থাকে। এমনি সময় জানালার পাশে এক উজ্জ্বল আলো দেখা যায় আর সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার শব্দ। ছেলেমেয়েরা বিস্ময়ে এক হাতে আর এক হাত চেপে ধরে। আডেল্‌কা ফিস্ ফিস্ করে বলে: 'দিদিমা এইতো ছোট যীশু, তাই না?' দিদিমা ঘাড় নাড়েন। তখন দরজা খুলে মা এসে বলে: 'যীশু দিদিমার ঘরে সব উপহার রেখে গেছেন।' ছেলে-মেয়েরা ছুটে এসে দেখে একটি আলোময় গাছ। তাদের আনন্দ আর

ধরে না। দিদিমা এসব প্রথা জানতেন না—গ্রামে এর রেওয়াজ ছিল না। তবু দেখে তিনি সুখী হলেন।

'নাইসে ও ক্লাড্রানে এ প্রথা ছিল। মনে আছে তোর জ্যাস্‌পার? আমরা যখন চলে আসি তখন তো তুই ছেলেমানুষ—' দিদিমা ছেলেকে বলেন। ছেলেরা গাছ দেখে ও উপহার নিয়ে আনন্দ করে।

'মনে আছে বৈকি,' জ্যাস্‌পার জবাব দেয়: 'এতো বেশ ভাল প্রথা। থেরেসা, তুমিও এখানে বড়দিনের গাছ ক'রে ভালই করেছো। ছেলে-মেয়েরা যখন বড় হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে, তখন তাদের এসব স্মৃতি বড় মধুর হয়ে মনে থাকে। বাড়ির বাইরে থেকে এ-দিনটির কথা মনে পড়ে। আমার মনিব খারাপ ছিল না, তবুও এ-দিনটিতে আমার মনে হতো যেন বাড়িতে মা'র কাছে যাই—সেখানে মধু দিয়ে পুডিং, পপির সস্‌ দিয়ে বান্‌ আর মটর দিয়ে বাঁধাকপি খেতে পাবো।'

দিদিমা হেসে বলেন: 'বাড়ির খাবার, কিন্তু তুই যে শুকনো ফলের কথা ভুলে গিয়েছিস।'

'সে-কথা নয়—। অন্য একটা জিনিস শুনতে ইচ্ছে করে আমার। ডব্‌রানে তাকে 'গান' বলতো।'

'ও বুঝেছি। মেষপালকের বড়দিনের স্তুতিগান। এখানেও আছে। এখনই শুনতে পাবি।' কথা শেষ হবার আগেই জানালার কাছে মেষ-চারকের শিঙার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। প্রথমে শিঙায় গানের সুর বাজে, তারপর মেষ-চারকেরা গেয়ে ওঠে:

'মেষ-চারকেরা তোমরা সবাই জেগে ওঠো!
আমরা এক সুখবর নিয়ে এসেছি,
বেথ্‌লেহেমের এক গোয়ালে আজ
জন্মেছেন এক ত্রাণকর্তা।'

'ঠিকই বলেছিস জ্যাস্‌পার। এ গান না শুনলে আজ বড়দিন বলে

মনেই হতো না—' বললেন দিদিমা। তারপর সব গানটি শুনে তিনি বাইরে গিয়ে সব মেষ-চারককে ভাল ভাল খাবার দিয়ে আসেন।

সেণ্ট্ ষ্টিফেন্স উৎসবে ছেলেরা মিলে ও শিকার-রক্ষকের বাড়িতে বড়দিনের গান শোনাতে যায়। তারা না গেলে মিলারের স্ত্রী ভাবতো না-জানি কি হয়েছে। নিজেই পুরোনো বাড়িতে চলে আসতো। আবার পালটা বার্টি ও ফ্রাঙ্কি আসতো গান গাইতে।

বড়দিনের ছুটির পর ছেলেরা ভাবতো 'তিন রাজা' বা 'প্রাচ্যের জ্ঞানীর' কথা। তখন স্কুলের মাষ্টার মশাই এসে যীশুর জন্মগান গেয়ে শোনাতেন এবং দরজার উপর প্রাচ্যের তিনজন জ্ঞানীর নাম লিখে দিতেন। এই 'তিন রাজার' উৎসবের পর সুতো কাটতো যারা তাদের উৎসব চলতো 'দীর্ঘ রাত্রি' পর্যন্ত।

মিলে বা পুরোনো বাড়িতে হতো অন্যরকম অনুষ্ঠান। আর গ্রামে যুবকের দল এক সঙ্গে হয়ে তাদের মধ্যে একজন রাজা ও একজন রানী মনোনীত ক'রে নিয়ে চলতো তাদের নাচ। তারপর চরকা পরিষ্কার করা ও সবশেষে রানীর মাথায় মুকুট পরিয়ে দেওয়া হতো।

পুরোনো বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পর অর্গান বাজিয়ের রান্নাঘরেই নাচ শুরু হয়ে যেত। টমেস, মিলার, শিকার-রক্ষক আরও অনেক আসতো। দলভারী হয়ে যেত। রান্নাঘরের মেঝে ছিল ইঁটের, তবুও মেয়েরা গ্রাহ্য করতো না। যাদের জুতোর চিন্তা ছিল বেশী, তারা জুতো খুলে খালি পায়েই নাচতো।

'কি বলেন দিদিমা, আমরা কি একটু পারি না?' মিলার প্রস্তাব করে। সে সকলের সঙ্গে রান্নাঘরে এসেছে। দিদিমা বসে বসে দেখছিলেন সুলতান্ ও টাইরল্ কুকুর দুটি, আর দু'একজন আনাড়ী কি ক'রে নাচের জোড়ের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

'সত্যিই মিলার মশাই, একদিন ছিল যখন আমার পায়ে ফোস্কা

পড়লেও আমি গ্রাহ্য করতাম না, যদি নাচতে পারতাম। সরাইখানায় বা গ্রীষ্মে ফসল ঝাড়াইয়ের উঠানে ছেলেরা আমায় দেখতে পেলেই ব'লে উঠতো—'ম্যাডেলিন্ এসেছে! বাজাও, বাজাও! ম্যাডেলিন্ও নাচের আসরে ছুটে যেত। কিন্তু আজ: আজ আমি উঠে গেছি।'

'সত্যিই আমার সন্দেহ হয় না। কারণ আজও আপনি পাখির মতই কর্মতৎপর। আসুন না, একবার একটু নাচের চেষ্টা ক'রে দেখি।'

'এই একজন নাচিয়ে লাটুর মত ঘুরতে পারে,' দিদিমা হেসে টমেসের স্ত্রী এনার হাত ধরে ফেললেন। সে মিলারের পিছনে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিলো।

স্ফূর্তিতে এনা এসে মিলারের হাত ধরে, কুডারনাকে বলে প্রথম সুরটি ধীরে ধীরে বাজাতে—তারপর তারা পায়ের তাল ঠিক ক'রে নেয়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক মিলারকে নাচ শুরু করতে হয়। সবাই তাদের ঘিরে হাততালি দিয়ে তাল দেয় আর স্ফূর্তিতে চিৎকার ক'রে ওঠে। গোলযোগ শুনে মিলারের স্ত্রী ছুটে আসতেই টমেস্ তাকে নাচে আমন্ত্রণ করে। তখন সেও স্বামীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। বয়স্কদেরও নাচের সখ মিটলো! দিদিমা দেখে হাসেন।

'দীর্ঘ রাত্রি' শেষ হ'তে না হ'তেই মিলের আর এক আনন্দোৎসব আরম্ভ হতো। শূয়োর মেরে সসেজ্ তৈরি হতো, কেক্, তারপর বন্ধু-বান্ধব ও শিকার-রক্ষকের বাড়ি, এবং সবশেষে প্রশেকের বাড়িতে।

এর পরেই অল্পবয়স্করা 'ডরথি' অভিনয় করতে আসতো। ভাখলাড্ কুডারনা করতো রাজা ডিয়ক্লেটিয়ানের অভিনয়, তার বোন লিডা সাজতো কুমারী ডরথি। সভাসদ দু'জন, বিচারক ও জহ্লাদের ভূমিকায় ছেরনভের ছেলেরা অভিনয় করতো। সভাসদেরা ও তার সহকারীরা সঙ্গে মস্ত ঝোলা নিয়ে আসতো—তাতে ক'রে তারা প্রাপ্য

সুখাদ্য বয়ে নিয়ে যাবে। প্রশেকের বাড়ির সামনে পুকুরটি জমে যেত এবং সেখানে তখন স্কেটিং চলতো। এখানে অভিনেতারা জমায়েত হয়ে ফূর্তি করতো, কুমারী ডরথি এদিকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে সকলের অপেক্ষা করছে। তার ডাকাডাকির শব্দও সকলের হুল্লোড়ে শোনা যেত না। এবং সকলের স্কেটিং দৌড়াদৌড়ি ও আছাড় খাওয়া শেষ না হলে কেউ-ই আসতে চাইতো না। বাড়ি আসতেই কুকুরগুলি চিৎকার ক'রে তাদের অভ্যর্থনা জানাতো—আর ছেলেমেয়েরা তাদের দেখে আনন্দে নেচে ওঠতো।

তারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঝোলা থেকে সাজসজ্জা বের ক'রে পরে নিত। অতি সাধারণ পোশাক। কুমারী ডরথির পোশাকের মধ্যে তার ভাইয়ের বুট্‌জুতো আর মান্‌চিঙ্কার কাছ থেকে ধার করা একটি সাদা রঙের পোশাক। তার মাথায় কাগজের মুকুটের তলে তার মার সাদা রুমালখানি। ছেলেদেরও মাথায় কাগজের টুপি। অন্য জামা-কাপড়ের উপর তাদের গায়ে সাদা সার্ট, আর কোমরে রংচঙা রুমাল বাঁধা। রাজা ডিয়ক্লেটিয়ান্-এর মাথায়ও একটি মুকুট। আর তার সুন্দর রাজবেশটি ছিল তার মায়ের রবিবারের ব্যবহারের সবচেয়ে ভাল চিকনের কাজ করা এপ্রণখানা। মা একদিনের জন্য তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে।

আগুনে সবাই নিজেদের একটু গরম ক'রে নিয়ে ঘরের মাঝে যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হতো। প্রতি বছর একই অভিনয় দেখে দেখে ছেলেমেয়েরা কখনও একটু বিরক্ত হতো না। যখন বিধর্মী রাজা ডিয়ক্লেটিয়ান্ খৃষ্টধর্মাবলম্বী কুমারী ডরথিকে প্রাণদণ্ড দেয়, তখন সহকারীরা তাকে হাত ধরে যূপকাষ্ঠে নিয়ে যেত। সেখানে জহ্লাদ তার খড়্গ তুলে দাঁড়িয়ে আছে—আর করুণ স্বরে বলছে :

'কুমারী ডরথি! নতজানু হও,
আমার খড়্গ তোমায় ভয় পায় না।
এবার তোমার মাথা নত করো—
এক মুহূর্তেই তোমার মরণ ঘনিয়ে আসবে!'

নতজানু হয়ে ডরথি মাথা নত করে, এবং জহ্লাদের খড়্গে তার মাথার মুকুট কেটে যায়। সহকারীরা তখন তা তুলে ধরে সবাইকে দেখায়। সবাই তখন নতজানু হয়ে অভিবাদন জানায়। ডরথি তার মাথার মুকুট কুড়িয়ে নিয়ে তা মাথায় দিয়ে দরজায় গিয়ে বসে।

ভোরসা বলে ওঠে: 'কি সুন্দর এদের অভিনয়—মনে হয় সারা সন্ধ্যা বসে বসে দেখি।'

দিদিমারও প্রশংসার অন্ত নেই। অভিনেতারা থলি ভর্তি ক'রে বাড়ির উঠানে এসে নামে, তারপর বাড়ির বাইরে গিয়েই ঝোলা খুলে দেখে কি কি পেয়েছে। খাবার জিনিস হলে সবাই সমান ক'রে ভাগ ক'রে নিতো—কিন্তু টাকা পয়সা হলে রাজা নিজে তার পকেটে পুরতো এই বলে, যে এ তারই প্রাপ্য,—কারণ দলের নেতা হিসাবে সব দায়িত্ব ও ব্যয় সে বহন করেছে। ভাগ-বাঁটোয়ারার পর সবাই চলতো শিকার-রক্ষকের বাড়ি। আগামী কয়েকদিন ধরে ছেলেমেয়েরা ডরথির অভিনয় আবৃত্তি করতো। মা ভেবে পেতেন না এতে ওদের এত আনন্দ কেন।

এক রবিবার সকালে প্রশেকদের বাড়ির উঠোনে এক স্লেজ্ এসে দাঁড়ায়। ষ্টানিচ্‌কি এসেছে প্রশেক পরিবারকে শহরে নিয়ে যেতে। সে দিনটি তাদের সঙ্গে কাটবে।

দিদিমা কিন্তু যেতে চান না। বলেন: 'আমি কি করবো গিয়ে? আমি বাড়ি থাকি।' ষ্টানিচ্‌কি ভাল মানুষ। তাদের হোটেল ছিল।

সেখানে সব রকমের লোকই আসতো—সৌখিন লোকও আসতো অনেক দূর দূর থেকে। দিদিমার ওখানে ভাল লাগবে না।

সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরে এসে গল্প করে, কি দেখেছে, কি শুনেছে, ভালমন্দ কি সব খেয়েছে এইসব। দিদিমাকে কিন্তু তারা ভুলে যায়নি। শ্রীমতী ষ্টানিচ্‌কি দিদিমার জন্য একখানি মস্ত কেক্ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জন্ বলে: 'বলতো দিদিমা, কাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের?'

'কাদের সঙ্গে?

'ফেরিওয়ালা ভ্লাখ্, যে আমাদের বাড়ি মিষ্টি ডুমুর নিয়ে আসে। তাকে একেবারে চেনাই যায় না। ফিট্‌ফাট্ রাজকুমারের মত পোশাক পরিচ্ছদ—তার উপর বুকে সোনার ঘড়ির চেন।'

'পয়সা থাকলে সবাই বাবুগিরি করতে পারে। তা ছাড়া তোরাও তো আটপৌরে পোশাকে বাইরে যাস নি। দশ জনের মধ্যে যেতে হলে সবাই সাধ্যমত ফিট্‌ফাট্ হয়ে যেতে চায়।'

'কিন্তু দিদিমা ও নিশ্চয়ই খুব বড়লোক।'

'তা আমি কি ক'রে জানবো। হয়তো বা হবে—ওর ব্যবসা ভাল।'

"স্রোভটাইড" উৎসবের শেষ দিন ছদ্মবেশীর দল দলবেঁধে রাস্তায় বের হয়। দলের প্রথমে 'স্রোভটাইড' নিজে। সারা গায়ে তার বিচালি ঢাকা—দেখলে মনে হয় যেন একটি ভালুক। যেখানেই সে যায় গৃহিণীরা তার গা থেকে একটা ক'রে বিচালি ছিঁড়ে নিয়ে যত্ন ক'রে রেখে দেয়। পরের বছর হাঁস যখন ডিমে তা দেবে, এই বিচালি সেখানে রেখে দিলে বাচ্ছাগুলি ভাল হবে।

'স্রোভ্‌টাইডের' পর শীতের সব আনন্দ উৎসবের শেষ। দিদিমা চরকায় স্থতো কাটতে কাটতে লেণ্ট্ স্তোত্র গান গেয়ে ওঠেন। ছেলেমেয়েরা এসে কাছে বসতেই তিনি তাদের যীশুর জীবনের গল্প

শোনান। লেন্ট্-এর প্রথম রবিবারটি তিনি দুঃখে উদযাপন করেন। ক্রমে দিন বড় হয়, সূর্যের তেজ বাড়ে। পাহাড়ের গায়ে বরফ গলতে থাকে। উঠোনে হাঁসমুরগী ছুটে বেড়ায়। পরস্পর দেখা হলেই সবাই ডিমে তা দেওয়ার কথা, বা শনের চাষের কথা আলোচনা করে। চাষীরা লাঙ্গল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঠিক্ঠাক করে। শিকার-রক্ষক পুরোনো বাড়ির বিপরীত দিকের বন থেকে যেই সোজা আসতে চাইতো সে পারতো না কারণ মাঝখানের নদীর উপরকার বরফ তখন ভাঙ্গতে শুরু হয়েছে। তা দেখে মিলার বলতো : 'যেন এক একখানি বরফের টুকরো আর একখানির কাছে বিদায় নিচ্ছে।'

রবিবার—প্রথমে 'কালো', 'সামাজিক', 'হাঁচি' এবং সবশেষে 'মৃত্যু' রবিবার। এদিন ছেলেরা বলতো : 'আজ আমরা মৃত্যু তাড়িয়ে দেবো!' আর মেয়েরা বলতো : 'এবার আমাদের গান গাইবার পালা।' [প্রতি উৎসবের পর ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে জানালায় জানালায় গান গেয়ে বেড়ায়। কিন্তু ঈস্টারে এ গান গাওয়ার অধিকার শুধু মেয়েদেরই।

আডেল্কা সারা সপ্তাহ ধরে ডিমের খোলা জমিয়ে রেখেছে। দিদিমা তার সঙ্গে কয়েকটি রঙিন ফিতে দিয়ে তাকে একখানি ছোট ছড়ি ক'রে দিয়েছেন—এর নাম 'গ্রীষ্ম'। মেয়েরা বসন্তের আনন্দোৎসবের আয়োজন করছে। বিকালে তারা মিলের প্রাঙ্গণে একত্র হয়ে 'মরণের' সাজ তৈরি করছে। চিক্কা কুডারনা একটি খড়ের মূর্তি গড়েছে, অন্য মেয়েরা তাতে পোশাক পরিয়ে দেয়। যত ভাল পোশাক হবে ততই কৃতিত্ব মেয়েদের। তারপর তারা মূর্তিটির হাত ধরে নিয়ে চলে এক শোভাযাত্রা সহকারে। নাচতে নাচতে মেয়েরা গায় :

'গ্রাম থেকে মৃত্যুকে আমরা নিয়ে চলেছি,
নবঋতু তুমি এসো, তুমি এসো···।'

গ্রামের লোকেরাও চলতো তাদের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ছেলেরা

এগিয়ে এসে করতো নানারকম ঠাট্টা আর কৌতুক। বাঁধের ধারে এসে সবাই মূর্তিটির পোশাক খুলে নিয়ে সেটিকে ফেলে দিত জলে। তারপর ছেলেমেয়েরা গেয়ে উঠতো :

'জলের স্রোতে মৃত্যু ভেসে চলেছে,
নতুন ঋতু আসছে, সাথে নিয়ে
ডিম আর ঈস্টারের আনন্দ।'

মেয়েরা গাইতো সেই সঙ্গে :

'ওগো গ্রীষ্ম! ওগো মধুর গ্রীষ্ম।
কোথায় তুমি আটকে গেছো?
বনের ঘন ছাওয়ায় বসে
হাত পা ধোব আমরা বনের ঝরণায়।
রাঙা গোলাপ আর নীল ভায়লেট্
ফুটবে না, ভগবানের শিশির না পেলে।'

তারপর ছেলেরা উঠতো গেয়ে :

'রোমের সেণ্ট্ পিটার—
আমাদের একটু ভাল মদ পাঠিয়ে দিয়ো।
তোমার সুনাম গেয়ে আমরা পান করবো
যতক্ষণ না বন আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।'

সকলের গান শুনতে শুনতে শ্রীমতী প্রাশেক তাদের বলে :

'এসো তোমরা। মদ আমার নেই—তবু যা কিছু আছে তাতে সবাই আনন্দ পাবে।'

গান গেয়ে গেয়ে সবাই তাদের বাড়ি আসে। তারপর সেখানেও চলে কিছুক্ষণ প্রাণখোলা আনন্দ। পাম্ রবিবারের সকালে বারুস্কা নদীর ধারে গিয়েছিলো উইলো কুড়াতে। মেয়েটি ভাবে : 'এইতো ফুল ফুটেছে—এরা হয়তো জানে যে এদের আমার দরকার।' সকালে

দিদিমার সঙ্গে প্রার্থনায় যাওয়ার সময় দুজনেই এক গোছা ক'রে ফুল নিয়ে যায় আশীর্বাদ করিয়ে আনতে।

'এ্যাস্' বুধবারে দিদিমা তাঁর সুতোকাটা শেষ ক'রে চরকাটি ঘরের চালে তুলে রাখেন। তাই দেখে আভেল্কা বলে: 'ওমা চরকা উপরে উঠে যাচ্ছে, দিদিমা এবার টেকো ব্যবহার করবে।'

দিদিমা জবাব দেন: 'যদি ভগবান করেন তো আবার পরের শীতে ওটি নামিয়ে আনবো।'

গুড্ ফ্রাইডের আগের দিন ছেলেমেয়েরা জানতো যে সকালে তাদের পুণ্য সপ্তাহে ভাজা বিস্কুট ও মধু ছাড়া আর কিছু খাবার মিলবে না। পুরোনো বাড়িতে মৌমাছি ছিল না, তবে শিকার-রক্ষক প্রতি বছর তাদের মধু পাঠিয়ে দিত। সে এবার বলেছে যে এক ঝাঁক মৌমাছিও তাদের দিয়ে যাবে। দিদিমা মৌমাছির চাক্ বড় পছন্দ করতেন। বলতেন: 'সারাদিন কর্মব্যস্ত মৌমাছিদের দেখে সব কিছুই যেন আনন্দময় হয়ে ওঠে।'

গুড্ ফ্রাইডের সকালে দিদিমা বারুস্কার কপালে টোকা দিয়ে বললেন: 'ওঠ বারুস্কা, এখনই সূর্য উঠবে।'

চোখ খুলে বারুস্কা দেখে দিদিমা তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। তখনই তার সকালের প্রার্থনার কথা মনে পড়ে। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সে তখনই পেটিকোট পরে, গায়ে একখানি শাল জড়িয়ে নিয়ে দিদিমার সঙ্গে পাহাড়ে যায়। ভোরসা ও বেট্সেও ঘুম থেকে উঠেছে তবে ছোটদের তখনও জাগানো হয়নি। দিদিমা বলতেন ওদের এখনও সব বোধ হয়নি। রান্নাঘরের দরজা খুলতেই হাঁসমুরগী ও আর সব জন্তুরা নড়ে চড়ে ওঠে। কুকুর দুটো ছুটে আসে তাদের ঘর থেকে। দিদিমা তাদের সরিয়ে দিয়ে বলেন: 'একটু ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রে থাক। আমি প্রার্থনা সেরে আসি।'

বারুষ্কা নদীর জলে মুখ ধুয়ে নিয়ে দিদিমার সঙ্গে যেত পাহাড়ের গা ধরে। সেখানে সে নয়টি 'পেটারনোটার' ও নয়টি 'আভামারিয়া'র প্রার্থনা করতো। ভগবান যেন সারা বছর তার দেহ নির্মল রাখেন। দিদিমা হাঁটু পেতে, হাত জোড় ক'রে সূর্যের দিকে চেয়ে একমনে প্রার্থনা করতেন। ফুলের কুঁড়িটির মত বারুষ্কাও তাঁর পাশে এসে নতজানু হয়ে বসতো। কিছুক্ষণ সেও প্রার্থনা করতো মন দিয়ে, কিন্তু তার পরই তার দৃষ্টি পূবের বন থেকে, মাঠ ও পাহাড়ের গাঁয়ের দিকে চলতো ছুটে। নদীর জলে তখনও বরফ ভেসে চলেছে, উপত্যকায় তখনও জায়গায় জায়গায় বরফ, তারই মধ্যে কোথায়ও কোথায়ও সবুজ ঘাসের ফালি। পাহাড়ের গায়ে অকালের ডেসী ফুল। গাছে গাছে, ঝোপে ঝোপে মুকুল উঠেছে ফুটে। সারা প্রকৃতি নতুন জীবনের আহ্বানে উঠেছে জেগে। আকাশে লাল মেঘ ছিটিয়ে রয়েছে—পাহাড়ের নীচ থেকে সূর্যের সোনালী আলো একটু একটু ক'রে উপরে উঠে, গাছের চূড়াগুলি রাঙিয়ে দিয়ে, অবশেষে রক্তিম গরিমায় আবির্ভূত হয়। পাহাড়ের গায়ে আলোর বন্যা বয়ে যায়। অপর দিকের পাহাড়ের গায়ে তখনও স্তিমিত আলো। বাঁধের ধারে কুয়াশা। পাহাড়ের উপরে মিলের স্ত্রীলোকেরা প্রার্থনায় বসেছে।

সুন্দর প্রকৃতির কোলে বসে বিমোহিত হয়ে বারুষ্কা বলে: 'দেখ, দেখ, দিদিমা কি সুন্দর সূর্য উঠছে। আমরা যদি এখন বরফ ঢাকা চূড়ায় উঠতে পারতাম!'

প্রার্থনা থেকে উঠে, দেহে ক্রুশ চিহ্ন ক'রে দিদিমা জবাব দেন: 'পৃথিবী ভগবানের, সব জায়গাই প্রার্থনার স্থান।'

পিছন ফিরে তারা দেখতে পায় পাহাড়ের উপর এক স্ত্রীমূর্ত্তি, গাছের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভিক্‌টোরকা। শিশিরে ভেজা তার আলুথালু মাথার চুল মুখের উপর এসে পড়েছে, এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে

সে প্রভাতী সূর্যের দিকে চেয়ে আছে। তার হাতে একটি প্রিমরোজ ফুল। কাউকে সে দেখতে পায়নি। দুঃখ ক'রে দিদিমা বলে ওঠেন : 'আহা বেচারী! কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

'ও প্রিমরোজ কোথায় পেল?' জিজ্ঞেস করে বারুস্কা।

'হয়তো পাহাড়ের চূড়ায় কোথায়ও। ওর তো কিছু অজানা নেই।' দিদিমা বলেন।

পাহাড়ের ওপর ছুটে ওঠতে ওঠতে বারুস্কা বলে : 'আমি ওর কাছে ফুলটি চেয়ে নিয়ে আসি।' ভিক্‌টোরকা যেন গভীর চিন্তা থেকে জেগে ওঠে। সে তখনই ছুটে পালাতে যায়। বারুস্কা তাকে ডেকে বলে : 'ভিকটোরকা তোমার ফুলটা আমায় দেবে!'

ভিক্‌টোরকা থেমে, অন্যদিকে চেয়ে, তাকে হাত বাড়িয়ে ফুলটি দিয়ে দেয়। তারপর আবার সে ছুটে পালায়। বারুস্কা ফুল নিয়ে দিদিমার কাছে নেমে আসে। দিদিমা বলেন :

'অনেক দিন তো ও খাবার নিতে আসেনি—'

বারুস্কা জবাব দেয় : 'না দিদিমা, কাল যখন তুমি গির্জায় গিয়েছিলে তখন মা ওকে রুটি দিয়েছে।'

'আহা বেচারী! গ্রীষ্ম এলে ওর ভালই হবে। কিন্তু ওর কি এখনও আর বোধশক্তি আছে। সারা শীতকালে ওর গায়ে এই পাতলা পোশাক, পায়ে জুতো নেই—বরফের ওপর ওর রক্তাক্ত পায়ের ছাপও দেখেছি। শিকার-রক্ষকের বৌ তো ওকে রোজই কিছু না কিছু গরম খাবার দিতে পারতো, কিন্তু রুটি ছাড়া ও কিছুই নেবে না। কি হতভাগিনী মেয়ে!'

'দিদিমা আমার মনে হয় ওর ঠাণ্ডা লাগে না। তাহ'লে ও অন্য কোথাও চলে যেত। কেন, আমরাও তো ওকে কতবার আমাদের বাড়িতে থাকতে বলেছি।'

'শিকার-রক্ষকের কাছে শুনেছি যে মাটির তলে যেখানে ও থাকে সেখানে খুব ঠাণ্ডা নয়। তাছাড়া ভিক্টোরকা কখনও আগুনে গরম করা ঘরে আসেনি, তাই ওর ঠাণ্ডা কমই লাগে। এই হলো ভগবানের বিধান। তিনি শিশুদের অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেবদূতদের পাঠিয়ে দেন। ভিক্টোরকাও এমনি এক অসহায় শিশু।'

দিদিমা বাড়ির পথে পা বাড়ান।

সাধারণতঃ প্রার্থনা ও সান্ধ্য খাবারের আগে গ্রামের গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি হতো। কিন্তু এদিন জন্ ও উইলি বাগানে ছুটে গিয়ে ঘণ্টা বাজাতে থাকে। সে শব্দ শুনে ভয়ে সব চড়ুই পাখি বাসা ছেড়ে উড়ে যায়। বিকালে দিদিমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামে গিয়েছিলেন, ফিরতি পথে মানচিস্কার মার সঙ্গে দেখা করতে যান। মিলারের স্ত্রী দিদিমাকে ভাঁড়ারে নিয়ে গিয়ে সব দেখায়। এক ঝুড়ি রঙিন ডিম রং করা হয়েছে ঈস্টারের গাইয়েদের উপহার দেবার জন্য, অনেক রকমারি কেক্, আর একটি ভেঁড়া রোস্টের জন্য একেবারে তৈরি। সবাইকে সে একটু একটু ক'রে কিছু খেতে দেয়, কিন্তু দিদিমাকে কিছু দিতে সাহস করে না। জানে যে দিদিমা এদিন কিছুই দাঁতে কাটেন না। মিলারের স্ত্রীও গুড্ফ্রাইডেতে উপোবাস করতো, তবে দিদিমার মত নির্জলা উপোস নয়। দিদিমা বলতেন: 'যার যা সাধ্য, আমি যদি উপোস করি তবে সব কদিনই করি।' তারপর তিনি সবকিছুর প্রশংসা ক'রে বলেন: 'আমরা কাল ভাজা শুরু করবো, সবকিছুই তৈরি হয়ে আছে। আজকের দিনটা প্রার্থনার জন্য।' এই ছিল প্রশেক-পরিবারের রীতি— কারণ দিদিমার কথাই ছিল সেখানে একমাত্র বিধি।

ঈস্টারের আগের শনিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরোনো বাড়িতে নেমে আসতে কর্মব্যস্ততা। বসবার ঘরে, রান্না ঘরে, উঠোনে এমনকি উনুনের পাশেও সবাই ব্যস্ত। বারুস্কাও এত কাজ করতো

এদিন যে তার মাথায় সব কিছু যেত ঘুলিয়ে। সন্ধ্যায় বাড়িখানি ঝক্‌ঝক্ করতো। দিদিমা বারুষ্কা ও তার মাকে সঙ্গে ক'রে গির্জায় যেতেন। ধর্মপ্রাণ লোকের কণ্ঠ থেকে গির্জায় স্তোত্র ভেসে আসতো :

'এই দিন আমাদের ত্রাণকর্তার আবির্ভাব।'

বারুষ্কা অভিভূত হয়ে পড়তো—তার বুক উঠতো ফুলে ফুলে। তার মনের অব্যক্ত অনুভূতি প্রকাশের জন্য তাকে বাইরে উন্মুক্ত বাতাসে ছুটে আসতে হতো। সারাটি সন্ধ্যা এক শান্ত নির্মল আনন্দে তার মন ছেয়ে উঠতো। দিদিমা যেই রাতে তাকে 'শুভরাত্রি' জানাতে আসতেন অমনি সে তাঁর গলা ধরে কেঁদে উঠতো।

'কি হয়েছে তোর ?' জিজ্ঞেস করতেন দিদিমা।

'কিছু না দিদিমা। আমার শুধু এত ভাল লাগছে,' বলতো বারুষ্কা। দিদিমা ঝুঁকে তার কপালে চুমো দিয়ে একটি কথাও বলতেন না। মনে মনে তিনি আশীর্বাদ করতেন বারুষ্কাকে।

ঈস্টারের রবিবারে দিদিমা একখানি কেক্, ক'টি ডিম আর কিছু মদ গির্জায় নিয়ে যেতেন আশীর্বাদ করিয়ে আনতে। ফিরে এসে সবাইকে কেক্ কেটে এক এক টুকরো ক'রে দিতেন, আর সেই সঙ্গে একটু মদ। এমনকি হাঁস-মুরগী ও গৃহপালিত পশুরা বড়দিনের মত তাদের খাবারের বাড়তি ভাগ থেকে বঞ্চিত হতো না। এতে ক'রে তারা বাড়ির প্রতি অনুরক্ত হয়ে প্রতিদান দিত।

ঈস্টারের সোমবার ছিল মেয়েদের কাছে বড় কষ্টকর। সেদিন সবাই আসবে গাইতে, হাতে থাকবে তাদের উইলোর কঞ্চি।

সকালে প্রশেকের বাড়িতে সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগেই বাইরে শোনা গেল এক কণ্ঠস্বর : 'আমি এক ছোট্ট গাইয়ে।' বেট্‌সে দরজা খুলেই ভয় পেয়ে যায়, বোধ হয় ছেলেরা কেউ এসেছে তাকে চাবুক মারতে।

কিন্তু দেখে মিলার এসেছে সবার আগে চুপি চুপি। সবাইকে প্রথানুযায়ী ঈস্টারের অভিনন্দন জানিয়ে মিলার হঠাৎ তার ছোট কঞ্চিখানি বের ক'রে ঘুরাতে থাকে। কাউকেই রেহাই দেয় না সে—শ্রীমতী প্রশেক, আডেল্‌কা এমনকি দিদিমাকে পর্যন্ত। সবাইকে তাদের ঘাগরার উপর দু' এক ঘা বসিয়ে দিয়ে বলে: 'আর পোকায় কামড়াবে না।' অন্যান্য গাইয়েদের মত মিলারও ঈস্টারের ডিম ও আপেল পায়। সে ছেলেদের জিজ্ঞেস করে: 'আজ সকালে তোমাদের কর্তব্য পালন করেছো তো?'

বারুক্কা অভিযোগ করে: 'অন্যদিন সবাই ঘুম থেকে ওঠে না, আর আজ যেই আমি উঠে বসেছি, সবাই এসে আমায় চাবুক মারছে—' ছেলেরা ও মিলার তার কথা শুনে হাসে।

শিকার রক্ষক, মিলো, টমেস্ সবাই আসে প্রথামত মেয়েদের চাবুক মারতে। সেদিন তাদের আর বিরাম নেই। শেষ পর্যন্ত নতুন কাউকে আসতে দেখলেই মেয়েরা এপ্রন্ দিয়ে তাদের কাঁধ ঢাকে।

বার

বসন্তকাল এগিয়ে আসছে। সবাই মাঠের কাজে লেগে গেছে। পাহাড়ের গায়ে গিরগিটি, সাপ রোদ পোহায়। ছেলেমেয়েরা ভায়লেট্ ও লিলিফুল কুড়াতে গিয়ে তাদের দেখে ভয় পায়। দিদিমা বলতেন ভয় নেই এখন, সেণ্ট্ জর্জের আগে এদের বিষ থাকে না। বাঁধ পেরিয়ে মাঠে ডেইজী ও লার্কস্পার ফুল ফুটেছে আর পাহাড়ের গায়ে সোনালী প্রিমরোজ। ছেলেরা স্যুপের জন্য কচি পাতা তুলে নিয়ে আসে আর বাড়িতে হাঁসের বাচ্চাদের জন্য তুলে নেয় বিছুটি গাছ। গাছে গাছে সবুজ পাতা ভরে ওঠে, বাতাসে মশার গুন্‌গুনানি, আকাশে চাতক পাখি পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। ছেলেমেয়েরা তাদের

গান শুনতে পায়, তবে দেখতে পায় না তাদের। কোকিলেরও গান শুনতে পায় তারা বনের মধ্যে—চিৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করে: 'কোকিল কোকিল, বলতো কত বছর বাঁচবো আমরা?' কখনও বা কোকিল কু-উ-উ ক'রে জবাব দেয়, কখনও বা চুপ ক'রে থাকে। তাই দেখে আডেল্‌কা বলে—ওরা ভারী হিংসুক। ছেলেরা আডেল্‌কাকে উইলো গাছের বাঁশী তৈরি করতে শিখিয়ে দেয়—তার বাঁশী না বাজালেই তারা বলতো: 'তুই ঠিক মত করতে পারিস না।'

জন্ হেসে বলতো: 'মেয়েরা বাঁশী তৈরি করতে পারে না।'

'সে আমাদের ব্যাপার, তোরা এমনি টুপি তৈরি করতে পারিস?' বারুস্কা তার ভাইকে এল্‌ডার গাছের পাতা ও ডেইজী ফুলের তৈরি একটি টুপি তুলে দেখিয়ে বলে।

মাথা নেড়ে জন্ জবাব দেয়: 'ওঃ, ভারী তো!' বারুস্কা এল্‌ডার গাছের আঁটা দিয়ে একটা পুতুল গড়তে গড়তে বলে: 'আমার কাছে কিছু নয়, তবে তোর কাছে ভারী কঠিন!'

জন্ ছোট একটি ডাল তার হাঁটুর উপর রেখে আডেলকাকে বলে: 'দেখ আমি কেমন ক'রে তৈরি করি।' তারপর ছুরিখানি দিয়ে গাছের ডালটির উপর আঘাত ক'রে সে আবৃত্তি করে:

'শোন! শোন! শোন!
তাড়াতাড়ি তোর বাকল্ খুলে ফেল,
যদি বাকল্ না খুলে ফেলিস্
তা হলে কিন্তু ভাল হবে না।
আমাদের রাজকুমার আসবে এখনই,
এমনি ঘুঁষি দেবে বলিয়ে
যে তোকে পাঠিয়ে দেবে
চাঁদের দেশে।

কাট! কাট! কাট!
এই ছিলি তুই একখানি ছড়ি,
আমার ছুরি দিয়ে
তোকে দেবো নতুন জীবন,
'মিষ্টি মধুর নতুন জীবন,
আমার কথায় তুই
পাখির মত গান গেয়ে উঠবি
বনের ছোট পাখির মত।

বাকল ছিঁড়ে বাঁশী তৈরি হয়। জন্ বাজাতেই তা বেজে ওঠে। উইলি বলে যে, এ বাঁশী কিন্তু ওয়েনছেল্ যে বাঁশী বাজিয়ে গরু চরায় তার মত ভাল হয়নি।

বারুস্কা তার বোনকে পুতুলটি দিয়ে বলে: 'এই নে তুই। তবে তোকে নিজে নিজে বানাতে শিখতে হবে। আমরা সবাই স্কুলে গেলে তুই একা একা করবি কি?'

ছোট মেয়েটি জবাব দেয়: 'দিদিমা তো থাকবে।' তার মুখের ভাব দেখে মনে হয় যে, একা একা তার ভাল লাগবে না, তবু দিদিমা থাকলে তার কোন অভাবই হবে না।

এমনি সময় মিলার এসে বারুস্কাকে একখানি চিঠি দিয়ে বলে: 'তোমার মাকে এই চিঠিখানি দিয়ো। আমার একজন লোক শহরে গিয়েছিলো, পোস্টমাস্টার তাকে দিয়েছে।'

ছেলেমেয়েরা চিঠিখানি নিয়ে বাড়ি ছুটে যায়—'বাবার চিঠি'। চিঠি পড়তে পড়তে শ্রীমতী প্রশেকের মুখে আনন্দ ফুটে ওঠে। চিঠি পড়ে ছেলেমেয়েদের বলে যে তাদের বাবা মে মাসের মাঝামাঝি ফিরে আসবে—রাজকুমারীও আসবেন।

আন্ডেল্‌কা জিজ্ঞেস করে: 'বাবা আসবার আগে আর কতদিন ঘুমুবো আমরা ?'

'চল্লিশ দিন,' বারুস্কা জবাব দেয়।

ছোট মেয়েটি হতাশ হয়ে বলে: 'এতদিন !'

উইলি বলে: 'জানো আমি কি করবো ? দরজায় খড়ি দিয়ে চল্লিশটি দাগ দিয়ে রেখে, রোজ সকালে উঠে একটি ক'রে দাগ মুছে দেব।'

মা উৎসাহ দিয়ে বলে: 'বাঃ বেশ বেশ, তাহলে তাড়াতাড়ি দিন কেটে যাবে !'

বাঁধ থেকে যেতে যেতে মিলার প্রশেকদের বাড়ি আসে। প্রশান্ত মুখখানিতে তার সদা কপট হাসির আভাসমাত্র নেই। হাতের নস্যির কৌটাটি অভ্যাস মত না ঘুরিয়ে তাতে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে সে বলে: 'জানেন কি ব্যাপার ?'

মিলারকে তার স্বাভাবিক ভাবে না দেখে শ্রীমতী প্রশেক ও দিদিমা এক সঙ্গে জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে: 'কি হয়েছে ?'

'পাহাড়ে ঢল নেমেছে।'

দিদিমা ভয় পেয়ে বলেন: 'খুব বড় ঢল নিশ্চয়ই নয় বা আকস্মিকও নয়।'

মিলার বলে: 'ভয়ের কিছু নেই। কদিন ধরে দক্ষিণের হাওয়া দিয়েছে, পাহাড়ে বৃষ্টিও হয়েছে খুব। চাষীরা বলছে নদী ভরে উঠেছে, আর বরফও গলছে তাড়াতাড়ি। এ লক্ষণ শুভ নয়। আমি এখনই বাড়ি গিয়ে দেখি কি করা যায়। আপনারাও সাবধানে থাকুন। আবার বিকেলে আসবো আমি—দেখি জল কতদূর ওঠে। আর তোমরা,' আন্ডেল্‌কার গাল টিপে মিলার বলে: 'জলের ধারে যেও না।'

দিদিমা গিয়ে বাঁধের জল দেখে আসেন। দু'পারে ওক্‌গাছের ঢিবি

দিয়ে তীর বাঁধা—ঢিবির মাঝে মাঝে চারাগাছ গজিয়ে উঠেছে। ছোট ছোট চারাগাছগুলি জলে ডুবে গেছে। কর্দমাক্ত জলের স্রোতে ছোট ছোট কাঠের টুকরো, গাছের ডাল ভেসে চলেছে। দুঃশ্চিন্তায় তিনি বাড়ির দিকে তাকান। বরফ যখন ভাঙে কখনও কখনও তা বাঁধে এসে আটকে যায়, আর তখন জলের স্রোত এসে ঘরবাড়ি ডুবিয়ে দেয়। এ সময়টি ছিল মিলারের বড় দুর্ভাবনার সময়। তার লোকেরা সবসময়েই হুঁশিয়ার থেকে জলে-ভাসা বরফের চাই ভেঙে দিত। কিন্তু তাতেও পাহাড়ের ঢল্ রোধ করা যেত না। দুর্বার গতিতে পাহাড়ের গা বেয়ে যা কিছু সব ভাসিয়ে নিয়ে চলতো জলস্রোত। বাঁধের দুধারে ওক্‌গাছের বাঁধ ভেঙে ঘরবাড়ি সব জলে ডুবে যেত। এমনি আকস্মিকভাবে আসতো বন্যা যে সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তো। দিদিমার জীবনে একবার এ অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। তাই বাড়ি এসেই তিনি বললেন যে আসবাবপত্র সব ঘরের চালে তুলে ফেলতে।

ইতিমধ্যে শিকার-রক্ষকও এসেছে। করাতকল ছাড়িয়ে বনে যেতে যেতে সেও ঢল্ নামার শব্দ শুনতে পেয়েছে আর নদীতে জলবৃদ্ধি দেখেছে।

'যদি কিছু হয় তাহলে ছেমেমেয়েদের নিয়ে আপনারা বিপদে পড়বেন। আমি ওদের আমার সঙ্গে পাহড়ের ওপর নিয়ে যাই।' শ্রীমতী প্রশেক এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। সব কিছু সরিয়ে রাখা হলো। হাঁসমুরগীও পাঠিয়ে দেওয়া হলো পাহাড়ের ওপর।

দিদিমা তাঁর মেয়ে ও বেট্টসেকে বললেন: 'তোমরা দুজনে যাও শিকার-রক্ষকের বৌয়ের কাছে—বেচারীকে যেন সবকিছু একলা না করতে হয়। আমি আর ভোরসা থাকবো বাড়িতে। যদি বন্যা আসে, আমরা চালে উঠবো, আর মনে হয় না এমন বন্যা আসবে যে

বাড়ি ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এখানে তো মিলের মত নিচু নয়—কিন্তু ও-বেচারীদের বড় মুস্কিল হবে।

শ্রীমতী প্রশেক কিছুতেই মাকে বাড়িতে থাকতে দেবে না। কিন্তু বৃদ্ধা যখন কিছুতেই রাজী হন না, তখন সে মাকে রেখে চলে যায়। যেতে যেতে বলে :

'কুকুরগুলিকে যেতে দিও না।'

'ওদের জন্য চিন্তা করিসনে। ওরা আমাদের ছেড়ে যাবে না।' সত্যিই স্থলতান্ ও টাইরল্ সব সময়ই দিদিমার কাছে কাছে থাকে। দিদিমা যখন টেকো নিয়ে জানালার ধারে বসলেন—সেখান থেকে নদী ভাল ভাবে দেখা যায়, কুকুর দুটিও এসে বসলো তাঁর পায়ের কাছে। ভোরসার অভ্যাস সব সময়েই কিছু না কিছু করার। সে শূন্য গোয়ালটি পরিষ্কার করতে বসে—এ চিন্তা তার মনেও আসে না যে কয়েক ঘণ্টাতেই তা জলকাদায় ভরে যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। জল বেড়ে বেড়ে জল প্রবেশ-নিকেষ পথের কানায় কানায় এসে দাঁড়ায়। বাঁধের ধারের মাঠ জলে ডুবে গেছে। যে দিকে উইলোগাছে দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না, সে দিকে চাইলেই জলের ঢেউ দেখা যায়। দিদিমা টেকো নামিয়ে রেখে দু'হাত জুড়ে প্রার্থনায় বসেন।

ভোরসা ঘরে এসে জানালার ধারে একখানি বেঞ্চি মুছতে মুছতে বলে : 'বান আসছে। সব জীবজন্তুই পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে—তারাও যেন সব বুঝতে পারে। একটি চড়ুই পাখিরও দেখা নেই।'

সদর রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা যায়। একজন জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে প্রত্যেক বাড়িতে এসে বলে যাচ্ছে : 'বান আসছে—তোমরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাও।'

'ভগবান আমাদের রক্ষা করবেন,' দিদিমা বিবর্ণ হয়েও ভোরসাকে সাহস দেন। তারপর তিনি দেখতে যান জল কতদূর উঠেছে। দেখেন

মিলার হাঁটু পর্যন্ত বুট্ পরে জলের উচ্চতা পরীক্ষা করছে। সে বলে যে জল এবার বাঁধ উপচিয়ে পড়েছে।

মিলো ও কুন্ডারনা আসে দিদিমাকে সাহায্য করতে। তারা দিদিমার সঙ্গে থাকতে চায়। দিদিমা কুন্ডারনাকে পাঠিয়ে দেন এই বলে: 'তোমার বাড়িতে ছেলেমেয়েরা রয়েছে। যদি কিছু অঘটন হয় তাহলে আপসোসের সীমা থাকবে না। যদি কাউকে আমার সঙ্গে থাকতেই হয়, তাহলে মিলোই থাক। সরাইখানায় ওব যাবার দরকার নেই—ওখানে কারও ভয় নেই।'

মাঝ রাতে বাড়ির চাবদিকে জল এসে যায়। ছেবনভ্ পাহাড়ে লোকে লণ্ঠন হাতে ঘুরে বেড়ায়। শিকাব-রক্ষকও বাড়ির কাছে পাহাড়ের ওপর এসে শিস দিয়ে ডাকে। মিলো তার জবাব দিয়ে বলে সবাই ভাল আছে। শ্রীমতী প্রশেক যেন তাব মার জন্য চিন্তা না করেন। তাই শুনে শিকাব-বক্ষক চলে যায়। পরের দিন সকাসে সারা সমতল ভূমি এক বিস্তীর্ণ জলবাশিতে পরিণত হয়ে গেল। একতলায় সবাইকে সাবধানে কাঠের তক্তার উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। সকালবেলা সবাই শিকাব-রক্ষকেব বাড়ি থেকে নেমে পুরোনো বাড়ির অবস্থা দেখতে আসে। ছেলেমেয়েরা চেয়ে দেখে যে তাদের বাড়িটি হ্রদের জলের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। দিদিমা তক্তার উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। তাই দেখে তারা কাঁদতে শুরু করে, কিছুতেই থামে না। কুকুর দু'টিও জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে। জন্ তাদের ডাকতেই তারা হাউ হাউ ক'রে ওঠে। মিলো তাদের ধরে না বাখলে তারা হয়তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

কুন্ডারনা এসে বন্যায় কি ক্ষতি হয়েছে সেই গল্প করে। দু'টি বাড়ি ভেসে গেছে—একটি বাড়িতে এক বুড়ী বিপদ অগ্রাহ্য ক'রে বসে ছিল—শেষ পর্যন্ত দেরী হয়ে গেল। সাঁকো, বড় বড় গাছ—সব

ভেসে গেছে। মিলে সবাই উপর তলার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ক্রিষ্টিনাও প্রশেকদের বাড়ি আসে—ভাবে তাদের জন্য গরম কিছু খাবার নিয়ে আসা যায় কিনা। কিন্তু সে-ভাবনা তাকে আর করতে হয় না। মিলো যখন তাকে দেখে সাহস করে জল পেরিয়ে আসতে চায়, ক্রিষ্টিনা তাকে আসতে বারণ করে।

দু'দিন এ দুর্যোগ চলে। তারপর আস্তে আস্তে জল সরে যায়। ছেলেমেয়েরা বাড়ি এসে আশ্চর্য হয়ে যায়। বাগান ভেসে গেছে, ফলের বাগানে জঞ্জাল এসে জমেছে, উইলো ও এল্ডার গাছগুলি কাদায় অর্ধেক ঢেকে গেছে। টানা পুলটি ভেসে গিয়েছে, হাস-মুরগীর ঘরের তলে বড় বড় গর্ত হয়েছে, আর কুকুরের ঘরটির কোন চিহ্নই নেই।

ছেলেদের সঙ্গে আডেল্কা বাড়ির পিছনে দেখতে যায়, সেখানে তারা বন থেকে কয়েকটি গাছ নিয়ে এসেছিলো—দিদিমা তাদের জন্য পুঁতে দিয়েছিলেন—মেয়েদের জন্য বার্চ গাছ ও ছেলেদের জন্য ফার্। সেগুলি একেবারে অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে। পিয়ার গাছের তলে তারা একটি ছোট কুঁড়েঘর করেছিলো, তার চারপাশে বাগান—বেড়া ও একটি পরিখা। এই পরিখায় একটি মিল স্থাপন করেছিল তারা—বৃষ্টির জলে পরিখা ভরে গেলেই সেটি ঘুরতো। তাছাড়া ছিল একটি উনুন—সেখানে আডেল্কা তার কাদার তৈরি খেলার বান ও কোলাচ্ ভাজতো।

এই ঘরকন্নার কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। ছেলেমেয়েদের দুঃখ দেখে দিদিমা হেসে বলেন: 'বোকা কোথাকার! দুর্বার জলস্রোত, যা এত ঘরবাড়ি, বড় বড় গাছ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে—তার সামনে তোদের খেলাঘর রক্ষা পাবে কি ক'রে?'

কয়েক দিনেই রোদের উত্তাপে মাঠ-ঘাট রাস্তা শুকিয়ে উঠলো—বাতাসে জঞ্জাল উড়ে গেল। ঘাস সবুজ হয়ে উঠলো। বন্যায় যতকিছু ক্ষতি হয়েছিল সবকিছুর মেরামত হয়ে গেল—কোন চিহ্নই রইল না। তবে লোকে অনেকদিন পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর বন্যার কথা বলাবলি করল। বাবুই পাখিরা আবার ফিরে এসেছে—ছেলেরা তাদের দেখে আনন্দ করে—বেয়ারও এবার আসবে আর তারপরই আসবে তাদের বাবা।

সেণ্ট ফিলিপ্ ও সেণ্ট জেমস্ দিনের সন্ধ্যা। মে-দিবসের সন্ধ্যা। দিদিমা একটুকরো খড়িমাটি নিয়ে ঘরের দরজা, গোয়াল—সবকিছুর উপর তিনটি ক'রে ক্রুশ এঁকে দেন যেন ডাইনী না আসতে পারে। খড়িমাটিটি তিন রাজার দিনের উৎসবে আশীর্বাদ করানো। [তিনটি রাজার দিনের উৎসবে তিন জন জ্ঞানী ব্যক্তি বেথলেহেম্-এ যীশুর জন্মের পরে এসেছিলেন।] তারপর চললেন তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দুর্গের কাছে পাহাড়ের উপর। ছেলেদের কাঁধে একটি ঝাঁটা। ক্রিষ্টিনা ও মিলো আগেই সেখানে এসে গেছে—আরও এসেছে ছেলেরা। ওয়েনছেল্, কুডারনা তার ভাইয়ের সঙ্গে জ্যাকবকে সাহায্য করছে ঝাঁটায় আলকাতরা মাখাতে—আর সবাই কাঠ সাজিয়ে রাখছে উৎসবের আগুন জ্বালার জন্য।

সে এক সুন্দর রাত। মৃদুমন্দ বাতাস ফসলের মাথায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সারা পাহাড় ফুলের ও ফলের গন্ধে ভরপুর। বনে পেঁচার ডাক, রাস্তার পারে লম্বা পপলার গাছে এক দল পাখি কিচিরমিচির করছে—বাগান থেকে বুলবুলির গান আসছে ভেসে। হঠাৎ পাহাড়ে একটি আগুনের শিখা দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাহাড়েও জ্বলে ওঠে একসঙ্গে কয়েকটি শিখা। দূরে পাহাড়েও উৎসবের আগুন দেখা যায়—আগুনের শিখা নেচে নেচে ওঠে। মিলো আলকাতরা মাখা ঝাঁটায় আগুন দিয়ে শুকনো পাতা আর কাঠের গাদায় ছুড়ে দেয়—সব একসঙ্গে

জলে ওঠে। অন্যান্য ছেলেরাও তাদের ঝাঁটায় আগুন দিয়ে চিৎকার ক'রে, উপরে ছুড়ে দেয় : 'যা ডাইনী উড়ে যা—' তারপর শুরু হয় দল বেঁধে তাদের উদ্দাম নাচ। মেয়েরাও দলবেঁধে গান গেয়ে নাচে আগুনের চারধারে। আগুনের চিবিটা যেই জলে জলে মাটিতে পড়ে যায়, সবাই তা ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে—একে অন্যকে হার মানিয়ে দিয়ে।

মিলো বলে : 'দেখ, এই বুড়ী ডাইনী অনেক দূরে উড়ে যাবে,' তাই বলে সে একটি জলন্ত ঝাঁটা নিয়ে এত দূরে ছুড়ে দেয় যে তা গিয়ে পড়ে সবাই যেখানে দাঁড়িয়ে উৎসব দেখছিলো তাদের কাছে।

'দেখ, দেখ, ডাইনী কেমন থুতু ফেলছে,' ছেলেরা বার্চ গাছের ছোট ডাল দিয়ে তৈরি জলন্ত ঝাঁটার পিছে ছুটে যেত। সারা পাহাড় নাচে গানে মুখরিত হয়ে উঠতো। লাল আগুনের আলোতে ছেলে-মেয়েদের মূর্তিগুলি দেখে মনে হতো এ যেন এক স্বপ্নরাজ্য। মাঝে মাঝে এক একটি জলন্ত ঝাঁটা আসতো উড়ে—তা থেকে শত শত স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে পড়তো এসে মাটিতে।

ছেরনভ্ পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে মানচিস্কা বলে ওঠে : 'দেখ, দেখ, কত উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে!' একজন স্ত্রীলোক তার হাত টেনে নামিয়ে দিয়ে বলে : 'আঙুল দিয়ে কি দেখাতে আছে? তাহলে ঐ জলন্ত স্ফুলিঙ্গ তোমার আঙুল পুড়িয়ে দেবে।

দিদিমা যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফিরে এলেন তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। বাগানের মধ্যে থেমে পড়ে বারুস্কা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে : 'দিদিমা কিসের যেন শব্দ, শুনতে পারছো না? কি যেন খস্ খস্ করছে।'

দিদিমা জবাব দেন : 'ও কিচ্ছু না, গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ। বাতাস বড় উপকারী।'

'কেন দিদিমা ?'

'কেন ? বাতাস গাছগুলিকে পরস্পর পরস্পরের উপর হেলিয়ে দেয়। আর কথায় বলে, গাছগুলি যখন পরস্পর আলিঙ্গন ও চুম্বন করে সে বছর খুব ভাল ফল হয়।'

জন্ দুঃখ ক'রে বলে : 'দিদিমা এখন চেরী হবে ষ্ট্রবেরী পাওয়া যাবে, আর আমরা কিনা সারাদিন স্কুলে বসে থাকবো—!'

'তা আর উপায় কি ? তোরা তো আর চিরদিন বাড়ি বসে খেলা করবি না। এবার থেকে তোদের আসবে নতুন কাজ, আর নতুন আনন্দ।'

বারুস্কা বলে : 'স্কুলে যেতে আমার খুব ভাল লাগবে। তবে দিদিমা, সারাদিন তোমায় না দেখে বড় একা একা মনে হবে।'

'তোদের না দেখে আমারও বড় একা মনে হবে। তবে উপায় নেই। গাছে নতুন পাতা আসে—ছোটরাও বড় হয়ে ওঠে। গাছে ফল পেকে মাটিতে পড়ে যায়—ছোটরাও বড় হয়ে বাড়ি ছেড়ে বাইরে যায়। এ হলো বিধান। গাছ যতদিন বেঁচে থাকে তাতে ফল আসে, মরে গেলে তা কেটে জ্বালানী হয়—তারপর ছাই মাটিকে উর্বর করে, আবার সেখানে নতুন গাছ গজিয়ে ওঠে। এমনি ভাবে তোদের দিদিমার দিনও একদিন ফুরিয়ে আসবে—' দিদিমার স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে।

বাগানে ঝোপের মাঝে বসে বুলবুলি গান গাইছে। ছেলেদের ধারণা এ তাদের বুলবুলি, প্রতি বছর বসন্তে এসে বাগানে বাসা বাঁধে। বাঁধ থেকে ভিক্‌টোরকার ঘুমপাড়ানীয়া গানের করুণ সুর ভেসে আসছে। ছেলেমেয়েরা বাড়ির বাইরে থাকতে চায় আরও কিছুক্ষণ। দিদিমা বলেন : 'কাল যে তোদের স্কুল আরম্ভ হবে। তোদের সকাল সকাল উঠতে হবে ঘুম থেকে। আয়, তাড়াতাড়ি বাড়ি আয়, তা না হলে তোদের মা রাগ করবে।' তিনি ছেলেমেয়েদের টেনে বাড়ি নিয়ে আসেন।

সকালবেলা শ্রীমতী প্রশেক ছেলেমেয়েদের খাবার গ্রহণের সময় কিছু উপদেশ দেয়। আভেল্‌কা শুধু তখনও ঘুমিয়ে। কি ভাবে স্কুলে ব্যবহার করতে হয়, স্কুলের পথে কি ভাবে চলতে হবে, কি ভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হয়। মায়ের গম্ভীর উপদেশ শুনে ছেলে-মেয়েরা প্রায় কেঁদে ফেলে।

দিদিমা তাদের দুপুরের খাবার তৈরি ক'রে দেন। টেবিলের উপর তিন ফালি রুটি কেটে দিয়ে তিনি বলেন: 'এই নে, তোদের প্রত্যেকের ভাগ। আর এই তোদের প্রত্যেকের ছুরি—তোদের জন্য এতদিন রেখেছিলাম। জানি, তোকে ছুরিখানি আগে দিলে তুই ঠিক হারিয়ে ফেলতি। তাই না? তাহলে এখন রুটি কাটতি কি ক'রে?' তারপর তিনি প্রত্যেকখানি রুটির টুকরো দুভাগ ক'রে কেটে একখানিতে মাখন মাখিয়ে আর-একখানি দিয়ে তা ঢেকে দিয়ে, একভাগ বারুস্কার ব্যাগে, আর দুভাগ দুছেলের চামড়ার ব্যাগে দিয়ে দেন। রুটির সঙ্গে তিনি কিছু শুকনো ফলও দেন। সকালের খাবারের পর ছেলেমেয়েরা যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। মা দরজায় দাঁড়িয়ে বলে: 'ভগবানের নাম ক'রে এবার যাত্রা করো। যা বলে দিলাম মনে রেখো।' তারা মায় হাতে চুমো খেয়ে যাত্রা করে। চোখে জল এসে গেছে তাদের।

দিদিমা বাগান পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সঙ্গে যান। সুলতান্ ও টাইরল্ কুকুর দুটোও সঙ্গ ছাড়ে না। দিদিমা মনে করিয়ে দেন: 'বারুস্কা তোদের মধ্যে বড়, তার কথা তোরা শুনে চলবি। পথে দুষ্টুমি করবি না। স্কুলে মন দিয়ে পড়াশুনা করবি। সময় নষ্ট করলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হবে। সকলের সঙ্গে বেশ নম্র ব্যবহার করবি। আর উইলি, পথে কুকুর দেখলেই যেন আদর করতে যাস না আবার। জনি, তোর খাবার যেন সবার আগে খেয়ে ফেলিস না। তাহলে সবাই

যখন খাবে তখন তুই তাকিয়ে থাকবি। এবার তোরা যাত্রা কর। চারটের সময় আমি আন্ডেল্‌কাকে নিয়ে তোদের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

জন্‌ অনুনয় ক'রে বলে : 'দিদিমা, আমাদের জন্য খাবার কিছু রেখে দিতে ভুলে যেয়ো না কিন্তু।'

'বোকা কোথাকার! তাই কখনও ভুলতে পারি?' দিদিমা প্রত্যেকের গায়ে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেন। তারা রওনা হয়। তখন আবার কি যেন দিদিমার মনে আসে : 'পথে ঝড় এলে ভয় করিস না—মনে মনে ভগবানের প্রার্থনা ক'রে পথে হাঁটবি। গাছের তলে কিছুতেই দাঁড়াস না—গাছের ওপরই বাজ পড়বার সম্ভাবনা। মনে থাকে যেন।'

'হাঁ, দিদিমা। বাবার কাছেও একথা শুনেছি—'

'এবার এসো। মাষ্টার মশাইকে আমার নমস্কার জানিয়ো।'

দিদিমা তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ান। ছেলেমেয়েরা যেন তাঁর চোখের জল দেখতে না পায়। কুকুর দুটোও ছেলেমেয়েদের পিছু নেয়—ভাবে ওরা বেড়াতে চলেছে। জন্‌ তাদের ফিরিয়ে দেয়। দিদিমা তাদের ডাক দিতেই তারা ফিরে আসে—তবু বারবার তারা পিছু চায়—ভাবে কেউ তাদের ডাকবে। দিদিমাও বারবার পিছু চেয়ে দেখেন। তারপর তারা সাঁকোর কাছে যেখানে মান্‌চিকা তাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে, সেখানে এসে গেলে দিদিমা বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়িতে সারাটি দিন তিনি মনমরা হয়ে থাকেন—চলে ফিরে, কি যেন খুঁজে বেড়ান। ঘড়িতে চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে টেকো হাতে নিয়ে আন্ডেলকাকে বলেন : 'চ—, আমাদের পড়ুয়াদের দেখে আসি। আমরা ঝিলে ওদের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবো।' বেরিয়ে পড়েন দিদিমা।

লিনডেন্‌ গাছের তলে মূর্তিটির পাশে মিলার, তার স্ত্রী ও কয়েকজন চাষী যারা ফসল ভাঙাতে এসেছে, বসে আছে। দিদিমাকে দেখে

মিলারের স্ত্রী দূর থেকে বলে ওঠে : 'ছেলেমেয়েদের দেখতে এসেছেন, তাই না? আমিও মান্‌চিকার জন্য বসে আছি। আসুন, আসুন।'

বসতে বসতে দিদিমা জিজ্ঞেস করেন : 'খবর কি?'

একজন চাষী বলে : 'আপনি আসার আগে আমরা সৈন্যদলে বাধ্যতামূলক আইনে ভর্তির কথা আলোচনা করছিলাম। পরের সপ্তাহ থেকে ভর্তি শুরু হবে।'

'ভগবান আমাদের ছেলেদের রক্ষা করুন—' দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

'তাদের রক্ষা করতেই হবে। তা নাহলে বড় দুঃখের কথা। মিলোরও মন ভেঙে গেছে,' মিলারের স্ত্রী বলে।

স্বভাবজনিত কৌতুক বশে অর্ধনিমেলিত চোখে মিলার বলে : 'মানুষ যখন অত্যধিক প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে, এই হয় তখন তার পরিণতি —মিলোর যদি সে-অবস্থা না হতো, তাহলে তাকে সৈন্যদলে যেতে হতো না। এক দিকে লুসির দানবীয় ঈর্ষা আর একদিকে কর্মাধ্যক্ষের মেয়ের বিদ্বেষ। এই দুয়ের মাঝে পড়ে বেচারার এই অবস্থা।'

দিদিমা জিজ্ঞেস করেন : 'কিন্তু ওর বাবা কি কিছু করবে না?'

'মিলোও তাই আশা করেছিলো, গত বছর বড়দিনে যখন কর্মাধ্যক্ষ তাকে খামারে এ কাজ দিতে রাজী হয়নি।'

এক চাষী বলে : 'শুনেছি মিলোর বাবা দুশো গিলডার খরচ করতে রাজী আছে।'

তা শুনে মিলার বলে : 'দুশো গিলডারে কি হবে? ওদের খামারও তত বড় নয়, তাছাড়া আরও ছেলেমেয়ে রয়েছে ওদের। একমাত্র উপায় মিলো যদি লুসিকে বিয়ে করে। তবে পছন্দ-অপছন্দ—সে অন্য কথা। আমার মনে হয় মিলো বরং সৈন্যদলে নাম লেখাবে, তবু মোড়লের মেয়েকে বিয়ে করবে না।'

মাথা নেড়ে একজন চাষী বলে : 'তুইই সমান ঝঞ্ঝাটের। লুসিকে যে বিয়ে করবে তাকে আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে না এই বলে যে, 'ভগবান আমায় সংশোধন করে দাও'—তার শাস্তির অভাব হবে না।'

'আমার দুঃখ ক্রিষ্টিনার জন্য। কি করবে বেচারী,' দিদিমার মন ভারী হয়ে ওঠে।

মিলার হেসে বলে : 'মেয়েদের ব্যাপার। তার আর ভাবনা কি? দু একদিন কাঁদবে, হা হুতাশ করবে, তারপরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মিলোর দুর্ভোগই হবে বেশী।'

'তা ঠিক। যে সৈন্য হতে চায় না, তার পক্ষে বড় দুর্ভোগ। তবে সবই সহ্য হ'য়ে যাবে। আমাব এসবই জানা আছে। আমার স্বামী—ভগবান তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন,—তাঁকেও কম সহ্য করতে হয়নি,—আমিও ছিলাম তাঁর সঙ্গে। তবে আমাদের অবস্থা জ্যাকব আর ক্রিষ্টিনার মত ছিল না। জর্জ বিয়ে করার হুকুম পেয়েছিলো। আমরা একসঙ্গে সুখেই ছিলাম। এক্ষেত্রে হয়তো তা হবে না—তাছাড়া মিলো হয়তো রাজী হবে না—বিশেষ ক'রে যখন পবস্পর পরস্পরের জন্য চৌদ্দ বছব অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। তবু আমার মনে হয়, ও সৈন্যদলে ভর্তি থেকে রেহাই পাবে।' • দিদিমার মুখখানি দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—ছেলে-মেয়েদের আসতে দেখেছেন তিনি। তারাও দিদিমাকে দেখে ছুটে আসে।

মিলার তার মেয়েকে দেখে বলে : 'মানচিক্কা তোর খিদে পায়নি?'

'হাঁ বাবা আমাদেব সবারই খিদে পেয়েছে। আজ আমরা কিছুই খেতে পাইনি।'

নস্যির কৌটো ঘুরিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করে : 'কেন? এক টুকরো রুটি, শুকনো আপেল, আর বান্, ওগুলো কি হলো?'

মেয়ে হেসে বলে : 'তা তো দুপুরেই ফুরিয়ে গেছে—!'

টেকোটি হাতে রেখে দিদিমা বলেন : 'সত্যিই তো, এতটা পথ, তাছাড়া পড়াশুনা—তাতে খিদে পাবে বৈকি ! আয় তোরা, চল সব, বাড়ি চল। তা নাহ'লে তোরা খিদেয় মরে যাবি !' সবার কাছে বিদায় নিয়ে চলে তারা। মানচিঙ্কা বারুস্কাকে বলে কালও সে তাদের জন্য সাঁকোর কাছে অপেক্ষা ক'রে থাকবে। সে ছুটে বাড়ি যায়। দিদিমার হাত ধরে চলে বারুস্কা। দিদিমা জিজ্ঞেস করেন : 'এবার আমায় বল—কেমন কাটলো তোদের স্কুলে ? কি পড়লি ? কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিস ?'

জন্ তাঁর কাছে লাফিয়ে এসে বলে : 'দিদিমা আমি 'বেঞ্চিপরিদর্শক' হয়েছি।'

'তার মানে ?'

বারুস্কা জবাব দেয় : 'তার অর্থ দিদিমা—যে পিছনের বেঞ্চিতে ব'সে সকলের উপব নজর রাখে। আর কেউ যদি দুষ্টুমি করে তার নাম লিখে নেয়।'

'আমাদের কালে তাকে বলতো মনিটর্। কিন্তু মনিটর তো ভাল ছেলেরাই হতে পারতো। প্রথম দিন যে স্কুলে গিয়েছে সে ভাল ছেলে হবে কি করে ?'

বারুস্কা তখন বলে : 'পথে এণ্টন আমাদের ঠাট্টা করছিলো, যে আমরা যদি প্রশেকবাড়ির ছেলেমেয়ে না হতাম, তা হলে মাষ্টার মশাই আমাদের নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করতেন না।'

'সে কি কথা !' দিদিমা বলেন : 'মাষ্টার মশাই তোদের প্রয়োজন হলে শাসনও করবেন যেমন শাসন করেন এণ্টনকে। তিনি তোদের যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন তা শুধু তোদের স্কুলে ভাল লাগার জন্য, আর যাতে তোরাও ভাল ব্যবহার করিস। কি শিখলি তোরা আজ ?'

'ডিক্‌টাণ্ডো,' জবাব দেয় বারুস্কা।

'সে আবার কি ?'

'মাষ্টার মশাই পড়ে যান আর আমরা লিখে নিই। তারপর আমরা জার্মান থেকে বোহেমিয়ান্ ও বোহেমিয়ান্ থেকে জার্মান ভাষায় তর্জমা করি।'

সব কিছুই জানতে চান দিদিমা। জিজ্ঞেস করেন : 'ছেলেমেয়েরা সব জার্মান ভাষা জানে ?'

'না দিদিমা, আমরা ছাড়া কেউই জার্মান ভাষা জানে না। আমরা তো বাড়িতে জার্মান পড়েছিলমে, আর বাবাও আমাদের সঙ্গে জার্মান ভাষায় কথা বলেন। না জানলেই বা ক্ষতি কি ? স্কুলের পাঠ ঠিকমত লিখতে পারলেই হলো,' বারুস্কা দিদিমাকে বুঝিয়ে দেয়।

'না জানলে লিখবি কি ক'রে ?'

'ঠিক মত না লিখতে পারলে অবশ্য শাস্তি পেতে হয়। মাষ্টার মশাই 'ব্লাকবুকে' তাদের নাম লিখে নেন। তাদের দাঁড় করিয়ে রাখেন বা হাতে বেত মারেন। আজ মোড়লের মেয়ে এনা দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি পেয়েছে। সে জার্মান 'ডিক্‌টাণ্ডো' একেবারে জানে না। দুপুরে যখন আমরা বাইরে এসেছি তখন সে আমায় বলে তার খাতায় লিখে দিতে। এত ভয় পেয়েছিলো যে সে খেতেই পারে না। আমি তাকে লিখে দিলাম। ও আমাকে দু'খানি পনীর দিয়েছে।'

দিদিমা বললেন : 'তোর কিন্তু পনীর নেওয়া উচিত হয়নি।'

'আমি নিতে চাইনি। কিন্তু ও বললে ওর আর দু'খানি আছে। তাছাড়া আমি ওর হয়ে লিখে দিয়েছি। ও বলছে, রোজ আমার জন্য কিছু নিয়ে আসবে আমি যদি ওকে জার্মান লিখে দিই।'

'ওকে সাহায্য করতে পারিস—তবে তুই যদি সব লিখে দিস তা হলে ও শিখবে কি ক'রে ?'

'না শেখে তো না-শিখল ? আমাদের জার্মান পড়াতো মাষ্টার মশায়ের জন্য।'

'যতই শিখবি ততই দেখবি কাজে আসবে। তাছাড়া জার্মান ভাষা খুব দরকারী। তোরা তো দেখেছিস তোদের বাবার সঙ্গে আমি কথাই বলতে পারি না।'

'কিন্তু বাবা তোমার সব কথাই বুঝতে পারে, আর জার্মান না জানলেও তুমি বাবার কথা বুঝতে পারো. এনার জার্মান জানার দরকার নেই। ও বলে : জার্মান শিখতে হলে ও জার্মানী যাবে। কিন্তু মাষ্টার মশাই কিছুতেই ছাড়বেন না। সত্যিই দিদিমা, জার্মান 'ভিউকটাণ্ডো' বড় কঠিন—যদি বোহেমিয়ান্ হতো তা হলে—উঃ কি সহজই না হতো!'

'সব কিছুই তোদের শেখা দরকার। ছেলেরা কি দুষ্টুমি করেছিলো?'

'না, মাষ্টার মশাই ঘর থেকে চলে যেতেই অন্য ছেলেরা আর জনি এক সঙ্গে চিৎকার করে। ওরা বেঞ্চির ওপরও লাফিয়ে ওঠে। তারপর আমি বলতেই...'

'তুই বলতেই? কখনই না। আমি মাষ্টার মশাইকে আসতে দেখেই থেমে গেলাম।'

'ভাল কথা। তোর না অন্যদের ওপর নজর রাখার কথা : আর তুই নিজেই দুষ্টুমি করলি?'

উইলি এতক্ষণ আডেল্‌কাকে একটি গিল্‌টি করা কাগজের ছোট বই ও একখানি কাঠ দেখাতে ব্যস্ত ছিল। স্কুলের একটি ছেলের কাছ থেকে সে কিনে এনেছে। দিদিমা বলেন : 'কি দুষ্টু স্কুলের ছেলেরা। বেঞ্চির ওপর উঠে মারামারি করে। মনিটারও বাদ যায় না!'

'কিন্তু মাষ্টার মশাই কিছু বলেন না!'

'তিনি ঘরে না থাকলেই ওরা দুষ্টুমি করে। তিনি এসে গেলে ওরা যে যার জায়গায় চুপ ক'রে বসে।'

'কি দুষ্টু রে বাবা!' মন্তব্য করেন দিদিমা।

জন্ বলে : 'আমিও দেখেছি মেয়েরা স্কুলে পুতুল খেলে।'

ছেলেমেয়েরা স্কুলের অনেক গল্প করে—কি দেখেছে তারা পথে, কার সঙ্গে কি কথা হয়েছে। এই তাদের বাড়ির বাইরে প্রথম অভিযান। তারাও গর্ববোধ করে—যেন প্যারিস্ থেকে ঘুরে এসেছে।

দিদিমা জিজ্ঞেস করেন বারুষ্কাকে : তোর পনীর কোথায়? খেয়ে ফেলেছিস?'

'একখানি আমরা খেয়েছি। আর-একখানি বাড়ি নিয়ে আসবো ভেবেছিলাম। আমি যখন বোর্ডে লিখছি তখন এণ্টন্ আমার ব্যাগ থেকে সেখানি বার ক'রে নিয়েছে। ও আমার পিছনেই বসে। ওকে কিছু বলতেও পারিনি, ও যদি রাস্তায় ধরে মারে—'

দিদিমা মনে মনে ভাবেন : 'আমরাও এদের চেয়ে ভাল ছিলাম না।' ছেলেমেয়েদের কাছে মার চেয়ে দিদিমাই ছিলেন বেশী সদয়। ছেলেরা লম্ফঝম্প ক'রে বেড়ালে বা বারুষ্কা দুরন্তপনা করলেও তিনি কিছু বলতেন না। তারাও তাই সব কথা মাকে না বললেও দিদিমার কাছে গোপন করতো না।

তের

১লা মের পর এক বৃহস্পতিবার। সেদিন স্কুল বন্ধ। তারা দিদিমাকে ফুলগাছে আর আঙুর লতায় জল দিতে সাহায্য করছে। এদিন তাদের অনেক কাজ, তিন সপ্তাহ বারুষ্কা তার পুতুল নিয়ে বসেনি—ছেলেরা তাদের কাঠের ঘোড়া বা গাড়িতে চড়েনি—বন্দুক ছোড়েনি বা বল খেলেনি। পায়রার খাঁচার কাছেও তারা

যায়নি একবার। আঙ্কেল্‌কাই কেবল খরগোসদের খেতে দিয়েছে। এতদিনের অবহেলা আজ শুধরে নিতে হবে।

গাছে জল দেবার পর তারা সবাই যে যার কাজে যায়। দিদিমা কেবল লিলাক্ ঝোপের তলে বেঞ্চিতে বসে সুতো কাটতে থাকেন। সারাদিনই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা স্বভাব তাঁর। আজ তিনি বিষণ্ণ। বাগানের খোলা দরজা দিয়ে কাল মুরগীটা এসে ফুলের বেদী ছিঁচড়ে দিয়ে গেল, তাও লক্ষ্য করলেন না তিনি। ধূসর রঙের রাজহাঁসটি কাছেই চরছিলো—তার বাচ্চাগুলি বেড়ার ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে তাকিয়েছিল বাগানের দিকে। দিদিমা বাচ্চাগুলিকে খুব ভালবাসতেন। আজ কিন্তু তিনি তাদেরও চেয়ে দেখলেন না। ভিয়েনা থেকে চিঠি এসেছে যে রাজকুমারী মে মাসের মাঝামাঝি আসবেন না, কারণ কউন্টেস্ হোরটেন্‌সে বড় অসুস্থ। ভগবানের কৃপায় সে যদি ভাল হয়ে যায় তবে রাজকুমারী সম্ভবতঃ অল্প কয়েকদিনের জন্য আসবেন। তবে তারও কোন স্থিরতা নেই। চিঠি পড়ে শ্রীমতী প্রশেক চোখের জল রাখতে পারে না—মাকে কাঁদতে দেখে ছেলেমেয়েরাও কাঁদে। দরজায় উইলি যে খড়িমাটির দাগ দিয়ে রেখেছিল, তার মাত্র কয়েকটি অবশিষ্ট ছিল। এখন তাদের সব আশা বিফল হয়ে গেল। তাদের প্রিয় কাউন্টেস্ হোরটেন্‌সে যে আর বাঁচবে না সেকথা তারা ভাবতে পারে না। প্রার্থনায় তারা তার কথা স্মরণ করতে ভোলে না। ক্রমে ক্রমে ছেলেমেয়েরাও শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু স্বল্পভাষী শ্রীমতী প্রশেক দিনে দিনে আরও স্বল্পভাষী হয়ে গেল। দিদিমা যখনই তার ঘরে যান, দেখেন কেঁদে কেঁদে তার চোখ ফুলে উঠেছে। তিনি তাকে পাড়া বেড়াতে পাঠিয়ে দিতেন যাতে সে দুঃখ ভুলে যায়। তাছাড়া শ্রীমতী প্রশেক ছিল বড় একা, কর্মব্যস্ত শহরে মানুষ হয়ে এই

গ্রামে নিরালা বাড়িতে তার বড় কষ্ট হতো। দাম্পত্য জীবন তার বড়ই সুখের ছিল। তবে একমাত্র দুর্ভাগ্য যে তার স্বামীকে বছরের বেশীর ভাগই ভিয়েনায় থাকতে হতো, আর সেই সময়টি কাটতো তার দুঃশ্চিন্তা ও মনোকষ্টে। এবার প্রায় একবছর স্বামীর সঙ্গে দেখা হয় নি। ছেলেমেয়েরাও বাপকে দেখেনি এক বছর। দিদিমার দ্বিতীয় কন্যা ইয়োহানারও আসার কথা ছিল জনের সঙ্গে। মায়ের সঙ্গে দেখা ও পরামর্শ করার প্রয়োজন তার—সে বিয়ে করতে চলেছে। দিদিমাও তার আসার দিনটির জন্য প্রত্যাশী হয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর সে আশা ভঙ্গ হলো। মিলোর কি হবে তা নিয়েও তাঁর ভাবনা। ভালমানুষ ছেলেটি ও ভাল মেয়েটি ক্রিষ্টিনা—দু'জনকেই ভালবাসতেন তিনি। তাদের প্রেম সফল হলে তিনি সুখী হতেন দেখে। তিনি বলতেন: 'সমানে সমানে মিলন হলেই শান্তি। ভগবানও তা দেখে সুখী হন।' কিন্তু এ আশা বোধ হয় সফল হবে না—সেদিন সকালে মিলো আর সকলের সঙ্গে সৈন্যদলে নাম লেখাতে গিয়েছে। এই সব চিন্তায় দিদিমার মনটি ভারাক্রান্ত যদিও প্রশান্তি লেপা রয়েছে তাঁর মুখখানিতে।

'দেখ দিদিমা, কাল মুরগীটি এখানে মাটি খুঁড়ছে—যা, যা,' বারুস্কার গলা শুনে দিদিমা চেয়ে দেখেন যে কাল মুরগীটি ছুটে পালাচ্ছে—ফুল-গাছের বেদীতে বড় বড় গর্ত ক'রে।

'কখন চুপে চুপে এসেছে শয়তানটা! বারুস্কা গর্তগুলি ভরে দে। হাঁসগুলোও এসেছে—ওদেরও খাবার সময় হয়েছে। আমি ভুলেই গেছি একেবারে। ওদের এবার খেতে দিতে হবে।' এই বলে তিনি টেকো রেখে দিয়ে ঝুড়ি হাতে চললেন। বারুস্কা বাগানে ফুলগাছগুলির বেদীতে মাটি দিয়ে সমান করে। কিছু পরেই ক্রিষ্টিনা এসে জিজ্ঞেস করে: 'তুই একা?'

'না। দিদিমা এখনই আসবেন।' বারুস্কা জবাব দেয়।

'তোর মা কোথায়?'

'মা গিয়েছে শহরে। মার মন বড় খারাপ, বাবা বোধহয় এ বছর আসবে না। দিদিমা তাই মাকে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন যাতে তার মনটা একটু ভাল হয়। বাবা আসবে, কাউণ্টেস্ আসবে ভেবে আমরা আনন্দে মেতে উঠেছিলাম। এখন ভারী খারাপ লাগছে। হায় বেচারী হোরটেন্‌সে!'

হাতের উপর মাথা রেখে বারুস্কা চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে। লিলাক্ গাছের তলে বসে ক্রিষ্টিনা, তার হাত দু'খানি কোলের উপর। চোখ দুটি লাল, ফুলে উঠেছে। বিষাদের প্রতিমূর্তি।

'এই জ্বর বড় সাংঘাতিক—ও যদি আর না বাঁচে! হায় ভগবান! তোর কখনও জ্বর হয়নি ক্রিষ্টিনা?' জিজ্ঞেস করে বারুস্কা।

দুঃখের স্বরে ক্রিষ্টিনা জবাব দেয়: 'না, আমার কখনও অসুখ করেনি। তবে ভয় হয় এবার বোধ হয় আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে।'

বারুস্কা এতক্ষণ ক্রিষ্টিনার দিকে চেয়েই দেখেনি। তার মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করে: 'কি হয়েছে তোর? মিলোকে সৈন্য দলে নিয়ে গিয়েছে?'

জবাব না দিয়ে ক্রিষ্টিনা কেঁদে উঠে। এমনি সময় দিদিমা এসে পড়েন, জিজ্ঞেস করেন: 'ওরা কি সবাই ফিরে এসেছে?'

মাথা নেড়ে ক্রিষ্টিনা জবাব দেয়: 'না, এখনও না। তবে আর কোন আশা নেই দিদিমা। লুসি শপথ করেছে সে যদি মিলোকে না পায়, তবে আমিও পাবো না তাকে। মোড়ল তার ইচ্ছাই পূর্ণ করবে—আর কর্মাধ্যক্ষও মোড়লকেই সন্তুষ্ট রাখবে। কর্মাধ্যক্ষের মেয়ে কি ভুলতে পারে কি ভাবে মিলো তার প্রেমিককে অপদস্থ করেছিলো। এই সব ভেবে আমি আর কোন আশা দেখি না দিদিমা।'

'কিন্তু মিলোর দাদা শুনলাম কোর্টে গিয়েছিলো, বেশ কিছু টাকা পয়সা নিয়ে। তাতেও হয়তো কিছু হতে পারে।'

'সে-ই একমাত্র আশা। সব শুনে তারা হয়তো সাহায্য করতে পারে। তবে প্রায়ই তারা কিছু করে না।'

'আশা করি মিলোর ভাগ্যে তা ঘটবে না। আর যদি তাই হয়, তবে আমার মনে হয়, তার বাবা যে টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিলো, তার সঙ্গে তোর বাবা আর কিছু টাকা যোগ দিয়ে আইন মত জরিমানা দিয়ে দিলেই বোধহয় ব্যাপারটার একটা হিল্লে হয়।'

'তা সত্যি দিদিমা—তবে এত 'যদি' থাকলে কি করা যায়। প্রথমত, মিলোর বাবা ঘুষের টাকা দিয়ে দিয়েছে—আর বাবার হাতেও এখন বাড়তি টাকা নেই। তাছাড়া এ বিয়েতে বাবার আপত্তি না থাকলেও তাঁর ইচ্ছা জামাই ব্যবসায় কিছু মূলধন নিয়ে আসে। আর এখন কিনা তাঁকেই জামাইয়ের জন্য খরচ করতে হবে। মিলোও কিন্তু কারও দয়াদাক্ষিণ্য নিতে রাজী নয়।'

'আমার মনে হয় মিলোর চিন্তা যে যৌতুক নিয়ে যে মেয়ে ঘরে আসবে তার দাপটে ঘরে থাকা দায় হবে! কোন পুরুষ মানুষই তা সহ্য করতে পারে না। তবে এ ক্ষেত্রে ছিল অন্য কথা।'

'ইটালিয়ানটির ঘটনা নিয়ে তখন হেসেছিলাম এখন দেখছি কাঁদতে হবে। এ যদি না ঘটতো তাহলে মিলো আজ ক্যাসেলের ফার্মে কাজ করতে পারতো, সৈন্যদলে যেতে হতো না। আমার দুঃখ যে আমার জন্যই এ ঘটনা ঘটলো।'

'তোর এতে দোষ কি মা? তোর পায়ের কাছে এই যে ডেইসী ফুলটি ফুটে আছে, তা নিয়ে যদি দু'জনে ঝগড়া করিস, তাতে ফুলের অপরাধ কি? তোর মত এমনি একটা ঘটনাও ঘটেছিলো আমার জীবনে। আমার স্বামী তাতে বেশ অসুবিধায় পড়ে। ভাবি, এ

আমারই অপরাধ! রাগে, ঈর্ষায়, প্রেমে বা কামনার আগুনে মানুষ তার যুক্তি হারিয়ে ফেলে—তখন মরণেও তার ভয় হয় না। তাছাড়া দুর্বলতা সবমানুষেরই আছে।'

'দিদিমা, গতবছরও তুমি এই ঘটনার উল্লেখ করেছিলে একবার। মনে ছিল না আমার—আজ আবার তুমি সেই কথা তুললে। বলো না, কি ঘটেছিলো? এখানে লিলাক্ গাছের তলে বসে সেই কথা শুনতে শুনতে কিছুক্ষণের জন্যেও অন্তত: আমার দুশ্চিন্তা ভুলে যাবো।'

'আচ্ছা বলছি,' দিদিমা বলেন: 'বারুস্কা তুই গিয়ে দেখ, ছেলে-মেয়েরা যেন জলের ধারে না যায়।' বারুস্কা দিদিমার কথায় চলে যায়। দিদিমা তখন শুরু করেন—

'সে ১৭৭৭ সালের কথা। তখন আমি বেশ বড় হয়েছি। মারিয়া থেরেসা প্রুশিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সম্রাট জোসেফ সৈন্য নিয়ে ইয়ারমিরস্-এ এসেছেন। প্রুশিয়ানরাও তাদের সীমানায় তৈরি হয়ে আছে। গ্রামে মাঠে সর্বত্রই সৈন্যরা ঘাঁটি করেছে। আমাদের বাড়িতেও একজন অফিসার ও কয়েকজন সৈন্য আশ্রয় নিয়েছে। অফিসারটি বড় দুশ্চরিত্র। যে কোন মেয়ে দেখলেই তাকে ফুসলানোর ফন্দী। আমি তাকে এড়িয়ে চলতাম, কিন্তু সে কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। তখন নিরুপায় হয়ে আমি সারাদিন বাড়ির বাইরে কাজে যেতাম যেন তার সঙ্গে দেখা না হয়।…

'মেয়েদের কতবার বাড়ির বাইরে যেতে হতো কখনও বা মাঠের কাজ, কখনও বা ঘাস কাটতে—পুরুষেরা কাজে গেলে তাদের একাই বাড়ি থাকতে হতো।…

'এ তো কোনো কাজের কথা নয় যে কেউ-না-কেউ মেয়েদের বাড়িতে আগলে থাকবে। প্রয়োজন হলে তাদের নিজেদেরই আত্মরক্ষা

করতে হতো। এই অবস্থায় বদমাশ লোকেরা সুযোগ বুঝে দুরভিসন্ধি সাধন করতো।…

'কিন্তু ভগবান আমায় রক্ষা করলেন। খুব সকালে মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছি—বাড়িতে সবাই তখন ঘুমিয়ে—বরাবরই আমি খুব সকালে উঠতাম। মা বলতেন: যে সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে ওঠে—তার সৌভাগ্য আসে।—সত্যিই তাই, অন্য কোন সৌভাগ্য না হলেও সকালে ওঠার আনন্দই ছিল আমার বড় পুরস্কার। বাগানে বা মাঠে তখন ঘাসের উপর শিশিরকণা দেখে মন আমার নেচে উঠতো। প্রতিটি ছোট ছোট ফুল মাথা তুলে হাসছে। পাখিরা আমার মাথার উপর দিয়ে গান গেয়ে উড়ে যেত। চারদিকে এক শান্ত নিস্তব্ধতা। তারপর যেই পাহাড়ের পিছনে সূর্য উঠতো—আমার মনে হতো যেন আমি ভগবানের বাড়িতে এসে পড়েছি। গান গেয়ে উঠতাম,—কাজ আমার কাছে মনে হতো যেন খেলা।…

'একদিন যখন ঘাস কাটছি, পিছন থেকে কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—তোমার মঙ্গল হোক! ঘুরে জবাব দিতে গেলাম: তোমারও মঙ্গল হোক,—কিন্তু এত বিস্মিত হলাম যে একটি কথাও এল না আমার মুখে। হাতের কাস্তে মাটিতে পড়ে গেল।'

ক্রিষ্টিনা জিজ্ঞেস করে: 'সেই অফিসারটি, তাই না?'

দিদিমা বলেন: 'এত তাড়াতাড়ি করিস না মা। সেই অফিসারটি নয়, তাহলে আমার হাতের কাস্তে পড়ে যেত না। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা—জর্জ আমার সামনে দাঁড়িয়ে! তিন বছর তাকে আমি দেখিনি। মনে আছে তো তোদের জর্জ ছিল আমাদের প্রতিবেশী বিধবা নভতনির ছেলে। এই বিধবাই আমার সঙ্গে ছিলেন যখন আমি সম্রাট জোসেফের সঙ্গে কথা বলেছিলাম।'

'হাঁ, মনে আছে, তুমি বলেছিলে যে সে পুরোহিত না হয়ে তাঁতী হয়েছিলো।'

'সেজন্য দায়ী তার কাকা।—যাক…

'জর্জের কাছে পড়াশুনা প্রায় খেলার মতই সহজ ছিল। ছুটিতে সে বাড়ি এলে তার বাবা শুধু তার সুনামই শুনতে পেত। সে সুন্দর পড়তে পারতো। তার বাবার বদলে সে প্রতি রবিবার বাইবেল পড়ে শুনাতো সব্বাইকে। আমাদেরও তা শুনতে ভাল লাগতো। তার মা বলতো: ও যেন গির্জায় প্রার্থনা-সভায় বক্তৃতা করছে। আমরাও ভালমন্দ যা কিছু তার জন্য পাঠিয়ে দিতাম। তার মা তখন আপত্তি করতো: এ সব কেন? তোমাদের আমি কি প্রতিদান দেব? আমরা বলতাম, জর্জ তো পুরোহিত, তার আশীর্বাদ পেলেই যথেষ্ট।…

'আমরা প্রায় এক সঙ্গেই বড় হয়ে উঠলাম। একের অন্যকে ভাল লাগতো। সে যখন দু তিনবার ছুটিতে বাড়ি এলো, তাকে দেখে আমার যেন কেমন সমীহ হতো। সে বাগানে এসে আমার হয়ে ঘাস বয়ে নিয়ে যেত। বারণ করলেও শুনতো না। বলতাম: তুমি পুরোহিত, তোমার পক্ষে এ ভাল দেখায় না। ও শুধু হাসতো, বলতো: আমার পুরোহিত হবার এখনও অনেক দেরী। তাছাড়া কে জানে কার ভাগ্যে কি আছে?…

'একবার যখন ও ছুটিতে বাড়ি এসেছে, তার কাকা খবর পাঠালো সেখানে যাবার জন্য। কাকা ছিল নামকরা তাঁতী এবং তাতেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলো। ছেলেমেয়ে ছিল না তার। তাই ভাইপোর কথা স্মরণ হয়েছে। জর্জের মা কিন্তু যেতে দিতে চায়নি তবে বাবা বললে যে জর্জের ওখানে ভালই হবে। শেষ পর্যন্ত জর্জ তার কাকার কাছে গেল। জর্জ সেখানেই থেকে গেল। তার মা ও আমার প্রায়ই

তার কথা মনে হতো, তবে মা তা উল্লেখ করতেন, আর আমায় তা মনে মনেই চেপে রাখতে হতো। জর্জের কাকা কথা দিয়েছিলো যে সে তার ভার নেবে। এক বছর পর জর্জ তাঁতী হয়ে বাড়ি ফিরে এল।···

'মায়ের তা দেখে বড় দুঃখ, কিন্তু কি আর করেন। ছেলে তাকে সান্ত্বনা দেয়—যে পড়াশুনোর ইচ্ছে থাকলেও তার কোন দিনই পুরোহিত হবার ইচ্ছা ছিল না। কাকাও তাই উপদেশ দিয়েছিলো যে ও-বিদ্যায় পেটের ভাত পাওয়া যাবে না। বরং যদি হাতের কাজ কিছু শেখা যায় তাহলে কোনদিনই ভাতের অভাব হবে না। জর্জও কাকার উপদেশ মতই কাজ করে।···

'প্রথম বছরই কাজ শিখে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। বার্লিনে যাবার পথে সে বোহেমিয়ার আমাদের এখানে এল।' এই বলে দিদিমা বুকের মাঝ থেকে একটি মালা বের ক'রে দেখান। মালাটির দিকে একবার চেয়ে, চুমো খেয়ে, আবার সেটি বুকের মাঝে রেখে দিয়ে তিনি শুরু করলেন—

'আমার বাবা কিন্তু জর্জের তাঁতের কাজ শেখার জন্য দোষ দেন নি। তিনি তার মাকে বলতেন : কে জানে কার কখন কি কাজের প্রয়োজন হয়। ও যদি এ কাজ ভালভাবে করতে পারে, তাহলে আর দশজনের মতই ও সম্মানের অধিকারী হবে। শেষ পর্যন্ত মাও সেকথা মেনে নিলেন। তার একমাত্র সন্তান। জর্জ কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে থেকে আবার বেরিয়ে পড়লো। তারপর তিন বছর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। হঠাৎ সকালে সেদিন সে এসে হাজির—"তোমার মঙ্গল হোক।"···

'বুঝতেই পার তাকে দেখে কি আনন্দ আমার। সে অনেক বদলে গেছে, তবু সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম তাকে। অনেক লম্বা হয়েছে, তবে তার বলিষ্ঠ দেহ, তার তুলনা মেলে না। আমার দিকে

ঝুঁকে পড়ে আমার হাতখানি ধরে সে জিজ্ঞেস করলে : আমি ভয় পেয়েছি নাকি ? বললাম : কেন পাব না ? তুমি যেন আকাশ থেকে এসে পড়েছো ! কোথা থেকে এলে এখন ?...

'সোজা ক্লাড্রন্ থেকে আসছি। কাকার ভয়, চারদিকে ফৌজে ভর্তি চলছে, আমাকেও হয়তো ধরে নিয়ে যাবে। আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন। এখানেই আমি লুকিয়ে থাকবো। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তাই এখানে চলে এলাম।...

'কিন্তু এখানে যদি সবাই তোমাকে দেখে ফেলে ! তোমার মা কি বলছে ?

'এখনও মার সঙ্গে দেখা হয়নি। রাত দুটোয় এখানে এসেছি, তাই তাঁকে জাগাতে ইচ্ছে হয়নি। ভাবলাম—ম্যাডেলিনের জানালার ধারে শুয়ে থাকি, ওতো খুব সকালে ওঠে। সত্যিই তাই, গ্রামের লোক বলতো : "পাখী ডাকার আগেই ম্যাডেলিন্ ঘাস কেটে আনে।" দেখলাম ঝরণার জলে তুমি মুখ ধুয়ে চুল পরিপাটি করছো। তারপর তুমি যেই প্রার্থনায় বসেছো তোমাকে বাধা দিতে ইচ্ছে হলো না। কিন্তু তুমি কি এখনও আমায় ভালবাসো ?...

'ভালবাসি,...তাছাড়া আর কি জবাব দেব আমি। ছোট বেলা থেকেই তাকে ভালবাসতাম। সে ছাড়া আর কারও কথাই কোনদিন চিন্তা করিনি। কথাবার্তার পর সে মার সঙ্গে দেখা করতে গেল আর আমি বাড়ি গিয়ে বাবাকে বললাম তার কথা। বাবা ছিলেন বড় বিচক্ষণ। এমনি সময়ে জর্জ এসেছে শুনে তিনি বড় চিন্তিত হয়ে পড়লেন।...

'জানি না তার পক্ষে "সাদা কোট" থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে কিনা। তাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। কাউকে বলো না যে সে এখানে এসেছে।...

'তার মাও তাকে দেখে সুখী হলেও বড় শঙ্কিত হয়ে পড়লো। তার

নাম আগেই ফৌজে চলে গেছে, তবে সে কোথায় আছে, কারও তা জানা ছিল না। তিনদিন সে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রইলো—দিনের বেলায় তার মা তার কাছে আসতো—আর সন্ধ্যায় আমিও যেতাম। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা হতো আমাদের।…

'আমার ভয় জর্জ ধরা না পড়ে যায়। সেই ভয়ে সেই অফিসারের দৃষ্টি থেকেও গা ঢাকা দিতে ভুলে গেলাম। একদিন অনেকক্ষণ জর্জের সঙ্গে থেকে বাড়ি ফিরছি। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে—চারদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ সেই অফিসারটি এসে দাঁড়ালো আমার পথে। সে লক্ষ্য করেছিলো যে রোজ সন্ধ্যায় আমি নভত্‌নিদের বাড়ি যাই। তাই আমার জন্য বাগানে অপেক্ষা করছিল। কি করি? চিৎকার করলেই জর্জ শুনতে পেয়ে নেবে আসবে। ঠিক করলাম আমার শক্তিরই আজ পরীক্ষা হবে। অফিসারটি আমার কথা না শুনলে নিজেই শক্তি প্রয়োগ করবো। শুনে হেসো না আমার দিকে চেয়ে। তখন আমার দেহে শক্তি ছিল—কাজ ক'রে ক'রে আমার হাত দু'খানি ছিল বলিষ্ঠ। আমি তাকে রুখতে পারতাম, কিন্তু অফিসারটি রাগে আমায় গালগাল দিয়ে উঠলো। হঠাৎ জর্জ ছুটে এসে দাঁড়ালো আমাদের দু'জনের মাঝে। অফিসারটির গলা চেপে ধরলো সে দুহাতে।…

'চিৎকার ক'রে উঠলো: রাতে একটি নিরীহ মেয়েকে—কি ভেবেছো?…

'আমি তাকে বারবার শান্ত করবার চেষ্টা করলাম তার অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। কিন্তু সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সাঁড়াশীরমত তার গলা চেপে ধরলো। শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে তাকে ছাড়িয়ে দিলাম।…

'অন্য সময় অন্যত্র হলে তোমায় উপযুক্ত সাজা দিতাম। এ মেয়েটি আমার ভাবী স্ত্রী। আর কোনদিন যদি তোমায় ওর পিছু নিতে দেখি—তাহলে তোমাকে শেষ ক'রে দেব—

'এই বলে সে তাকে একটি বলের মত বেড়ার ওপারে ছুড়ে ফেলে দিলে। তারপর দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো : ম্যাডেলিন্ আমার কথা ভুলো না, মাকে আমার কথা বলো। এবার বিদায়— আমায় এখনই পালিয়ে যেতে হবে, তা নাহলে আমায় ধরে ফেলবে। চিন্তা করো না—পথ ঘাট আমার সব জানা। এখান থেকে আমি ক্লাড্রানে যাব। সেখানে লুকিয়ে থাকবো। তুমি ভামবেরিতস্ তীর্থে এসো—সেখানে দেখা হবে।···

'আমি কিছু ভাববার আগেই সে চলে গেল। তার মার কাছে গিয়ে বললাম সব। তারপর আমরা দু'জনে এলাম বাবার কাছে। আমাদের তখন জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে গেছে। কোন কিছুর শব্দ শুনলেই চমকে উঠি। অফিসারটি তখনই তার সৈন্যদের চারদিকে পাঠিয়ে দিল। সে জর্জকে চিনতো না, তবে ভেবেছিলো যে সে কোন পাশের গ্রামেরই হবে। কিন্তু সৈন্যেরা তাকে ধরতে পারলো না। আমি অফিসারটিকে এড়িয়ে যেতাম। সে যখন কোনরকমেই প্রতিশোধ নিতে পারলো না, তখন গ্রামে রটিয়ে দিল যে, আমার স্বভাব-চরিত্র ভাল না। গ্রামের লোক আমায় ভাল ভাবেই জানতো, তাই এতে আমার কোন ক্ষতিই হোল না। ভাগ্যক্রমে এমনি সময় সৈন্যদের চলে যাবার হুকুম এল, কারণ প্রুশিয়ানরা সীমানা অতিক্রম করেছে। সে যুদ্ধে কিছুই হলো না। চাষীরা বলতো এ 'রুটির' যুদ্ধ, কারণ সৈন্যেরা গ্রামের সব রুটি খেয়ে তবে বাড়ি ফিরে গেল।···

একাগ্রমনে শুনতে শুনতে ক্রিষ্টিনা জিজ্ঞেস করে : 'কিন্তু জর্জের কি হলো ?'

'পরের বসন্তকাল পর্যন্ত তার কোন খবরই পেলাম না। সে সময়ে কেউই দেশ ভ্রমণেও বেরুতো না।'

'আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বসন্তকাল এসে গেল, তবু

তার কোন খবরই পেলাম না। জর্জকে কথা দিয়েছিলাম তীর্থে যাবো, আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। গ্রামের আরও কয়েকজন তীর্থে যাচ্ছিলেন। দলের নেতা কয়েকবার ক্লাড্রানে গিয়েছেন। তিনি আমাকে নিরাপদে নিয়ে যাবার জন্য বাবাকে কথা দিলেন।···

'আমরা শহরে আসতেই দলের নেতা বললেন: আমরা শ্রীমতী লিডুষ্কার ওখানে বিশ্রাম করবো। বোহেমিয়া থেকে যারাই আসতো সবাই এখানে উঠতো, কারণ এই মহিলা ছিলেন আমাদের দেশের লোক। শ্রীমতী লিডুষ্কা আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে বসিয়ে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য বাইরে গেলেন।

'আমার মনে তখন পরস্পরবিরোধী অনুভূতি—আনন্দ, ভয়। আনন্দ জর্জকে দেখবো বলে, ভয় যদি তার কিছু হয়ে থাকে। এমন সময় এক পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেলাম। শ্রীমতী লিডুষ্কা বললেন: এসো জর্জ, বোহেমিয়া থেকে কয়েকজন যাত্রী এসেছেন। দরজা খুলে গেল, জর্জ দাঁড়িয়ে। তার দিকে চেয়ে আমি হতবাক্ হয়ে গেলাম। তার দেহে সৈনিকের বেশ। আমি চোখের সামনে অন্ধকার দেখলাম। সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে দু'হাতে ধরে ভাঙা গলায় বললে: হতভাগ্য আমি! যদি বোহিমায়ায় থাকতাম তাহলে আমাদের সম্রাটের সেবা করতে পারতাম। এখন আমাকে বিদেশী শাসকের কাজ করতে হবে।···

'জিজ্ঞেস করলাম: জর্জ এ তুমি কি করলে?···কি করেছি? বোকার মত কাজ করেছি, কাকার কথা শুনলাম না। এখানে এসে বড় একা একা আর বড় অসহ্য হয়ে উঠলো। এক রবিবারে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কাকার কথা অগ্রাহ্য করে এক নাচঘরে গেলাম। সেখানে মদ গিলে সবাই আমরা প্রায় মাতাল হয়ে পড়লাম। ঠিক সেই সময় অফিসাররা সেখানে সেচ্ছাসেবকের খোঁজে এসে হাজির হলো।'

'এই হতভাগারা!' বাধা দিয়ে ওঠেন শ্রীমতী লিডুক্কা: 'জর্জ যদি এখানে থাকতো, তাহলে কিছুই ঘটতো না। ওদের যখন একবারে জ্ঞানবুদ্ধি নেই তখন আর আমরা কি করবো? তবে জর্জ তোমার আর ভাবনা কি? তোমায় দেখতেও সুন্দর আর তোমার মত লম্বা, এমনি সৈন্যদের রাজার খুব পছন্দ। তোমার কাঁধে অনেক সম্মানের ভূষণ শোভা পাবে।'

'যা হয়ে গিয়েছে, তার আর কোন প্রতিকার নেই। জ্ঞান হ'লে দেখলাম আমার বন্ধু ও আমি সৈন্য হয়ে গেছি। ভাবলাম পাগল হয়ে যাবো। কাকাও বড় দুঃখ করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাবলেন কি ক'রে এই ক্ষতি লাঘব করা যায়। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে গিয়ে ব্যবস্থা করলেন—তাই আমি এখনও এখানে আছি। শীঘ্রই আমি 'কর্পোরাল' হবো—তবে সে পরের কথা। আমায় দেখে দুঃখ করো না—তোমায় দেখে আজ আমার আনন্দ।'

'পরস্পর পরস্পরকে সান্ত্বনা দিলাম। তারপর সে আমাকে তার কাকার কাছে নিয়ে গেল। তিনিও আমায় দেখে সুখী হলেন। সন্ধ্যায় জর্জের বন্ধু সট্‌স্কি এলো, বড় ভাল মানুষ। শেষ দিন পর্যন্ত তারা পরস্পর পরম বন্ধু ছিল। দুজনেই আজ চলে গেছে—আমিই শুধু পড়ে আছি—' অনুভূতিতে দিদিমার গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল।

'দিদিমা, তুমিতো আর বাড়ি ফিরে আসোনি। দাদামশায় তোমায় ওখানেই বিয়ে করেছিলেন। তাই না?' জিজ্ঞেস করে বারুস্কা। সে এতক্ষণে ফিরে এসে দিদিমার কথা শুনছিলো।

'হাঁ, তাছাড়া আর উপায় ছিল না। তার কাকা তার বিয়ের অনুমতি নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। সেদিন কথাবার্তার পর জর্জ চলে গেল। আমি তার কাকার কাছেই থাকলাম। বৃদ্ধ লোকটি বড় স্নেহময়। ভগবান যেন তার আত্মার কল্যাণ করেন।

পরদিন সকালে জর্জ এসে তার কাকার সঙ্গে আলোচনার পর, আমায় এসে বললে—

'ম্যাডেলিন্ সত্য ক'রে বলো : তুমি কি আমায় ভালবাসো ? তুমি কি আমার জন্য সব দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারবে ? আমার জন্য কি তুমি তোমার বাবা-মাকেও ছেড়ে যেতে পারবে ?

'পারবো, আমি জবাব দিলাম।

'তাহলে এখানে থেকে যাও। তুমিই হবে আমার স্ত্রী। সে দু'হাতে আমার গলা ধরে আমায় চুমো খেল।

'এর আগে সে কখনো আমায় চুমো খায়নি। আমাদের তখন সে প্রথা ছিল না। কিন্তু বেচারী যে তখন আনন্দে আত্মহারা, জানে না কি করছে।

'কিন্তু তোমার মা কি বলবেন ? আমার বাবা মা কি ভাববেন ? জিজ্ঞেস করলাম। আনন্দে ও দুশ্চিন্তায় আমার বুক তখন দুরুদুরু করছে।

'কি ভাববেন তাঁরা ? তাঁরা কি আমাদের ভালবাসেন না ? তাঁরা কি চান যে আমরা মনের দুঃখে মরে যাই ?

'কিন্তু জর্জ, বাবা-মার আশীর্বাদ যে আমাদের চাই।

'সে জবাব দিল না। তার কাকা এগিয়ে এসে তাকে সরিয়ে দিয়ে আমায় বললেন :

'ম্যাডেলিন্, তুমি বড় ধর্মপ্রাণা। তোমায় আমার বড় পছন্দ। জর্জও তোমায় পেয়ে সুখী হবে। আর কেউ হলে আমি আপত্তি করতাম—তবে জর্জ বড় গোঁয়ার। আমি না থাকলে তাকে হা-হুতাশ করতে হতো। তবে আমি তার বিয়ের অনুমতি করিয়ে নিয়েছি। তোমায় আমি ঠকাতে পারি না, ও এখন বোহেমিয়ায় ফিরে যেতে পারবে না—আর তুমি যদি একা ফিরে যাও, তাহলে হয়তো সবাই

তোমাকে এ বিয়ে থেকে নিবৃত্ত করবে। তোমার বিয়ের পর তোমাকে ওলেস্‌নিকে নিয়ে যাব, তখন তোমার বাবা-মা তোমাকে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমরা যাত্রীদের হাতে চিঠি পাঠিয়ে দেবো। কাল সৈন্যদের গির্জায় তোমাদের বিয়ে হবে। আমি তোমার বাবা-মার হয়ে সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। ম্যাডলিন্ চেয়ে দেখ আমার দিকে—আমার এই তুষারশুভ্র কেশ নিয়ে কি আমি এমন কিছু করতে পারি যার জন্য ভগবানের কাছে আমি জবাব দিতে পারবো না? এই বলতে বলতে তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

'আমি রাজি হয়ে গেলাম। জর্জের আনন্দ আর ধরে না। আমার পরনে তখন একমাত্র পোশাক। জর্জ বিয়ের জন্য একটি স্কার্ট, জ্যাকেট্ ও একটি নেকলেস্ কিনে নিয়ে এল। বাকী যা কিছু তা তার কাকা দিলেন। সেই নেকলেস্‌টি আজও আমি পরছি। স্কার্টটি গোলাপী রঙের আর জ্যাকেটটি ফিকে নীল। তীর্থযাত্রীরা বাড়ি ফিরে গেল। কাকা চিঠি লিখে দিলেন যে আমি কয়েকদিন থেকে তার সঙ্গে ফিরবো। আর কিছু লিখলেন না তিনি। বললেন: 'লেখার চেয়ে মুখে বলাই ভাল।

'তিনদিনের দিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। অতিথি ছিল শ্রীমতী লিডুস্কা আর সট্‌স্কি। সট্‌স্কি বরযাত্রী আর তার বোন কনের সহযাত্রী। জর্জের কাকা আর এক ভদ্রলোক দু'জন সাক্ষী। শ্রীমতী লিডুস্কা বিয়ের ভোজের আয়োজন করলেন। দিনটি আনন্দে কেটে গেল। আমার দুঃখ যে বাড়ির সবাই আসতে পারলো না। ভোজের টেবিলে বসে শ্রীমতী লিডুস্কা জর্জের সঙ্গে নানা ঠাট্টা আরম্ভ করলেন। এমনিই হয় এসব উৎসবে।

'জর্জের ইচ্ছে আমরা এখন এক সঙ্গে বসবাস করি। কিন্তু তার

কাকা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন : আমি বোহেমিয়া থেকে না ঘুরে এলে তা সম্ভব নয়।···

'কয়েক দিন পরেই আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। সবাই আমার বিয়ের কথা শুনে বিস্মিত হলো তাই স্বাভাবিক। জর্জ সৈন্যদলে গিয়েছে শুনে মা দুঃখে অভিভূত হয়ে গেলেন। কেঁদে কেঁদে বললেন তিনি : তুই আমাদের ছেড়ে এক সৈন্যের সঙ্গে বিদেশে চলে যাবি! আমিও তা দেখে দুঃখে ভেঙে পড়লাম। বাবা তখন সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন :

'নিজের হাতে ও যে শয্যা রচনা করেছে সেই শয্যাই ও গ্রহণ করবে। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে—একই সঙ্গেই ওরা দুঃখকষ্ট ভোগ করবে। তুমিও তো জানো, যে আমার জন্যই তুমি তোমার বাবা-মাকে ত্যাগ ক'রে এসেছিলে। এই হচ্ছে মেয়েদের ভাগ্য। জর্জের এই দুর্ভাগ্যে কে তাকে সাহাষ্য করবে? তবে এ বেশীদিনের কাজ নয়, সে আবার বাড়ি ফিরে আসবে। দুঃখ ক'রে লাভ কি? জর্জ বুদ্ধিমান ছেলে। ম্যাডেলিন্ মা, চোখের জল মুছে ফেল। ভগবান করুন যেন, যার সঙ্গে তুই গির্জায় বেদীতে গিয়েছিস, সে যেন তোকে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করে। তিনি আমায় আশীর্বাদ জানালেন। তাঁর চোখ জলে ভরে গেল।···

'মাও কাঁদলেন। সব সময়েই সব কিছুর উপর ছিল তাঁর নজর। বললেন : কি ভেবেছিল তুই? আসবাব পত্র, বিছানা, জামাকাপড় কিছুই নেই তোর, বিয়ে হয়ে গেল! মা সবকিছুই দিলেন আমায়। তা নিয়ে আমি জর্জের কাছে ফিরে এলাম। তার মৃত্যু পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে ছিলাম। সেই অভিশপ্ত যুদ্ধ না হলে, সেও হয়তো আজ এখানে থাকতো। দেখ মা, জীবনে দুঃখ, আনন্দ, যৌবন, ভুল—সবই দেখেছি।' দিদিমা হেসে তাঁর শীর্ণ হাতখানি ক্রিষ্টিনার ভরাট বাহুর ওপর রাখলেন।

ক্রিষ্টিনা বলে : 'অনেক দুঃখ সহ্য করেছ তুমি দিদিমা, তবুও তুমি সুখী। তোমার অন্তর যা চেয়েছিলো, তা তুমি পেয়েছো। আমিও যদি জানতাম, সবকিছুর পরীক্ষার পর আমি সুখী হবো, তাহলে ধৈর্য ধরে সবকিছুই সহ্য করবো, এমনকি যদি চোদ্দ বছর মিলোর জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাও।'

'ভবিষ্যৎ ভগবানের হাতে। যা ঘটবে তা ঘটবেই। তা আমরা রোধ করতে পারি না। একমাত্র উপায় শুধু ভগবানে বিশ্বাস রাখা।'

'তা জানি, তবু সর্বদা অনুভূতি চেপে রাখা যায় না। জ্যাকব যদি চলে যায়, আমি হাহাকার করবো। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখশান্তি, অবলম্বন সবকিছুই বিলুপ্ত হবে।'

'কেন ক্রিষ্টিনা? তোর তো বাবা রয়েছে।'

'তা আছেন। এই গ্রীষ্মেই তিনি আমাকে বিয়ে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন—যাতে তাঁর ব্যবসার কাজে সুবিধা হয়। কিন্তু জ্যাকব যখন চলে যাবে তখন আমি কি করবো? আর কাউকেই আমি বিয়ে করতে পারবো না। আমি বরং দাসীবাঁদীর মত খাটবো। তুমি জানোনা দিদিমা, সরাইখানার কাজ করা কি ব্যাপার। খাটুনির জন্য নয়—তাতে আমার ভয় নেই, তবে লোকের কথা শোনা।'

'কেন? তা তুই কিছু করতে পারিস না?'

'আমি কি ক'রে করবো? বাবাকে মাঝে মাঝে বলি : এ সব কেন তুমি বাড়িতে সহ্য কর? কিন্তু তিনি খদ্দেরকে অসন্তুষ্ট ক'রতে চান না। বলেন : ধৈর্য ধরো। এদের উপরই আমাদের জীবিকা। আমি যে রূঢ় হবো, তাও তিনি চান না। আর যদি একটু বিনয়ী হই, তা'হলে সবাই ভাবে তাদের যা খুশি আমায় বলতে পারে। তবু এরা যদি সাধারণ লোক হতো আমি কিছু মনে করতাম না। কর্মাধ্যক্ষ ও ক্যাসেলের সেক্রেটারী—তাদের দেখে আমার সারা শরীর রি রি

ক'রে ওঠে। বলতে তোমায় লজ্জা করে দিদিমা, ঐ বুড়ো শয়তান কর্মাধ্যক্ষটি আমার পিছু নিয়েছে। ব'লতে শুনেছি যে, ও যে কোন প্রকারেই হোক মিলোকে সরিয়ে দেবে, কারণ মিলোই আমার রক্ষাকর্তা। কখনও কখনও ও লোককে দেখায় যেন মোড়লকে সন্তুষ্ট ক'রতে চলেছে, কখনও বা যেন মেয়ের প্রতিশোধ নেবে, কিন্তু আসলে শয়তানটা নিজের তালেই আছে। বাবা ওকে ভয় করে। আমার বিয়ে হয়ে গেলে সব মিটে যেত। এখনও যদি কেউ আমায় উত্ত্যক্ত করে, তাহলে মিলোকে ব'লে দিলেই যথেষ্ট। মিলো তার দিকে চাইতেই সে চ'লে যায়, আর কখনো আমায় বিরক্ত করে না। দিদিমা, জানোনা তুমি কি আমাদের ভালবাসা!' ক্রিষ্টিনা দু'হাতে মুখ রেখে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে।

এমনি সময়ে অলক্ষ্যে মিলো বাগানে আসে। তার সুন্দর মুখখানি দুঃখে বিকৃত হয়ে গেছে, উজ্জ্বল চোখদুটি তার স্তিমিত। মাথায় সৈনিক-টুপি—তাতে একটি গাছের পল্লব গোঁজা। দেখে বারুস্কা ভয় পায়। দিদিমার হাত দুখানি তাঁর কোলের ওপর পড়ে থাকে। তিনিও বিবর্ণ হয়ে যান, মুখ থেকে তাঁর বেরিয়ে আসে: 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

ক্রিষ্টিনা তার মাথা তুলতেই মিলো তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে: 'আমি সৈন্যদলে যোগ দিয়েছি। তিনদিন পরেই আমরা রওনা হবো।' মিলোর বাহুবন্ধনে ক্রিষ্টিনা অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

চোদ্দ

পরদিন সকালে দিদিমা ছেলেমেয়ের ঘরে গিয়ে বললেন:

'বলতো কে এসেছে আজ বাড়িতে?'

শুনে তারা বিস্মিত হয়ে যায়। ঠিক ক'রতে পারে না কে এসেছে। বারুঙ্কা বলে ওঠে: 'ও, জানি, বেয়ার।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। তার ছেলেও এসেছে সঙ্গে।'

'তাই নাকি?' চিৎকার ক'রে ওঠে জন্: 'যাই, দেখে আসি।' উইলিও ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দিদিমা তাদের ডেকে বলেন: 'জানোয়ারের মত ছুটে যাস্নি, মানুষের মত যা—' কিন্তু সেকথা তাদের কানেই যায় না। হাঁপাতে হাঁপাতে তারা ঘরে আসে—মা তাদের ধমকায়। বেয়ার কিন্তু তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এক এক ক'রে তাদের কোলে তুলে নিয়ে চুমো খায়। 'কেমন কাটলো তোমাদের সারা বছর?' জিজ্ঞেস করে সে। ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় না। তাদের দৃষ্টি তখন বেয়ার-এর পাশে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তার উপর। ছেলেটি প্রায় বারুঙ্কার বয়সের, ঠিক যেন তার বাপের প্রতিমূর্তি, যদিও তত বলিষ্ঠ নয়। তার মুখখানি লাল, চোখে বালকসুলভ আনন্দ।

'ওঃ তোমরা আমার ছেলের দিকে চেয়ে আছ! এসো, হাত ধরে পরস্পর বন্ধুত্ব পাতিয়ে নাও। ও আমার ছেলে ওরেল্।' এই ব'লে বেয়ার তার ছেলেকে সামনে এগিয়ে দেয়, আর সে এগিয়ে ছেলেদের সঙ্গে করমর্দন করে। এমনি সময় বারুঙ্কা দিদিমা ও আডেল্কার সঙ্গে এসে হাজির হলো।

বেয়ার বলে: 'এই যে বারুঙ্কা! ওরেল্, তোমায় তো বাড়িতেই ওর কথা কত বলেছি—আমি যখন এখানে রাত্রিবাস করি তখন বারুঙ্কাই আমাকে সর্বপ্রথম সুপ্রভাত জানায়। এবার কিন্তু অসুবিধা আছে—ও এখন স্কুলে যাচ্ছে। জনিও স্কুলে যাচ্ছে। আচ্ছা জনি, কেমন লাগছে তোমার স্কুল? স্কুলের বদলে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে

ভাল লাগে না তোমার? দেখ ওরেল্ আমার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়—শিকার করতেও বেশ শিখেছে ও।'

'ও সব বলবেন না ওকে—' দিদিমা বাধা দেন: 'এখনই ও ওরেলের বন্দুক দেখতে ছুটবে।'

'দেখলে ক্ষতি কি? যাও ওরেল্, বন্দুকটি দেখাও ওদের। গুলি ভর্তি নেই তো?'

ছেলেটি জবাব দেয়: 'না, গুলি নেই। শেষ গুলিটিতে আমি 'বাজার্ড' পাখিটা মেরেছিলাম।'

'যাও, ওদের দেখাও গিয়ে।'

ছেলেরা সবাই ছুটে বেরিয়ে যায়। দিদিমা কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হন।

জন্ ও উইলি পাখিটি দেখতে থাকে। আডেল্‌কা ওরেলকে জিজ্ঞেস করে: 'তোমার পাখির নাম কেন?' (বোহেমিয়ান ভাষায় 'ওরেল' অর্থ ঈগল পাখি।)

হেসে ওরেল্ জবাব দেয়: 'আমার সত্যিকারের নাম আউরেল্, কিন্তু বাবা আমায় ওরেল্ বলে ডাকেন। আমারও এই নাম ভাল লাগে। ঈগল পাখি দেখতে কেমন সুন্দর তাই না? বাবা একবার একটা ঈগল পাখি মেরেছিলেন।'

'সত্যিই তাই। আমার কাছে কিন্তু ঈগল ও আর সব জন্তু-জানোয়ারের ছবি আছে। আমার জন্মদিনে উপহার পেয়েছিলাম বইখানি।' এই বলে জন্ ওরেলকে হাত ধরে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।

ছবি দেখে ওরেল্ ভারী খুশি। বেয়ারও খুব মন দিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করে: 'গত বছর তো দেখিনি এই বইখানি।'

'আমার জন্মদিনে এখানি দিয়েছেন আমায় কাউণ্টেস্। ক্রিষ্টিনা

দিয়েছে একজোড়া পায়রা, শিকার-রক্ষক একটি খরগোস আর বাবা দিয়েছেন একটি সুন্দর পোশাক।' গর্বভাবে জবাব দেয় জন্।

'ভাগ্যবান ছেলে তুমি,' বেয়ার ছবির বইখানি দেখতে দেখতে একটি শেয়ালের ছবি দেখে হেসে বলে ওঠে: 'দাঁড়াও, তোমায় মজা দেখাবো।' উইলি ভাবে বেয়ার বুঝি এই ছবির শেয়ালের সঙ্গেই কথা বলছে। সে তাই বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে।

তাই দেখে বেয়ার বলে: 'ভয় নেই তোমার। আমি এই ছবির শেয়ালের কথা বলিনি। পাহাড়ে একটি শেয়াল আছে, ঠিক এমনিই দেখতে—সেটাকে ধরতে হবে। বড় ক্ষতি ক'রে বেড়াচ্ছে।'

ওয়েল্ বলে: 'পিটার ওটাকে ঠিক ধরে ফেলবে, এখানে আসার আগে তার সঙ্গে আমি ফাঁদ পেতে রেখে এসেছি।'

'কিন্তু তুমিতো জানো না যে শেয়াল পিটারের দশগুণ বেশী চালাক। এমনি শয়তান যে একবার আমি ফাঁদে মাংস রেখে ভেবে-ছিলাম, ওকে এবার ঠিক ধরবো। ও করলো কি, মাংস নিয়ে সরে পড়লো, ধরা পড়লো না। শুধু একখানি পা ওর জখম হয়ে গেল। এবার আর ওকে ফাঁদে ধরা সহজ হবে না। মানুষও ঠেকে শেখে—তবে শেয়ালের বুদ্ধিও মানুষের চেয়ে কম নয়।'

দিদিমা বলেন: 'তাই তো কথায় বলে শেয়ালের মত ধূর্ত।'

একটি পাখির ছবির দিকে চেয়ে ছেলেরা এক সাথে বলে ওঠে: 'ঈগল্, ঈগল্!'

'ঠিক এমনি একটা ঈগল আমি গুলি ক'রে মেরেছিলাম। অতি সুন্দর দেখতে। মারার পর আমার বড় আপসোস হয়েছিলো। তবে কি আর করা? এমনি সুযোগ বড় একটা পাওয়া যায় না। তাছাড়া এক গুলিতেই শেষ। বেচারীকে কষ্টভোগ করতে হয়নি।'

'তাইতো আমি সব সময় বলি,' দিদিমা বলেন।

বারুস্কা জিজ্ঞেস করে : 'আচ্ছা আপনার দুঃখ হয় এসব অসহায় জন্তুগুলিকে মারতে। আমি হলে কখনও এদের গুলি ক'রে মারতে পারতাম না।'

বেয়ার হেসে বলে : 'কিন্তু তোমরা তো তাদের মাথা কেটে ফেল। কোনটা ভাল উপায়—ভয় না দেখিয়ে এক গুলিতে মেরে ফেলা—না, ধরে নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে জবাই করা ?'

বারুস্কা আপত্তি জানায় : 'আমরা কখনও হাঁস মুরগী মারি না। ভোরসার দয়ামায়া নেই, সে-ই ওদের জবাই করে, তবে কষ্ট দিয়ে নয়।'

ছেলেমেয়েরা বসে বসে ছবির বই দেখে। শ্রীমতী প্রশেক সবাইকে খেতে ডাকে।

অন্যান্যবার বেয়ার যখন আসতো, তখন ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন থেকে তার বিশ্রাম ছিল না। পাহাড়ের কথা জিজ্ঞেস করতো তারা—রিবেরছোলের (পাহাড়ের আত্মা) বাগানের কথা, আরো অনেক কিছু। এবার তারা ওরেলকে নিয়ে পড়েছে। বাপের সঙ্গে ওরেলের নানা দুঃসাহসিক অভিযান, শিকারের গল্প তারা শোনে। পাহাড়ের চূড়ায় কি ভাবে বরফ জমে থাকে, কখনও কখনও সেই বরফ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে কি ভাবে এক-একখানি গ্রাম ছেয়ে ফেলে, সব কিছু ঢেকে যায় বরফে। তখন ঘর থেকে বাইরে আসতে পারে না কেউ। বাইরে আসতে হলে তখন বাড়ির চিমনি বেয়ে উঠতে হয়—এমনি সব নানা কাহিনী।

সব শুনেও জন্ নিরুৎসাহ হয় না। তার ইচ্ছা সে বেয়ারের সঙ্গে গিয়ে থাকবে।

ওরেল্ বলে : 'তুমি আমাদের ওখানে এলে ভালই হয়। আমি তখন রিসেন্ পাহাড়ে শিকার-রক্ষকের কাছে চলে যাবো কাজ শিখতে।'

'তুমি না থাকলে, আর গিয়ে লাভ কি ?' মনে মনে বিরক্ত হয় জন্।

'আরও দু'জন শিক্ষানবীশ আছে বাবার কাছে। তুমি একা পড়বে না। তাছাড়া আমার ভাই চেনেক্‌কে পাবে, সে প্রায় তোমার মতই বড়। বোন মারীও তোমাকে অপছন্দ করবে না।'

ছেলেরা উঠোনে বসে ওরেলের গল্প শোনে, আর সে যে স্ফটিক কাচ এনেছে তাই দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। বেয়ার দিদিমার কাছে বন্যা ও এবছরের সব ঘটনা শোনে।

বেয়ার জিজ্ঞেস করে 'রিসেন্‌ পাহাড়ে আমার ভাই আর তার পরিবার সব ভাল আছে তো?'

'হাঁ, তারা ভালই আছে,' জবাব দেয় শ্রীমতী প্রশেক : 'এনি বেশ বড় হয়ে উঠেছে, ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে। আশ্চর্য, যে শিকার-রক্ষক এখনও আসেনি। আজ তার আসার কথা। আজ সকালেও কাজে যাবার সময় এখানে এসেছিলো খবর নিয়ে যে ভিয়েনা থেকে ক্যাসেলে চিঠি এসেছে। ক্যাসেলে গিয়ে শুনলাম যে কাউণ্টেস্‌ ভাল আছে। খুব সম্ভব রাজকুমারী ফসল কাটার উৎসবের সময়ে দু'সপ্তাহের জন্য আসবেন—তারপর ফ্লোরেন্সে চলে যাবেন। আশা করি জনও শীতকালটি এখানেই থাকবে। শুনলাম রাজকুমারী কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন না। এতদিন প্রত্যাশার পর হয়তো এবার আমরা অনেকদিন একসঙ্গে থাকতে পারবো।'

অনেকদিন শ্রীমতী প্রশেক এত কথা বলে নি। আজ স্বামীর আসার খবর শুনে সে বড় সুখী।

দিদিমা বলেন : 'ভগবানকে ধন্যবাদ—কাউণ্টেস্‌ ভাল হয়ে উঠেছে। রোজ ভগবানের কাছে তার নামে প্রার্থনা জানিয়েছি। কালই তো ছেলিয়া এসে কাউণ্টেসের কথা শুনে কি কান্না!'

'কাউণ্টেস্‌ মারা গেলেও তারা কাঁদবে—' মন্তব্য করে শ্রীমতী প্রশেক।

বেয়ার বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে। দিদিমা তখন তাঁর ক্যাসেলে যাবার বিবরণ বলেন। কি ভাবে কাউণ্টেস্ অর্গান-বাজিয়ের পরিবারকে সাহায্য করেছে।

বেয়ার বলে : 'শুনেছি, কাউণ্টেসের বাপকে—' কে যেন দরজায় টোকা দেয়।

'এই যে শিকার-রক্ষক এসেছে। টোকা শুনেই বুঝতে পেরেছি,' শ্রীমতী প্রশেক তাকে ভিতরে আসতে বলে।

দিদিমা বেয়ারের কথার জবাব দিয়ে বলেন : 'লোকের স্বভাবই মন্দ বলা। সূর্যের কাছে গেলেই ছায়া পড়বে এতো জানা কথা। যার মেয়েই হোক না কেন, তাতে কি আসে যায়।'

রিসেন্ পাহাড়ের শিকার-রক্ষক আসতেই বেয়ার তাকে অভিনন্দন জানায়।

তার বন্দুকের দিকে চেয়ে দিদিমা জিজ্ঞেস করেন : 'এত দেরী কেন?'

'আমার মাননীয় অতিথি এসেছিলেন আর কি! কর্মাধ্যক্ষ কিছু কাঠ চাইছে। সে তার প্রাপ্য কাঠ বিক্রি ক'রে দিয়েছে, এখন অগ্রিম কাঠ চাইছে—লোক-ঠকানো ফন্দী আর কি। কিন্তু আমার সঙ্গে তা হবার উপায় নেই। আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছি তার ভালমানুষী দেখে। মিলোর ব্যাপারে তাকে বেশ শুনিয়ে দিলাম—আহা বেচারী! আর ক্রিষ্টিনাকে দেখে সত্যিই দুঃখ হয়।'

'কেন? কি হয়েছে?' বেয়ার জিজ্ঞেস করে। দিদিমা তাকে মিলোর ফৌজে যাবার সব ঘটনা বলেন।

'এই হলো জগতের নিয়ম। যে দিকেই চাই শুধু দুঃখ আর কষ্ট—' বেয়ার মন্তব্য করে।

'দুঃখ কষ্টেই মানুষের আত্মার শোধন হয়—যেমন আগুনে পুড়ে

পুড়ে সোনা খাঁটি হয়। দুঃখ না থাকলে মানুষের আনন্দের অনুভূতি থাকতো না। যদি মেয়েটির জন্য কিছু করতে পারতাম! এখন দেখছি তা প্রায় অসম্ভব। সহ্য ওকে করতেই হবে। কাল মিলো চলে যাবার সময় কি হবে তা ভাবতেও পারছি না।'

শিকার-রক্ষক জিজ্ঞেস করে: 'কালই ওরা চলে যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন? কোথায় যাবে?'

'কোনিগগ্রাটস্-এ।'

'তা হলে আমাদের গন্তব্য স্থান একই। আমি যাবো জলপথে আর ও যাবে স্থলপথে।'

ছেলেরা ছুটে ঘরের মধ্যে বাজার্ড পাখিটা নিয়ে এসে সবাইকে দেখায়। ওরেল্ তার বাবাকে বলে যে সে বাঁধের ধারে পাগলী ভিক্টোরকাকে দেখেছে।'

'এখনও সে বেঁচে আছে?' বিস্মিত হয়ে যায় বেয়ার।

দিদিমা জবাব দেন: 'হাঁ, বেঁচে আছে। তবে মরে গেলেই ভাল হতো। শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। আর তার গান শোনা যায় না—একমাত্র পূর্ণিমার রাত ছাড়া।'

শিকার-রক্ষক বলে: 'কিন্তু এখনও সে বাঁধেব ধারে বসে জলের দিকে চেয়ে থাকে। কালও তাকে দেখেছি, দেখি—উইলো গাছের ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাঁধের জলে ফেলে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম: কি করছো এখানে? জবাব দিল না। আবার জিজ্ঞেস করলাম। আমার দিকে সে চাইলো—তার চোখ জ্বলছে। ভয়ে ভয়ে ভাবলাম, বোধ হয় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু বোধ হয় আমায় চিনতে পেরে চলে গেল। মানুষের সাধ্য নেই তার কিছু করার। দুঃখ হয়, ও মরে গেলেই ভাল হতো। কিন্তু ওকে বাঁধের ধারে না দেখতে পেলে বা রাতে ওর গান শুনতে না পেলে আমার যেন একা একা মনে হয়।'

'কিছু দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাই মনে হয়,' বেয়ার তারের জালে ছাওয়া মাটির পাইপটিতে আগুন দিতে দিতে মন্তব্য করে। তারপর পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে বলে : 'তা মানুষই হোক, বা কোন জন্তুজানোয়ারই হোক, যেখানেই যাই, এই পাইপটিতেও আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমার মা'রও এমনি একটি পাইপ ছিল। এখনও আমি যেন তাঁকে পাইপ মুখে দরজায় বসে থাকতে দেখতে পাই।'

বারুস্কা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে : 'আপনার মা পাইপ খেতেন ?'

'পাহাড়ে অনেক মেয়েরাই ধূমপান করে, বিশেষ ক'রে দিদিমার বয়সের যারা। তবে তামাকের বদলে আলু বা চেরির পাতা দেয়।'

শিকার-রক্ষক তার রং করা পোরসিলেনের পাইপ ভরতে ভরতে মন্তব্য করে : 'তা কি ভাল লাগে ?'

বেয়ার বলে চলে : 'এমনি বনের মধ্যেও আমার অনেক জায়গা আছে যেখানে চলতে চলতে অজ্ঞাতেই আমি থেমে পড়ি। কারও কথা বা কোন ঘটনা নিয়ে এই সব জায়গাগুলি আমার পরিচিত। সেখান থেকে কেউ যদি একটি গাছ বা ছোট ঝোপও কেটে নিয়ে যায় তা আমার নজরে পড়ে। পাহাড়ের উপর একটি ফার্ গাছ আছে। তার আশে-পাশে আর কোন গাছ নেই। পুরোনো ফার্ গাছটির একদিকের ডালপালা পাহাড়ের নীচে ঝুঁকে পড়েছে—পাহাড়ের গায়ে ফার্ণ, জুনিপার গাছের ঝোপ। একটি ছোট ঝরনা এখানে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে গেছে। জানিনা কেন, যখনই আমার জীবনে কোন দুর্ভাগ্য এসেছে, যখনই মন দুঃখে ছেয়ে গেছে তখনই আমি এখানে এসে হাজির হয়েছি। এই পথ দিয়েই আমি আমার ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তার বাপ মা কিছুতেই বিয়েতে রাজী ছিলেন না। অবশেষে অবশ্য তাঁরা মত দিয়েছিলেন। আমার বড় ছেলে যখন মারা যায়,

মা যখন মারা যান, তখনও উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে এই ফার গাছটির কাছে এসে পড়েছি। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে চূড়াগুলি একটি একটি ক'রে আমার নজরে আসে—আমার মন থেকে যেন দুঃখ গলে পড়ে চোখের জলে। গাছটিকে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ধরি, মনে হয় যেন তারও প্রাণ আছে, সেও আমার দুঃখ অনুভব করে—গাছের পাতাগুলি তাদের মর্মর শব্দে আমায় দুঃখ জানায়।'

অনেক্ষণ চুপ ক'রে থাকে বেয়ার। তার পাইপের ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে উপরে ওঠে ছাদের দিকে, যেন মূর্তিমান চিন্তা।

রিসেন্ পাহাড়ের শিকার-রক্ষক বলে: 'আমারও অনেক সময় এরকম হয়েছে, মনে হয়েছে যেন গাছেরও জীবন আছে, তাদেরও অনুভূতি আছে। কয়েক বছর আগেকার কথা আমি কয়েকটি গাছ কেটে ফেলার জন্য মার্কা মেরে রেখেছি। কাঠুরে এসেছে গাছ কাটতে। একটি সুন্দর বার্চগাছ—এতটুকু খুঁত নেই—যেন একটি কুমারী কন্যা দাঁড়িয়ে। গাছটির দিকে চাইলাম, মনে হলো গাছটি যেন আমার পায়ে নুয়ে পড়ছে, ডালপালাগুলি আমায় জানাচ্ছে আলিঙ্গন। কে যেন আমায় কানে বলে গেল: "কি করেছি আমি তোমার—আমায় কেন হত্যা করছো?" দেখতে দেখতে কাঠুরের করাত তার দেহে প্রবেশ করলো। মনে নেই আমি চিৎকার ক'রে উঠেছিলাম কিনা। তবে কাঠুরেদের বারণ করলাম গাছটি কাটতে। তারা তাকালো আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে। তখন লজ্জা পেয়ে আমি বনের মধ্যে চলে গেলাম। অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম বনের মধ্যে। মনের মধ্যে শুধু এক চিন্তা যে বার্চ গাছটি আমার কাছে জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলো। আবার সেখানে ফিরে এসে দেখি গাছটি মাটিতে পড়ে আছে—একটি পাতাও নড়ছেনা—যেন একটি মৃতদেহ। আমার মনে তখন অনুতাপ, যেন আমি খুন করেছি।

কয়েকদিন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলাম—কাউকে বলিনি একথা। আজ না বললে এ ঘটনা আর কোনদিনই কেউ জানতো না।'

'এমনি এক ঘটনা আমার জীবনেও ঘটেছিলো,' বেয়ার ক্ষুব্ধস্বরে আরম্ভ করে: 'বনে গিয়েছি শিকার করতে। মনিবের জন্য শিকার আনতে হবে। একটি ছোট হরিণ এসে পড়লো আমার পথে। সুন্দর দেখতে—এমন মসৃণ গাখানি তার, দেখে মনে হয়, কেউ যেন চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে। এদিক ওদিক চেয়ে, নাচতে নাচতে হরিণটি ঘাস খায়। দেখে আমার দয়া হয়। আবার ভাবলাম—কি বোকা আমি! গুলি ছুড়লাম—কিন্তু আমার হাত কেঁপে গেল। হরিণটি জখম হয়ে পড়ে গেল। আমার কুকুরটি ছুটলো শিকারের কাছে। আমি তাকে ডেকে আনলাম। কে যেন আমায় বললে—আর ওকে কষ্ট দিয়ো না। কাছে এসে দেখলাম: হরিণটি আমার দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে আছে—কি বিষাদময় অনুনয়ের চাউনি! তা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। ছুরিখানা খুলে তার বুকে আমূল বসিয়ে দিলাম। একটু নড়ে উঠেই সে মরে গেল। আমি কেঁদে উঠলাম। সেই থেকে বলতে লজ্জা নেই—'

'বাবা কখনও হরিণ মারেননি,' ওয়েল্ কথাটি শেষ ক'রে দেয়।

'সত্যিই তাই। যখনই আমি বন্দুক নিশানা করি, তখনই সেই আহত হরিণটির করুণ নয়ন দুটি আমার সামনে ভেসে ওঠে। ভয় হয় আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে—শুধুই জখম হবে। তাই আমি আর হরিণ শিকার করি না।'

জলভরা চোখে উইলি বলে ওঠে: 'দুষ্টু জানোয়ারই শুধ্ মারা উচিত। ভাল যারা তাদের ক্ষতি করতে নেই।'

'ভাল জন্তুদের দোষ আছে। আবার দুষ্টু যারা তাদের কিছুনাকিছু গুণ আছে। এ ঠিক মানুষেরই মত। যদি ভাবি যে, সব জন্তু দেখতে

ভাল, তারা ভাল, আর যারা কদাকার তারা মন্দ, তা হলে খুব ভুল হবে। মুখ দেখে বিচার করা ঠিক নয়। একবার আমি কোনিগ্‌গ্রোটস্‌-এ দুটি আসামীর ফাঁসি দেখতে গিয়েছিলাম। একজন দেখতে সুপুরুষ আর একজন কদাকার। প্রথমজন তার বন্ধুকে খুন করেছে, কারণ তার সন্দেহ, বন্ধু তার প্রেমিকাকে পথভ্রষ্ট করেছে। দ্বিতীয়জন আমাদের তল্লাটের লোক। তাকে জিজ্ঞেস করলাম তার যদি কোন খবর বা কাউকে কিছু বলার থাকে আমাকে বলতে পারে। সে আমার দিকে চেয়ে পাগলের মত হেসে উঠে মাথা নেড়ে বললে: খবর পাঠাবো? কাকে? কাউকে আমি চিনি না! মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে রইল। তারপর সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আমার সামনে এসে বললে: আমার একটা কাজ করবে?—নিশ্চয়ই, আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। তখন তার মুখে এমন এক বিষাদের ছায়া যে আমি হয়তো তার জন্য সবকিছুই করতে পারতাম। তার মুখের অপ্রীতি-কর বা ঘৃণাজনক ভাব মুছে গেছে। তার পরিবর্তে সে যেন দয়া আর সহানুভূতি উদ্রেকের এক প্রতিচ্ছবি। সে হয়তো আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল, তাই আমার হাতখানি ধরে চাপ দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো: যদি আজ থেকে তিন বছর আগে তুমি আমার দিকে এমনি হাত বাড়িয়ে দিতে, তাহলে আজ আমি এখানে আসতাম না। বলতে পারো কেন দেখা করোনি আমার সঙ্গে? আর যাদের সঙ্গেই আমি মিশতে গিয়েছি, তারা আমায় ঘৃণা করেছে, আমার মুখ দেখে ঠাট্টা করেছে, অপমান করেছে। আমার ভাই আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে আর আমার বোন, সে আমায় দেখে লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিতো। ভেবেছিলাম যে আমায় ভালবাসে—যার জন্য আমায় জীবনপাত করতেও প্রস্তুত ছিলাম—যার হাসির জন্য আমি আকাশের তারাও এনে দিতে পারতাম—সেও আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করলো। তাকে

যখন জিজ্ঞেস করতে গেলাম, সে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে কুকুর লেলিয়ে দিলে! বলতে বলতে সেই কদাকার লোকটি শিশুর মত কেঁদে উঠলো।...

'তারপর চোখ মুছে, আমার হাত ধরে সে শান্তভাবে বললো: তুমি যখন যাবে তখন উপত্যকা ধরে পাহাড়ের উপর দিয়ে যেয়ো। সেখানে একটি ফার্ গাছ আছে, আর কোন গাছ নেই। গাছটিকে আমার অভিবাদন জানিয়ো, সেখানে পাখির ঝাঁক আর পাহাড়ের চূড়াগুলিকে জানিয়ো আমার অভিনন্দন। এই গাছটির নীচে অনেক রাত আমার কেটেছে, আমার অনেক কথা বলেছি তাকে...আর কিছু সে বললো না। আমার দিকে চাইলো না আর ফিরে।...

'জেল থেকে ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলাম। লোকে তাকে শাস্তি দিয়েছে, জানোয়ার বলেছে, বলেছে শয়তানের মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য। এমনকি মৃত্যুর পূর্বেও তার কাছে পাদ্রী পর্যন্ত আসবে না। সুপুরুষ লোকটির জন্য সবারই দুঃখ। তাদের ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করা হোক,—কারণ সে যে খুন করেছে তা একমাত্র ঈর্ষাবশে। আর কদাকার লোকটি যে মেয়েটিকে গুলি করেছে তা একান্ত বিদ্বেষপরায়ণ হয়েই—মেয়েটির কোন দোষই ছিল না।...

'যার যেমন অনুভূতি তার তেমন বিচার। নানা মুনির নানা মত। একমাত্র ভগবানই সবকিছু জানতে পারেন। তিনিই কেবল মানুষের মনের সবকথা জানতে পারেন। জন্তুজানোয়ারের ভাষা তিনি জানেন—ফুল তাঁর আদেশেই ফোটে, গাছের পাতা তাঁর আদেশেই মর্মরধ্বনি করে। নদীকেও তিনি পথ বলে দেন।'

বেয়ার অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তার পাইপ নিভে গেছে। চোখ দুটি তার সজীবতাদীপ্ত। মুখখানি দেখে মনে হয় যেন পাহাড়ের উপত্যকা শরতের স্নিগ্ধ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। উপত্যকার

তখনও সবুজ গাছপাতা, রঙীন ফুল—আর পাহাড়ের চূড়া বরফ ঢাকা। সবাই তার দিকে ফিরে চায়। দিদিমা বলে ওঠেন :

'ঠিকই বলেছেন আপনি। সবাই তাই আপনার কথা শুনতে চায়—এ যেন ধর্ম উপদেশ। কিন্তু ছোটরা এবার শুতে যাও। আপনার ছোট ছেলেটিও এতদূর চলার পরে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। আপনিও শুয়ে পড়ুন। কাল আবার আমাদের কথা হবে।'

শিকার-রক্ষক ওরেলকে বলে : 'তোমার 'বাজার্ড'টা আমায় দিয়ে দাও। আমার পেঁচার খাবার হবে।'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দেয় ওরেল্।

ছেলেরা অনুনয় ক'রে বলে : 'কাল সকালে আপনার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো আমরা।'

'কিন্তু তোমাদের যে স্কুলে যেতে হবে।'

মা জবাব দেয় : 'আমি ওদের বলেছি, কাল ওদের ছুটি। ওরেল্ এসেছে, তার সঙ্গে গল্প করবে।'

বেয়ারের সঙ্গে করমর্দন ক'রে শিকার-রক্ষক হেক্টারকে ডেকে বিদায় নেয়।

সকালে ছেলেদের জামা কাপড় পরার আগেই ওরেল্ নদীর ধারে গিয়ে ভাসমান কাঠের উপর চড়ে বসে। প্রাতঃরাশের পর বেয়ার ছেলেদের সঙ্গে ক'রে শিকার-রক্ষকের বাড়ি যায়। দিদিমা বারুস্কা ও আডেল্‌কাকে নিয়ে সরাইখানায় যান মিলোকে বিদায় দেবার জন্য। সরাইখানায় এরই মধ্যে লোক জমে উঠেছে—বাপ, মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই এসেছে বিদায় দিতে। একে অন্যকে সাহস দেয়—তবে যুবকেরা কেউই অতিরিক্ত পান করেনি। টুপিতে নানারকমের গাছের ডালপালা দিয়ে সাজিয়ে, তারা গান গেয়ে নিজেদের ভাবনা চিন্তা বা ভয় ভুলতে চেষ্টা করে। কেউ কেউ গর্ববোধ করে বন্ধুদের

মন্তব্য শুনে : এমনি ফার্ গাছের মত লম্বা, ইস্পাতের তৈরি দেহ নিয়ে ও আর ফিরে আসতে পারবে না! এমন সৈনিককে কেউই ছেড়ে দেবে না। এমনি ধরনের নানা মিষ্টি কথায় তিক্ততা কেটে যায়। এমনকি যারা সৈন্য হয়েছে তাদের প্রশংসা শুনে শুনে যাদের ফৌজে যোগ দিতে হয়নি তারাও লজ্জা পায়। তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য হয় : 'তোমার মার আর ভাবনা কি?'

দিদিমা সরাইখানায় এলেন। ঘরের মাঝে গেলেন না তিনি—শুধু গুমোট বলে নয়, তাঁর মুখেও এক বিষাদের ছায়া পড়েছে। দুঃখী মায়েদের মনের অবস্থা তিনি জানতেন। কেউ নিঃশব্দে বসে কাঁদছে, কেউবা দুঃখে আর্তনাদ করছে। যেসব মেয়েরা লজ্জায় তাদের চোখের জল ঢাকতে গিয়েও ঢাকতে না পেরে তাদের প্রেমিকের শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে আছে, যেসব ছেলেরা বেশী পান করার দরুন হতাশ হয়ে পড়েছে, গান গাইতে গিয়েও গাইতে পারছে না, সকলেরই অনুভূতি তিনি উপলব্ধি করছেন। বাপের দল মুখ বুঁজে টেবিলে বসে আছে। তাদের চিন্তা—এসব ছেলেরা যারা তাদের ডান হাতের তুল্য, তাদের ছাড়া চলবে কি ক'রে? তাদের ছেড়ে চোদ্দ বছর বাঁচবে কি ক'রে। দিদিমা নাতনীদের নিয়ে বাগানে বসলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্রিষ্টিনা বেরিয়ে এল। কেঁদে কেঁদে তার চোখ ফুলে উঠেছে। কি যেন বলতে গেল সে, কিন্তু তার বুকে যেন পাথর চাপা—মুখ দিয়ে কোন কথাই আসে না। একটি ফলন্ত আপেল গাছের ডালে সে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই গাছটির উপর দিয়েই সে সেণ্টজনের ইভে ফুলের মালা ছুড়ে দিয়েছিল। আজ যখন তার আশা সফল হবার কথা, তখনই কিনা তার প্রেমিককে বিদায় দিতে হচ্ছে! মুখ ঢেকে সে কাঁদতে থাকে। দিদিমা তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন না। মিলো এলো। তার সে-মুখচোখ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। যেন

প্রস্তর মূর্তি। নিঃশব্দে সে দিদিমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। তারপর তার ভালবাসার পাত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে, পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে তার দু' চোখের জল মুছে দেয়। রুমালখানি ক্রিষ্টিনার ভালবাসার উপহার। দুজনের কেউ একটি কথাও বলে না। ক্ষীণকণ্ঠে সরাইখানা থেকে গানের একটি সুর শোনা যায়—

প্রিয়ে তোমায় যেই ছেড়ে যাবো
দুটি অন্তর ভেঙ্গে যাবে।
দুটি বিশ্বাসী অন্তঃকরণ, আর চারিটি নয়ন,
দিবারাত্র দুঃখে কাঁদবে—'

ক্রিষ্টিনা দু'হাতে মিলোকে ধরে কাঁদতে কাঁদতে তার বুকে মুখ লুকায়। এই গানের সুর দুজনার বুকেই বেজে ওঠে।

দিদিমা উঠে পড়েন। দু'চোখে তাঁর জল ঝরছে। বারুস্কাও কাঁদছে। মিলোর কাঁধে হাত রেখে দিদিমা ধরা গলায় বলেন :

'জ্যাকব, ভগবান তোমায় সান্ত্বনা দেবেন। মন দিয়ে তোমার কাজ করো, তাহলে বেশী কষ্ট মনে হবে না। ভগবান করেন তো, আর আমার চেষ্টা যদি সফল হয়, তাড়াতাড়ি তুমি ফিরে আসবে।' এই বলে দিদিমা ক্রুশ এঁকে আশীর্বাদ ক'রে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, নাতনীদের হাত ধরে বাড়ির পথে এগোন।

প্রেমিক যুগলের মনে দিদিমার আশ্বাস যেন মুমূর্ষু ফুলের উপর শীতল শিশিরকণা ছিটিয়ে দেওয়ার মত। দু'জন আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একখানি গাড়ি আসার শব্দ শোনা যায়। সৈন্যদের গাড়ি। সরাইখানা থেকে কে নাম ধরে ডাকে : 'মিলো—ক্রিষ্টিনা।' তাদের কানে সে শব্দ যায় না। কেনই বা তারা গ্রাহ্য করবে? সারা পৃথিবীই বা কি তাদের কাছে? পরস্পরের বাহুপাশেই তাদের সারা জগত।

বিকালবেলা বেয়ারও বিদায় নেয়। শ্রীমতী প্রশেক প্রথামত বেয়ার

ও তার ছেলের জন্য পথের খাবার বেঁধে দেয়। ছেলেরা সবাই ওরেলকে একটা কিছু মনে রাখার উপহার দেয়। বারুস্কা দেয় তাকে একটি টুপির ফিতে। আডেল্‌কা দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে সে কি দেবে। দিদিমা বলেন কাউন্টেস্ যে গোলাপটি দিয়েছিলেন সেটা দিতে।

'কিন্তু দিদিমা, তুমি বলেছিলে ওটা রেখে দিতে। বড় হয়ে আমি বেল্টের সঙ্গে পরবো।'

'যা তোমার ভাল লাগে তাইতো বন্ধুকে দিতে হয়।'

আডেল্‌কা সুন্দর গোলাপটি ওরেলের টুপিতে পরিয়ে দেয়।

বেয়ার বলে: 'আডেল্‌কা, না জানি কতদিন তোমার গোলাপের সৌন্দর্য বজায় থাকবে। ওরেল্ পাহাড়ে পাহাড়ে ঝড়ে জলে ছুটে বেড়ায়।'

আডেল্‌কা তখন ওরেলের দিকে চায়।

উপহারটির দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখে ওরেল্ বলে:

'তা নয় বাবা। পাহাড়ে যাবার সময় গোলাপটি আমি রেখে যাবো। কেবল রবিবার আর ছুটির দিনে পরবো।'

শুনে সুখী হয় আডেল্‌কা। কেউ ভাবেনি যে আডেল্‌কাই একদিন গোলাপ হয়ে ফুটে উঠবে, আর সেই গোলাপের জন্য ওরেল্ উতলা হয়ে উঠবে তাকে বরফঢাকা পাহাড়ে তুলে নিয়ে যাবার জন্য। তার প্রেমই হবে তার জীবনের আশীর্বাদ, জীবনের আলো।

পনেরো

'পেন্‌টেকাট' ছুটির দিন শেষ হয়ে গেল। দিদিমা বলতেন: 'সবুজ ছুটির দিন'। ঘরে বাইরে সর্বত্রই সবুজ পাতায় ছাওয়া। 'করপাস ক্রিষ্টি' ও 'সেণ্ট জন্ ব্যাপটিস্ট' উৎসব শেষ হয়ে গেছে। ঝোপের মধ্যে আর

নাইটেঙ্গলের গান শোনা যায় না—ঘরের চালে চড়ুই পাখি তাদের বাচ্ছাদের নিয়ে ব্যস্ত। উনুনের ধারে বিড়ালটি তার বাচ্ছা নিয়ে বসে থাকে—আডেল্‌কা তাকে আদর করে। কালো মুরগীটি তার ছানা নিয়ে চরে বেড়ায়। সুলতান্ ও টাইরল্ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইঁদুর ধরে। তাই দেখে অনূঢ়া মেয়েরা গল্প করে, যে পুরোনো বাড়ির পারে জলদেবতা এসেছে।

স্ট্রচ্‌কা মাঠে চরতে যায় আর আডেল্‌কা দেখতে যায় তাকে ভোরসার সঙ্গে। কখনওবা সে দিদিমার সঙ্গে ওষুধের শিকড় কুড়োতে যায়—বা লিনডেন্ গাছের নীচে গিয়ে বসে তাঁর সঙ্গে। এখানে বসেই সে দিদিমাকে তার পড়া বলে। বিকালে স্কুল থেকে ফেরার পথে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মাঠের পথে দিদিমা তাঁর শন্ ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখেন, কেমন ফসল হয়েছে। গমের ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকতেন দিদিমা। শীষগুলি পেকে প্রায় হলুদ হয়ে গেছে—তার উপর দিয়ে যেই বাতাস বয়ে যায়, চোখে ভেসে ওঠে এক মনোরম দৃশ্য, চোখ ফিরিয়ে আনা যায় না। ক্ষেতে কুডারনার সঙ্গে দেখা হতেই দিদিমা বলতেন :

'ভগবান যেমন ফসল দিয়েছেন, তিনিই যেন আবার তাদের রক্ষা করেন।'

আকাশের দিকে চেয়ে সে জবাব দিত : 'সত্যিই আশঙ্কার কথা, কদিন থেকে যা গরম পড়েছে।'

মটর ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সে আডেল্‌কাকে কাঁচা মটর তুলে দিত। মনে মনে ভাবতো—রাজকুমারী আর কি বলবেন, প্রশেকদের ছেলেমেয়েরা তো তাঁর বড় প্রিয়।

বারুস্কা আর স্কুল থেকে আডেল্‌কার জন্যে 'গাম' বা 'যষ্টিমধু' নিয়ে আসে না। স্কুলের সামনে একটি স্ত্রীলোক চেরী বিক্রি করে, তার কাছ

থেকে চেরী নিয়ে আসে, বা ওক্‌গাছের বন দিয়ে আসতে আসতে ছোট বোনের জন্য ষ্ট্রবেরী তুলে আনে। এর জন্য সে বার্চ গাছের ছাল দিয়ে একটি ঝোলা বানিয়ে নিয়েছে। কখনও বা সে হাকেল্‌ বেরী বা হাজেল্‌ নাট্‌ নিয়ে আসে। দিদিমা ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে আনেন— ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে দেন কি ক'রে বিষাক্ত ও আহার্যের পার্থক্য বুঝতে হয়। জুলাই মাস শেষ হয়ে গেল। আগষ্টের প্রথমেই রাজ-কুমারী আসবেন, আর আসবে ছেলেমেয়েদের বাবাও। ছেলেমেয়েদের আরও আনন্দ যে স্কুলের ছুটিও এসে গেছে।

শ্রীমতী প্রশেক ক্যাসেলে গিয়ে সবকিছু পরিপাটি ক'রে রাখে, বাগানের মালি ছুটোছুটি ক'রে বাগানের পরিচর্যা করে, রাজকুমারী আসার আগে যেন সুন্দর হয়ে ওঠে বাগানটি। সর্বত্রই রাজকুমারীর আসার জন্য প্রস্তুতি চলেছে। রাজকুমারী আসায় যাদের প্রাপ্তিযোগ তাদের আনন্দ, আর অনেকেরই মনে কিন্তু বিরক্তিভাব। কর্মাধ্যক্ষের মনও বিরক্ত। দিনে দিনে সে ভারি বিনয়ী হয়ে পড়ছে। যেদিন খবর আসে যে রাজকুমারী পরের দিনই আসবেন, সেদিন কর্মাধ্যক্ষ যেন বিনয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে যায়। বনরক্ষকের অভিবাদনেও সে সবিনয়ে প্রত্যুত্তর দেয়। শীতকালে কিন্তু তার হাবভাব দেখে মনে হতো যেন সে-ই এই জমিদারীর কর্তা।

দিদিমা সর্বদাই রাজকুমারীর মঙ্গল চিন্তা করতেন। প্রশেকের আসা যদি রাজকুমারীর ওপর নির্ভর না করতো তা'হলে রাজকুমারীর আসা বা না-আসা নিয়ে তিনি মোটেই মাথা ঘামাতেন না। এবার কিন্তু তাঁর অধৈর্য প্রকাশ পায়।

আগষ্ট মাসের প্রথমেই ফসল কাটা সুরু হয়। রাজকুমারী তাঁর অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হন। কর্মাধ্যক্ষের মেয়ে ইটালিয়ানটির আশা করেছিল, কিন্তু সে এবার ভিয়েনায় থেকে গেছে।

স্বামীর আগমনে শ্রীমতী প্রশেকের মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল।
দিদিমার মুখে একটু দুঃখের ছাপ—ইয়োহানা জনের সঙ্গে আসেনি।
জন্ একখানি চিঠি নিয়ে এসেছে, তাতে মেয়ে লিখেছে যে
কাকার অসুখের জন্য সে আসতে পারেনি—খুড়িমাকে একা ফেলে এ
অবস্থায় কি ক'রে সে আসে। তার ভালবাসার পাত্রের কথা উল্লেখ
ক'রে লিখেছে যে খুড়িমার তাকে বড় পছন্দ, একমাত্র দিদিমার মতের
অপেক্ষায় আছে। 'বিয়ের পর যত সম্ভব শীঘ্র আমরা বোহেমিয়ায়
আসবো, মা তোমার আশীর্বাদ নিতে। সে সময় ওকে তুমি দেখতে
পাবে। আমরা ওকে জুরা বলে ডাকি। ও বেহেমিয়ার লোক নয়।
তুর্কী সীমানায় ওর বাড়ি। তবে ওকে আমি বোহেমিয়ান শিখিয়েছি,
তোমার সঙ্গে ও কথা বলতে পারবে। আমাদের দেশের কাউকে
বিয়ে করলেই ভাল হতো, তাতেই তুমি সুখী হতে বেশী। কিন্তু মা, কি
করবো ? মনকে তো আর বাধ্য করা যায় না।' চিঠির শেষ এখানে।

থেরেসা চিঠিখানি পড়লো। জন্ বললো : 'জুরাকে আমি দেখেছি
—সত্যিই ইয়োহানার উপযুক্ত।'

দিদিমা চোখের জল মুছে চিঠিখানি হাতে ক'রে চলে গেলেন।

ছেলেমেয়েরা বাপকে পেয়ে বড় খুশি। তাদের কথার আর শেষ
হয় না। সারা বছরের ঘটনার ইতিবৃত্ত তারা শোনায়, যদিও মার
চিঠিতে বাবা সবই জানতে পেরেছে। বাবার দাড়িতে হাত দিয়ে
আডেল্‌কা বলে : 'বাবা এবার সারাটা শীত তুমি আমাদের সঙ্গে
থাকবে, তাই না ?'

উইলি বলে ওঠে : 'বাবা তুমি আমাদের স্লেজে চড়িয়ে নিয়ে যাবে
তাই না ? ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাজবে। একবার আমরা গিয়েছিলাম
শহরে স্লেজে চড়ে, দিদিমা, মা সবাই। ঘোড়ার গলার শব্দ শুনে সবাই
এসে চেয়ে চেয়ে দেখে।'

বাপ জবাব দেবার আগেই জন্ সুরু বরে : 'বাবা আমি বড় হয়ে শিকার-রক্ষকের কাজ করবো। স্কুল শেষ হয়ে গেলেই আমি বেয়ারের কাছে কাজ শিখতে যাবো।'

বাপ হেসে জবাব দেয় : 'বেশ তাই হবে। তবে স্কুলে তোমাকে মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে।' ছেলের স্বাধীন মতে তার বাধা দেওয়ার ইচ্ছা হয় না।

প্রশেকের বন্ধু মিলার ও শিকার-রক্ষক দেখা সাক্ষাৎ করতে এল। সারাটি বাড়ি আজ আনন্দে ভরপুর। এমনকি সুলতান্ ও টাইরল্ কুকুর দুটিও ছুটে হেক্টারের সঙ্গে দেখা করতে যায় যেন তাকে কি খবর দেবার আছে। প্রশেকও কুকুর দুটিকে ভালবাসতো। হাঁসের বাচ্চাদের খেয়ে ফেলার জন্য তাদের সাজা দেবার পর তারা আর মার খায়নি। তারা কাছে আসতেই সে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। তাই দেখে দিদিমা বলেন : 'ওরাও জানে কে ওদের ভালবাসে।'

শিকার-রক্ষকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করে : 'কাউণ্টেস্ ভাল আছে তো?' সেও এসেছে প্রশেকের সঙ্গে দেখা করতে।

'লোকে বলে ভাল আছে। তবে আমার কিন্তু মনে হয় সে ভাল নেই,—তার মনে যেন কিসে ভর করছে। বরাবরই কাউণ্টেসের কোমল স্বাস্থ্য—এবার যেন দেখে মনে হয়, তার আত্মাটিই শুধু আছে। রাজকুমারীও চিন্তা এবং দুঃখে আচ্ছন্ন। কাউণ্টেসের অসুখের পর আর বাড়িতে কোন আনন্দ উৎসব হয়নি। অসুখের ঠিক আগে এক কাউণ্টের সঙ্গে কাউণ্টসের বিয়ে পাকা হবার কথা হয়েছিলো। রাজকুমারীও রাজী ছিলেন। জানি না কি ব্যাপার!' প্রশেক মাথা নেড়ে কথা শেষ করে।

'হোরটেন্‌সে কি কাউণ্টকে ভালবাসে?' দিদিমা জিজ্ঞেস করেন।

প্রশেক জবাব দেয় : 'কে জানে? কাউণ্টেস্ যদি আর কাউকে

না ভালবেসে থাকে তবে কাউণ্টকে ভালবাসার চেষ্টা করতে পারে। কাউণ্ট বড় সুপুরুষ।'

প্রশেকের দিকে নস্যির কৌটো এগিয়ে দিয়ে মিলার বলে : 'কাউণ্টেস্ যদি আর কাউকে না ভালবেসে থাকে—রুচি নিয়ে ঝগড়া চলে না।' ক্রিষ্টিনার দিকে চেয়ে সে কথা শেষ করে।

ক্রিষ্টিনার মলিন মুখের দিকে চেয়ে প্রশেক বলে : 'থেরেসার চিঠিতে তোমাদের কথা জানতে পেরে বড় দুঃখ পেয়েছি। মিলো কি কিছুটা শান্ত হয়েছে এখন?'

জানালার দিকে চেয়ে চোখের জল আড়াল করবার চেষ্টা করতে করতে ক্রিষ্টিনা জবাব দেয় : 'কি আর করবে সে। মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?'

শিকার-রক্ষক মন্তব্য করে : 'তা ঠিক। 'সোনার খাঁচায় আটকে রাখলেও পাখি বনেই উড়ে যেতে চায়।'

দুষ্টু হেসে মিলার বলে : 'যদি তার সঙ্গিনী তার জন্য বনে অপেক্ষা ক'রে থাকে।'

'আমিও ফৌজে ছিলাম,' প্রশেক হেসে তার স্ত্রীর দিকে চায়। স্ত্রীও হেসে জবাব দেয় : 'কি বীরই ছিলে তুমি!'

'হেসোনা থেরেসা—তুমি আর ডরথি খুড়ী যখন আমাদের ড্রিল দেখতে এলে তখন দুজনেই কেঁদেছিলে।'

'তুমিও,' শ্রীমতী প্রশেক হেসে ওঠে : 'তবে তখন আমাদের যারা দেখেছিল তারা ছাড়া আর কারও হাসির মনোভাব ছিল না।'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমি বীরই হই বা ভীরুই হই, আমার বীর হবার ইচ্ছে নেই। চোদ্দদিন ফৌজে আমার কেটেছে চোখের জল আর হা-হুতাশে। ঘুম হয়নি, খেতেও পারিনি। যখন ছাড়া পেলাম তখন আমি কঙ্কালসার।'

'মাত্র চোদ্দ দিন ফৌজে ছিলে—মিলো যদি দিনের বদলে বছর গুনতে থাকে তার সঙ্গে তোমার মিল হবে,' মিলার মন্তব্য করে।

'আগে যদি জানতাম যে আমার এক বন্ধু আমায় টাকা দিয়ে খালাস করার চেষ্টা করছে আর আমার ভাই আমার বদলে ফৌজে আসার জন্য উৎসুক, তাহলে আর আমাকে এত মনোকষ্ট ভোগ করতে হতো না। আমি তাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার ভাই ফৌজে আসার জন্য ব্যগ্র। তবু আমি যে কাপুরুষ তা মনে করি না। বাড়িতে কোন কিছুর সামনে এগিয়ে আসতে হলে আমিই ছিলাম প্রথমে। তবে সকলের সব কাজে পোষায় না। তাই না থেরেসা?'

এই বলে প্রশেক থেরেসার কাঁধে হাত রেখে তার দুচোখের দিকে চায়।

'হাঁ জন্ তুমি ঠিকই বলেছো,' দিদিমা মেয়ের হয়ে জবাব দেন।

সবাই যখন যাবার জন্য উদ্যোগ করছে ক্রিষ্টিনা চুপি চুপি দিদিমার ঘরে এসে বুকের মধ্য থেকে একখানি চিঠি বের ক'রে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে: 'জ্যাকবের কাছ থেকে এসেছে।'

'কি লিখেছে?' জিজ্ঞেস করেন দিদিমা।

ক্রিষ্টিনা চিঠিখানি খুলে ধীরে ধীরে পড়ে:

"প্রিয়তমা ক্রিষ্টিনা, তোমায় সহস্র চুম্বন। হায়! তোমায় যদি কাগজে সহস্র চুম্বনের বদলে সত্যিকারের একটি চুমো জানাতে পারতাম। আজ আমাদের মধ্যে অনেক দূরত্ব—তোমার কাছে আর আসতে পারি না। জানি তুমি ভাবছো 'জ্যাকব কেমন আছে? কি করছে সে?' অনেক কিছুই আছে আমার করার। কিন্তু কি সে কাজ? দেহ দিয়ে কাজ করি, মন পড়ে থাকে অন্যত্র। আমি যদি একা হতাম তাহলে এই জীবনই আমার সহ্য হয়ে যেত। সত্যিই

আমার বন্ধুদের হয়তো বেশীদিন আর এই কাজ খারাপ লাগবে না। আমিও শিখছি, তবে কোন কিছুতেই প্রেরণা পাই না। সারাদিনই তোমার কথা চিন্তা করি—যদি শুধু জানতে পারি তুমি ভাল আছ তা হলেই আমি খুসী। যখন দেখি পাখির ঝাঁক আমাদের গ্রামের দিকে উড়ে চলেছে, ভাবি ওরা যদি কথা কইতে পারতো তাহলে আমার প্রেমিকার কাছে আমার শুভেচ্ছা পাঠাতাম। তা না হয়ে আমিই যদি পাখি হতাম তাহলেও তোমার কাছে উড়ে যেতে পারতাম। দিদিমা কি কিছু বলেছেন? তুমি কি কিছু জানো? বিদায়ের সময় যে তিনি বলেছিলেন—এ বিচ্ছেদ বোধহয় বেশীদিন থাকবে না—কি মনে ছিল তাঁর? যখনই আমি বড় হতাশ হয়ে পড়ি, তখনই দিদিমার এই কথা চিন্তা করি। দিদিমা তো কখনও অর্থহীন কথা বলেন না। আমায় কয়েক লাইন লিখো—কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিও—যা মনে আসে তোমার। এখানেও ফসল কাটা শুরু হয়েছে। যখন দেখি সবাই ফসল কাটতে চলেছে, মনে হয় সব ফেলে ছুটে পালাই। ক্রিষ্টিনা, কখনও তুমি একা একা জমির রায়তদের নিকট জমিদারের প্রাপ্য কাজে যেয়ো না। সবাই তোমায় জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে মনে কষ্ট দেবে…।'

ক্রিষ্টিনা ভ্রূকুটি করে ওঠে: 'কি বোকা! আমায় ও ভাবে কি?' আবার সে পড়ে চলে: "টমেসের সঙ্গে সঙ্গে থেকো। আমি আসার আগে তাকে বলে এসেছি, সে তোমায় সাহায্য করবে। তাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো—এনাকেও। সবাইকে, দিদিমাকে, ছেলেমেয়েদের আমার কথা বলো। এতো লিখবার আছে যে তা পাহাড়ের আকারের একখানি কাগজ ভরে যাবে। এবার আমি আসি, পাহারায় যেতে হবে। রাতে আমি যখন পাহারায় থাকি তখন গান গাই —

'আকাশের তারা তুমি কি সুন্দর, কিন্তু কত ছোট!'

মনে আছে তোমার, আসবার আগের দিন আমরা একসাথে গেয়েছিলাম। তুমি কেঁদে উঠলে। হায় ভগবান! এই তারার দল আমাদের কত সাহস জুগিয়েছে—আর কি তারা আমাদের সাহস দেবে মনে? ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। বিদায়!"

চিঠিখানি ভাঁজ ক'রে রেখে ক্রিষ্টিনা দিদিমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

'মনকে সান্ত্বনা দে মা। জ্যাকব্ ভাল ছেলে। তাকে আমার আশীর্বাদ জানাস। বলিস্ ভগবানে বিশ্বাস রাখতে। অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্য ওঠে। তার জীবনেও সূর্য উঠবে। তোকে এখন কোন কথাই বলতে পারছি না—আমি নিজেই জানি না। প্রয়োজন হলে তুইও ফসল কাটার সময় যাবি। ফসল কাটার উৎসবে আমি চাই তুই রাজকুমারীর গলায় মালা পরিয়ে দিবি। তাঁর ক্ষেতেই যখন কাজ করবি তখন এ তোরই যোগ্য কাজ।'

আশ্বস্ত হয়ে ক্রিষ্টিনা কথা দেয় সে দিদিমার কথামত সব কিছুই করবে। প্রশেক আসার পর দিদিমা অনেকবারই জিজ্ঞেস করেছেন—রাজকুমারী কখন বাড়ি থাকবেন—কোথায় যাবেন তিনি।

প্রশেক আশ্চর্য হয়ে ভাবে: 'তিনি তো কখনও ক্যাসেলের কথা জিজ্ঞেস করেন নি; ক্যাসেল আছে বা নেই এ তাঁর কাছে একই কথা। এবার তিনি বারবার ক্যাসেলের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন কেন। কি ব্যাপার?' দিদিমা কিন্তু আর কিছুই বললেন না। তারাও জানতে পারে না কিছু।

কয়েকদিন পর প্রশেক তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের শহরে নিয়ে যায়, তাদের একটু আমোদ-আহ্লাদের জন্য। ভোরসা ও বেট্সে মাঠের কাজে গিয়েছে—দিদিমা বাড়ি পাহারায় আছেন। তিনি তাঁর চরকা . . বসেছেন লিনডেন্ গাছের নীচে। তাঁর মনে যেন কি

এক চিন্তা—কখনও মাথা নাড়েন—কখনও বা মনে মনে বলে ওঠেন : 'এই ঠিক হবে।' এমনি সময় দিদিমা দেখতে পান কাউণ্টেস্ পাহাড়ের নীচে নেমে আসছে, পুলের পার দিয়ে। তার পরনে সাদা পোশাক, মাথায় খড়ের টুপি—পরীর মত হাল্কা পা ফেলে চলেছে। তাড়াতাড়ি উঠে দিদিমা তাকে অভ্যর্থনা জানান। তার মুখের দিকে চেয়ে দিদিমার মন দুঃখে ছেয়ে যায়—বিবর্ণ মুখখানি,—হতাশায় ভরা—এ মুখের দিকে চাইলেই দুঃখ হয়। হোরটেন্সে দিদিমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলে : 'একা একা চুপচাপ বসে কেন?'

'সবাই শহরে গেছে। অনেকদিন ছেলেমেয়েরা তাদের বাবাকে দেখে নি।' দিদিমা নিজের এপ্রন্ দিয়ে বেঞ্চিখানি ঝেড়ে কাউণ্টেস্-এর বসবার জায়গা ক'রে দেন।

'সত্যিই অনেকদিন। কিন্তু এ আমারই দোষ।'

'কাউণ্টেস্, ভগবান যাকে রোগ দিয়েছেন তাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? আমরা সবাই তোমার জন্য দুঃখ পেয়েছি, ভগবানের কাছে তোমার স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করেছি। স্বাস্থ্য বড় মূল্যবান। কেবলমাত্র তা নষ্ট হয়ে গেলেই, আমরা তার মূল্য বুঝতে পারি। তোমায় হারালে আমাদের দুঃখের অন্ত থাকতো না। মাননীয়া রাজকুমারীও দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়তেন।'

'তা জানি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজকুমারী তার কোলের ওপর অবস্থিত একখানি সুন্দর বাঁধানো এলবামে হাত দুখানি রাখে।

'তুমি এত বিবর্ণ হয়ে গেছ, কি হয়েছে তোমার কাউণ্টেস্?' দিদিমা জিজ্ঞেস করেন সমবেদনার সুরে।

মুখে হাসি টেনে কাউণ্টেস্ জবাব দেয় : 'কিছু না দিদিমা'। হাসিতে কাউণ্টেস্ যে দুঃখ গোপন রাখতে চায় তা যেন আরও প্রকাশ হয়ে পড়ে।

দিদিমার আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। তবে এটুকু বুঝতে পারেন যে শারীরিক অসুস্থতাই একমাত্র ব্যাধি নয়।

কাউণ্টেস্ নানা খবর জিজ্ঞেস করে। ছেলেমেয়েরা কি তার কথা মনে রেখেছে। দিদিমা সব কিছুরই জবাব দিয়ে রাজকুমারীর খবর জিজ্ঞেস করেন।

'রাজকুমারী শিকার-রক্ষকের কাছে গিয়েছেন। আমি এখানে বসে ছবি আঁকব আর সেই সঙ্গে তোমার সাথে কথা বলব। ফেরার পথে তিনি আমায় এখান থেকে নিয়ে যাবেন।'

'ভগবান যেন তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন!' দিদিমা মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বলেন: 'যাই, আমি পোশাকটি বদলে আসি—শনের ধুলোয় ময়লা হয়ে যায়। মনে করো না কিছু, এখনই আমি এসে পড়বো।'

তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে দিদিমা পরিষ্কার এপ্রন্ এবং মাথায় ও গলায় পরিষ্কার রুমাল বেঁধে ফিরে আসেন। সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন রুটি, মধু, মাখন আর ননী।

'কাল রুটি সেঁকেছিলাম। একটু মুখে দিয়ে দেখবে না? চল, আমরা বরং বাগানে গিয়ে বসি—ও-জায়গাটা এখান থেকে ভাল। আমি যখন একা একা থাকি তখন এই লিন্‌ডেন্ গাছের নীচে এসে বসি—হাস মুরগীগুলো আমার কাছে কাছে থাকে।'

দিদিমার হাত থেকে এক টুকরো রুটি তুলে নিয়ে কাউণ্টেস্ বলে: 'তাহলে এখানেই বসি।' দিদিমার কথার অপেক্ষা না ক'রে কাউণ্টেস্ এক গ্লাস ননী তুলে নেয়। মনে মনে সে জানে, কিছু না নিলে দিদিমা মনে দুঃখ পাবেন। তারপর এলবাম্ খুলে দিদিমাকে তার আঁকা ছবি দেখায়।

'ও ভগবান!' দিদিমা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন: 'এ যে বাঁধের ওপর সারা গ্রামের ছবি—মাঠ, পাহাড়, বন—ভিকটোরকাও রয়েছে দেখছি!'

'তাকে না হলে এ সুন্দর দৃশ্য মানায় না দিদিমা। পাহাড়ে তাকে দেখলাম। কি চেহারা হয়েছে তার! তার জন্য কি কিছু করা যায় না?' কাউণ্টেসের স্বর দুঃখে ভরে ওঠে।

'তার দেহের হয়তো শাস্তি হবে। কিন্তু তার দুঃখ তো তার দেহে নয়। দুঃখ তার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা কিছু সে করে, করে যেন স্বপ্নাবেশে। ভগবান বোধহয় তাই তার দুঃখের বোধশক্তিও কেড়ে নিয়েছেন। দুঃখ তো তার কম নয়। কোনদিন যদি তার বোধশক্তি ফিরে আসে, তাহলে সে হয়তো হতাশায় তার নিজের জীবনও শেষ ক'রে দেবে। ভগবান যেন তাকে ক্ষমা করেন! পাপ যদি সে ক'রে থাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে—' দিদিমা আর একখানি পাতা উল্টে দেখেন। সেখানেও আর এক অদ্ভুত দৃশ্য! 'এ তো পুরোনো বাড়ি-উঠোন, লিনডেন্ গাছ, আমি, ছেলেমেয়েরা, কুকুর দুটি—সব কিছু! বুড়ো বয়সে কত আশ্চর্য জিনিস দেখবো।' দিদিমা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন ছবির দিকে।

কাউণ্টেস্ বলে: 'যাদের আমার ভাল লাগে তাদের আমি কখনও ভুলতে পারি না। তাদের মুখ যেন আমার মনে গেঁথে থাকে, তাই তাদের এঁকে রাখি। যেসব জায়গা আমার ভাল লাগে তাও আঁকি। দিদিমা তুমি যদি আপত্তি না করো তা' হলে তোমার নাতিনাতনীদের জন্য আমি তোমার একখানা ছবি আঁকবো।'

লজ্জা পেয়ে দিদিমা মাথা নেড়ে বলেন: 'আমার মত বুড়ীর ছবি! তা কি হয়?'

'তা হোক দিদিমা। তুমি যখন একা বাড়ি থাকবে, আমি একদিন আসবো। তোমার নাতিনাতনীরা খুশী হবে।'

'তোমার যখন ইচ্ছা আমি কি ক'রে আপত্তি করি? তবে কেউ যেন জানতে না পায়। তাহলে তারা বলবে কি? আমি যতদিন বেঁচে

আছি আমার ছবির দরকার কি? তবে আমি যখন থাকবো না—তোমার যা ইচ্ছা।'

কাউণ্টেস্ খুশী হয়।

এলবামের আর-একখানি পাতা উল্টে দিদিমা বলেন: 'কিন্তু কোথায় শিখলে তুমি এমনি ছবি আঁকা? আমার জীবনে তো কখনও মেয়েদের ছবি আঁকার কথা শুনিনি।'

'কিন্তু আমাদের কিছু না কিছু শিখতেই হয় সময় কাটানোর জন্য। আমার ছবি আঁকতে ভাল লাগে।' কাউণ্টেস্ জবাব দেয়।

'অতি সুন্দর—' দিদিমা এলবামে একখানি খোলা ছবির দিকে চেয়ে দেখেন। ছোট একটি পাহাড়, ঝোপে ছাওয়া—পাহাড়ের পাদদেশে সাগরের ঢেউ। পাহাড়ের উপর এক যুবক দাঁড়িয়ে—তার হাতে একটি গোলাপ। যুবক সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে—দূরে সমুদ্রের বুকে কয়েকখানি পালতোলা জাহাজ।

'এখানিও তোমার আঁকা?' দিদিমা জিজ্ঞেস করেন।

'না, যাঁর কাছে আমি ছবি আঁকা শিখেছিলাম তিনিই এখানি দিয়েছিলেন আমাকে।' ক্ষীণ স্বরে জবাব দেয় কাউণ্টেস্।

'ঐ বুঝি তিনি?'

কাউণ্টেস্ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না। তার মুখখানি লাল হয়ে ওঠে। সে দাঁড়িয়ে বলে: 'ঐ বোধ হয় রাজকুমারী আসছেন।'

দিদিমা এ ইঙ্গিত বুঝতে পারেন। কাউণ্টেসের মনোবেদনার কথা আর তাঁর অজানা থাকে না।

রাজকুমারী তখনও আসেননি। কাউণ্টেস্ আবার বসে পড়ে। মনে মনে চেষ্টা ক'রে দিদিমা ক্রিষ্টিনা ও মিলোর প্রসঙ্গ তোলেন। রাজকুমারীকে এ সম্বন্ধে তাঁর প্রার্থনা জানানোর বাসনাও তিনি

কাউণ্টেসের কাছে ব্যক্ত করেন। কাউণ্টেস্ সঙ্গে সঙ্গে দিদিমাকে এ সম্বন্ধে তার যথাসাধ্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

রাজকুমারী হাঁটাপথে এলেন। খালিগাড়ী রাস্তা দিয়ে এসে হাজির হলো।

দিদিমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে হোরটেন্সেকে একটি ফুলের তোড়া দিয়ে রাজকুমারী বলেন : 'তুমি তো বুনো পিঙ্ক ফুলের ভক্ত। তোমার জন্য নিয়ে এলাম।' রাজকুমারীর হাতে চুমো খেয়ে কাউণ্টেস্ ফুলের তোড়াটি তার বেল্টে গুঁজে রাখে।

তোড়াটির দিকে চেয়ে দিদিমা বলেন : 'এ ফুলের একটা নাম হলো চোখের জল।'

'চোখের জল ?' দুজনেই বিস্মিত হয়ে তাকায়।

'হাঁ, কুমারী মেরীর চোখের জল। এ ফুলের ওই নাম। ইহুদীরা যখন যিশুকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায় তখন কুমারী মেরী পিছু পিছু যান। দুঃখে তখন তাঁর অন্তর ভেঙ্গে গেছে। পথে দেখতে পান যিশুর দেহে আঘাতের ক্ষতের রক্ত—তা দেখে তিনি অশ্রুপাত করেন। এই চোখের জল ও রক্তে সারা পথ এই রকমের ফুল ফুটে ওঠে।'

রাজকুমারী মন্তব্য করেন : 'তাহলে এ দুঃখ ও প্রেমের ফুল।'

দিদিমা বলেন : 'প্রেমিক-প্রেমিকারা কিন্তু এ ফুল কখনও তোলে না, পাছে তাদের অশ্রুপাত হয়।' রাজকুমারীকে আতিথেয়তা গ্রহনের প্রার্থনা জানিয়ে দিদিমা তাঁকে এক গ্লাস ক্রীম দেন।

রাজকুমারী প্রত্যাখ্যান করেন না। দিদিমা বলে চলেন : 'তবুও জীবনে তাদের অনেক কিছুই ঘটে যাতে তাদের চোখের জল ঝরে। হাঁসি কান্না এই দুই নিয়েই জীবন। যদি তারা পরস্পরের প্রেমেও সুখী হয়, তবুও বিদ্বেষপরায়ণ লোকের তা সহ্য হয় না।'

'মহানুভব রাজকুমারী ! দিদিমা দুজন অসুখী প্রেমিক প্রেমিকার

জন্য এক প্রার্থনা জানাতে চান। আমার প্রার্থনা আপনি শুনুন সব, আপনার সাহায্য ভিক্ষা চাই।' কাউণ্টেস্ দু'হাত জুড়ে অনুনয়ে রাজকুমারীর মুখের দিকে চায়।

কাউণ্টেসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিদিমার দিকে চেয়ে রাজকুমারী বলেন: 'বলো, তোমায় তো আমি বলেছি, তুমি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা জানালে আমি তা প্রত্যাখ্যান করবো না। কোন অন্যায় প্রার্থনা তুমি আমায় জানাবে না তা আমি জানি।'

দিদিমা তখন ক্রিষ্টিনা ও মিলোর কথা বলেন—বলেন কি ভাবে মিলোকে ফৌজে যেতে হয়েছে। দিদিমা শুধু ক্রিষ্টিনার উপর কর্মাধ্যক্ষের নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেন না। তাকে তিনি প্রয়োজনের অধিক সাজা দিতে চান না।

'এই কি সেই মেয়েটি যার প্রেমিকের সঙ্গে পিকোলোর ঝগড়া হয়েছিল?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'সে কি এতই সুন্দরী যে সবাই তার জন্য মারামারি করে?'

'ষ্ট্রবেরীর মত টুকটুকে। ফসলকাটা উৎসবে সে আপনাকে ফুলের মালা পরিয়ে দেবে, আপনি তখন তাকে দেখতে পাবেন। দুঃখে রূপ বাড়ে না—শুকনো ফুলের মত তার মাথা নুয়ে পড়েছে। ক্রিষ্টিনা যা ছিল, এখন সে হয়েছে তার ছায়া মাত্র। তবে একটি আশ্বাসে সে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। কাউণ্টেস্ও বিবর্ণ হয়ে পড়েছে, তবে তার পুরোনো বাড়ি আর মনের প্রিয় বস্তুটির সাক্ষাৎ পেলেই আবার তার গাল দুখানি গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত টুকটুকে হয়ে উঠবে।' দিদিমা 'মনের প্রিয় বস্তুটি' কথাটির উপর এমন জোর দেন যে শুনে কাউণ্টেস্ চমকে ওঠে। রাজকুমারী প্রথমে কাউণ্টেস্ তারপর দিদিমার দিকে অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে চান। দিদিমা এমন ভাব দেখান যেন কিছুই

তিনি জানেন না। তিনি শুধু একটু ইঙ্গিত করেছেন এই ভেবে যে রাজকুমারী যদি সত্যিই কাউন্টেসকে সুখী করতে চান তাহলে তিনি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন।

একটু নীরব থেকে রাজকুমারী উঠে পড়েন। দিদিমার কাঁধে হাত রেখে বলেন: 'আমি তোমার প্রেমিকযুগলের ব্যাপারটি বিবেচনা করবো। কাল তুমি এমনি সময় আমার সঙ্গে দেখা করো।'

এলবামখানি হাতে নিয়ে কাউন্টেস্ বলে: 'রাজকুমারী, দিদিমা রাজী হয়েছেন, আমি তাঁর একখানি ছবি আঁকবো। তবে তিনি একথা গোপন রাখতে চান, যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন ততদিন। কোথায় বসে তাঁর ছবি আঁকি?'

'ক্যাসেলে এসো। হোরটেন্সে ওখানেই তোমার ছবি আঁকবে। যতদিন বেঁচে থাকবে, ছবিখানি থাকবে আমার কাছে। তোমার নাতিনাতনীদেরও ছবি আঁকবে। সে ছবি তোমার জন্য। ওরা যখন বড় হয়ে উঠবে, তখন তুমি দেখতে পাবে ওরা ছোটবেলায় কেমন ছিল।'

রাজকুমারী কাউন্টেস্কে নিয়ে গাড়ীতে এসে ওঠেন।

দিদিমা বাড়ির মধ্যে যান। তাঁর মন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হয়ে ওঠে।

ষোল

সকালটা বড় গরম আর গুমট। ছেলে বুড়ো সবাই মাঠে গেছে ঘরে ফসল নিয়ে আসতে। গৃহস্থদের রাতেও কাজ করতে হয়— নিজেদের কাজ, তার উপর জমিদারের ক্ষেতেও কাজ আছে। রোদের তাপে মাটি চৌচির হয়ে ফেটে গেছে। গরমে সবাই হাঁপিয়ে ওঠে।

ফুলগুলি শুকিয়ে যায়, পাখিরা উড়ে নীচে নেমে আসে। সবাই ছায়া খোঁজে। সকাল থেকে আকাশে এখানে ওখানে মেঘ জমেছে, সাদা আর ধূসর মেঘ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ছড়িয়ে পড়ে আকাশে আর একটার সঙ্গে আর-একটা ধাক্কা লেগে লেগে ভেঙ্গে যায়। সাদা মেঘের মধ্যে গহ্বর হয়ে কালো কালো দেখায়। কালো রঙগুলো বেড়ে বেড়ে দুপুরে সারা আকাশ ছেয়ে যায়। সূর্যও ঢাকা পড়ে। চাষীরা শঙ্কিত চোখে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে। পরিশ্রমে ক্লান্ত হলেও তারা কাজের গতি বাড়িয়ে দেয় কারও তদারকের অপেক্ষা না রেখে।

দিদিমা ঘরের চৌকাঠে বসে আছেন। আকাশে মেঘের দিকে চেয়ে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। আডেল্‌কা আর ছেলেরা উঠোনে খেলা করে। কিন্তু এত গরম, দিদিমা তাদের মত দিলেই তারা জামা কাপড় খুলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুরন্ত আডেল্‌কা পর্যন্ত হাঁপিয়ে পড়ে, খেলতে ইচ্ছে করে না তার—চোখ বুঁজে আসে ঘুমে। দিদিমার চোখের পাতাও ভারী হয়ে আসে। ভরত পাখিরা উড়তে উড়তে নীচে নেমে এসে নীড়ে আশ্রয় নেয়। সকালবেলা দিদিমা যে মাকড়শাটিকে দুটি মাছি ধরতে দেখেছেন, সেটিও আশ্রয় নেয়। উঠোনে হাঁসমুরগীগুলি জটলা করে। কুকুর দুটি দিদিমার পায়ের কাছে সটান শুয়ে আছে—তাদের জিভ এত ঝুলে পড়েছে, যেন মনে হয় এই মাত্র তারা প্রাণপণে ছুটে এসেছে। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না।

প্রশেক ও তার স্ত্রী ক্যাসেল থেকে ফিরে এসেছে। দূর থেকেই শ্রীমতী প্রশেক বলে : 'ঝড় আসছে—সব কিছু ঠিক আছে তো?'

ঘাসের উপর কাপড় মেলা, হাঁসমুরগী, ছেলেমেয়ে সবাইকে ঘরে তুলে দেওয়া হয়। দিদিমা টেবিলের উপর একখানি রুটি রেখে, ঝড়ের জন্ত

আশীর্বাদের মোমবাতিটিও তৈরি রাখেন। জানালাগুলি সব বন্ধ ক'রে দেওয়া হলো। তখনও গুমোট। সূর্য মেঘে ঢেকে গেছে। প্রশেক রাস্তায় দাঁড়িয়ে চারদিক চেয়ে দেখে। দেখে বনের মধ্যে একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে ভিক্‌টোরকা। ঝড় ওঠে—মেঘের গুড়গুড় শব্দ—বিদ্যুতের ঝলকানি। 'আহা বেচারী গাছের তলে দাঁড়িয়ে আছে—' এই ভেবে প্রশেক ভিক্‌টোরকাকে গাছের নীচ থেকে সরে আসতে ইশারা করে। কোন ভ্রূক্ষেপই করে না ভিকটোরকা। প্রতিটি বিদ্যুতের ঝলসানি দেখে সে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ে, বিদ্যুতের চকমকি আর মেঘের গুরুগম্ভীর শব্দ—ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়। প্রশেক তাড়াতাড়ি বাড়ি আসে।

দিদিমা তাড়াতাড়ি মোমবাতিটা জ্বেলে ছেলেদের সঙ্গে প্রার্থনায় বসেন। ছোটরা বাজ পড়ার শব্দে ভয়ে চমকে ওঠে। প্রশেক জানালায় গিয়ে বাইয়ে চেয়ে দেখে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি—সারা আকাশ বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে—তারপরই প্রচণ্ড শব্দ। শুধু একমুহূর্ত বিশ্রাম—তারপরই আবার তাণ্ডবলীলা। বাড়ির উপর পরপর দু'বার বজ্রপাতের শব্দ শোনা যায়। 'ভগবান রক্ষা কর,' বলতে গিয়ে দিদিমার মুখ থেকে আর কথা বেরোয় না। শ্রীমতী প্রশেক টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রশেকও ভয় পায়। ভোরসা ও বেট্‌লে হাঁটু পেতে বসে পড়ে। ছেলেমেয়েরা কেঁদে ওঠে। মুহূর্তে যেন ঝড়ের তীব্রতা কমে যায়। মেঘের শব্দ কমে আসে, মেঘ আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের রং বদলে যায়। ক্রমে ধূসর মেঘের অন্তরালে নীল আকাশ দেখা দেয়। বৃষ্টি থেমে যায়—ঝড়ও।

চারিধারে কি পরিবর্তন। শ্রান্ত পৃথিবী যেন বিশ্রাম নিচ্ছে—তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তখনও থরথর ক'রে কাঁপছে। অশ্রুসিক্ত চোখে যেন সূর্য দেখা দেয়। ফুল, ঘাস সব মাটির উপর পড়ে আছে।

রাস্তার ধারে জলের স্রোত চলেছে—নদীর জল কর্দমাক্ত। গাছের সবুজ পাতা থেকে সহস্র সহস্র চক্‌চকে জলবিন্দু মাটিতে পড়ে। আবার পাখি ওড়ে আকাশে; হাঁসের দল বৃষ্টির জলে সাঁতার দেয়। মুরগী মাটিতে পোকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। মাকড়শা তার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসে। সব জীবজন্তুই আবার সতেজ হয়ে নতুন উদ্দমে কাজ শুরু করে।

প্রশেক বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে। যে গাছটি এতদিন বাড়িটিকে আশ্রয় দিয়েছে, বজ্রাঘাতে তা একেবারে চৌচির হয়ে গেছে—অর্ধেক ঘরের চালে আটকে আছে অর্ধেক পড়েছে মাটিতে। এ গাছটিতে কোনদিন ফল হয়নি, তবু সারা বছর তা বাড়িতে ছায়া জুগিয়েছে।

বৃষ্টিতে মাঠেরও কিছু ক্ষতি হয়েছে, তবে বেশী কিছু না। সবাই ভয় করেছিল যে শিলাবৃষ্টি হবে। বিকালেই রাস্তাঘাট শুকিয়ে ওঠে। ক্যাসেলে যাবার পথে দিদিমার সঙ্গে মিলারের দেখা। মিলার বলে ঝড়ে তার ফলের গাছের ক্ষতি হয়েছে। 'কোথায় চলেছেন?' জিজ্ঞেস ক'রে মিলার দিদিমাকে নস্যির কৌটোটি এগিয়ে দেয়। তারপর দিদিমা ক্যাসেলের পথে চলেন।

দিদিম এলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দ্বারপালকে আগেই দেওয়া ছিল। দিদিমা আসতেই সে তাঁকে বসবার ছোট ঘরটিতে নিয়ে গেল। রাজকুমারী সেখানে একাই বসেছিলেন। দিদিমাকে তিনি বসতে বললেন।

'তোমার সরলতা ও আন্তরিকতা আমার খুব ভাল লাগে। তোমায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—তাই যা জিজ্ঞেস করবো, আশা করি ঠিক ঠিক জবাব দেবে।' রাজকুমারী কথা শুরু করেন।

'নিশ্চয়ই মাননীয়া রাজকুমারী, আপনি জিজ্ঞেস করুন।' মনে মনে দিদিমা ভাবেন, কি জিজ্ঞেস করবেন রাজকুমারী।

'কাল তুমি বলেছিলে কাউণ্টেস্ তার পুরোনো বাড়ি আর মনের প্রিয় বস্তুটির সাক্ষাৎ পেলেই আবার তার গাল দুখানি গোলাপ ফুলের মত টুক্‌টুকে হয়ে উঠবে। এই কথাটির উপর তুমি এত জোর দিয়ে বলেছিলে যে আমার কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে। তুমি কি আমার কৌতূহল জাগানোর জন্যই বলেছিলে?' রাজকুমারী একদৃষ্টে দিদিমার দিকে চেয়ে রইলেন।

দিদিমা বিভ্রান্ত হলেন না। একমুহূর্ত চিন্তা ক'রে তিনি জবাব দিলেন: 'আমি ইচ্ছা করেই কথাটি জোর দিয়ে বলেছিলাম রাজকুমারী। আমার মনে যা ছিল তাই মুখে এসে গেছে।'

'কাউণ্টেস্ কি তোমায় কিছু বলেছে?'

'ভগবান না করুন! কাউণ্টেস্ এমন প্রকৃতির নয় যে নিজের দুঃখের কথা সবাইকে বলে বেড়াবে। তবে যারা দুঃখ পেয়েছে তারা বুঝতে পারে।'

'কি মনে হয় তোমার? এ আমার কৌতূহল নয়—আমার স্নেহের পাত্রীর জন্য আমার উদ্বেগ। তাই তোমায় জিজ্ঞেস করছি।' রাজকুমারী চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

'যা শুনেছি তা বলছি। এতে আমার ক্ষতি কি?' দিদিমা শুরু করলেন কি ক'রে কাউণ্টেসের বিয়ের সম্বন্ধ ও তার অসুখের কথা শুনেছেন: 'এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তা আসে। অনেক সময় দূর থেকে অনেক নজরে পড়ে—কাছে এসে তার সাক্ষাৎ মেলে না। প্রতিচ্ছবিতেও অনেক সময় অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমার তাই মনে হয় কাউণ্টেস্ সেই কাউণ্টকে বিয়ে করতে সম্পূর্ণ রাজী নয়। শুধু আপনাকে সুখী করার জন্যই মত দিয়াছে। কাল কাউণ্টেস্‌কে দেখে বড় দুঃখ পেয়েছি। আমি তার আঁকা ছবি দেখছিলাম। কি সুন্দর ছবি! একখানি ছবি কাউণ্টেস্ বললে তার শিক্ষকের আঁকা,

তাকে উপহার দিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম ছবির সেই সুদর্শন যুবকটিই কি শিল্পী? বুড়ো হয়েছি—তাই সবকিছুতেই কৌতূহল। কাউণ্টেস্ লাল হয়ে উঠলো—উঠে দাঁড়িয়ে কোন জবাব দিল না, কিন্তু চোখ তার জলে ভরে গেল। এখন আপনিই বিবেচনা করুন আমার ধারণা সত্যি কি মিথ্যে।'

রাজকুমারী উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে পায়চারি করতে করতে বললেন: 'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। ও সব সময়ই হাসিখুশী আর বড় নম্র। কখনও আমার কাছে কিছু উল্লেখ করেনি।'

দিদিমা বলেন: 'এক-একজনের প্রকৃতি এক-এক রকমের। কেউ কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারে না—আবার কেউ সারা-জীবন তা অন্তরে লুকিয়ে রাখে, এমন কি মরণের পরেও যেন সঙ্গে নিয়ে যায়। এদের মন বোঝা দায়, তবে ভালবাসায় ভালবাসার উদ্রেক হয়। আমার কাছে মনে হয় মানুষ যেন উদ্ভিদ বিশেষ—কারও কারও সাক্ষাৎ সর্বত্রই মেলে—প্রতি মাঠে বা ঝোপে। আবার কারও সন্ধানে বনে যেতে হয়—সেখানেও গাছের পাতার নীচে, বা কখনও পাহাড়ে কাঁটা-ঝোপের মধ্যে তাদের দেখা পাওয়া যায়। তবু এ অনুসন্ধানের মূল্য আছে। পাহাড় থেকে যে স্ত্রীলোকটি আমাদের কাছে গাছগাছড়া নিয়ে আসে তার কাছেই শুনেছি যে, সুগন্ধি শেওলার সন্ধান পাওয়া কঠিন—এবং তার মূল্য অনেক। মাপ করবেন, আমি অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। মনে হয় কাউণ্টেসের মনে আশা ছিল তাই তার সুখও ছিল। এখন আশা হারিয়ে সে নিরাশ হয়ে পড়েছে। জীবনে তো এমন অনেক কিছু দেখা যায়—যা না-হারানো পর্যন্ত তার মূল্য বোঝা যায় না।'

'দিদিমা তোমায় অনেক ধন্যবাদ। আমার হয়তো এ তথ্যে কোন লাভ হবে না, তবে কাউণ্টেস্ সুখী হবে। এর জন্য সে তোমার কাছে

ঋণী আজীবন থাকবে। তুমি না বললে এ চিন্তা আমার মনে কখনও আসতো না। আর তোমার দেরী ক'রে দেব না। কাল ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসো। কাউণ্টেস্ তোমাদের ছবি আঁকার সবকিছু ঠিক ক'রে রেখেছে।'

মনের সুখে দিদিমা বাড়ি ফেরেন। শুধু একটি কথায় তিনি একজনের মনের শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন।

বাড়ির পথে তাঁর শিকার-রক্ষকের সঙ্গে দেখা। সে উত্তেজিত হয়ে ছুটে চলেছে। দিদিমাকে দেখেই ধরা গলায় বলে : 'জানেন কি হয়েছে ?'

'ভয় দেখাবেন না। কি হয়েছে ?'

'ভিক্টোরকা বজ্রপাতে মারা গেছে।'

দিদিমা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থকেন। দু'গাল বয়ে তাঁর চোখের জলে ধারা নামে। ধীরে ধীরে বলেন : 'ভগবান ওকে ভালবাসতেন, তাই ডেকে নিয়েছেন। এতে আমাদের দুঃখ করবার কিছু নেই।'

শিকার-রক্ষক বলে : 'ও মরণ-কালে কোন যন্ত্রনাই পায়নি। প্রশেক, তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা খবর শুনে দুঃখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। প্রশেক বলে : 'ঝড়ের আগে ওকে গাছের তলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমারও ভয় হয়। ওকে সরে যেতে বললাম, কিন্তু ও শুধু হাসতে লাগলো। সেই শেষবারের মত ওকে দেখেছি।'

'কিন্তু কোথায় ওর মৃতদেহ ? কে দেখেছে ?'

'ঝড়ের পর আমি বনে যাই কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা দেখতে। পাহাড়ের উপর সেই ফার গাছটি—যেটি ভিক্টোরকা যে গহ্বরে থাকতো তার সমেনে দাঁড়িয়ে—সেখানে ফার গাছের সবুজ ডালের তলে দেখি কি যেন পড়ে আছে। ডাকলাম,—কোন সাড়া পেলাম না। ডালগুলির দিকে তাকালাম,—দেখি গাছটি ভেঙ্গে চৌচির হয়ে ঝুলে পড়েছে। ডালগুলি তুলে দেখলাম তার তলে ভিক্টোরকা পড়ে আছে।

তাকে নাড়া দিয়ে দেখলাম,—একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তার পরনের পোশাকটিও পুড়ে গিয়েছে। ঝড় উঠলেই তার মন নেচে উঠতো—ছুটে যেত পাহাড়ের উপর সেই ফার গাছটির তলে, সেখান থেকে দেখতো চারধারের অপরূপ দৃশ্য—আর সেইখানেই মরণ তাকে ঘিরে ধরলো।'

'কোথায় রেখেছেন ওকে?' জিজ্ঞেস করলেন দিদিমা।

'আমাদের বাড়িতেই নিয়ে এসেছি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারও ব্যবস্থা আমি করেছি, তবে ওর আত্মীয়দের তাতে আপত্তি হবে। গ্রামে খবর দিয়ে এসেছি।'

ছেরনভ-এ গির্জার ঘণ্টা বেজে ওঠে। সবাই ক্রুশচিহ্ন ক'রে প্রার্থনায় বসে। এ ঘণ্টা ভিক্‌টোরকার জন্য।

ছেলেমেয়েরা অনুনয় করে: 'আমরা কি একবার ভিক্‌টোরকাকে দেখতে পাবো?'

'কাল এসো,' বলে শিকার-রক্ষক বিদায় নেয়।

'হায় ভিক্‌টোরকা আর কখনও আমাদের বাড়ি আসবে না। তাকে আর বাঁধের ধারে গান গাইতে শুনতে পাবো না। সে স্বর্গে গেছে—' ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের কাজে চলে যায়। দিদিমাকে কাউণ্টেসের কথা জিজ্ঞেস করতেও ভুলে যায়।

'পৃথিবীতে সে অনেক দুঃখই সহ্য করেছে। তার স্থান স্বর্গেই,' দিদিমা মনে মনে বলেন।

ভিক্‌টোরকার মৃত্যুর খবর সারা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেল। সবাই তাকে জানতো—তার জন্যে সহানুভূতি জানাতো। মৃত্যু ভগবানই পাঠিয়েছেন, তাই ভেবে সবাই মনে মনে তাকে সম্ভ্রম করে।

পর দিন দিদিমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ক্যাসেলে যান। কাউণ্টেস্ ছবি আঁকবে। রাজকুমারীও ভিক্‌টোরকার কথা উল্লেখ করেন। কাউণ্টেস্ তা শুনে বলে:

'আমি দিদিমাকে ভিক্টোরিকার যে ছবি দেখিয়েছি, তা সবাইকে এক একখানি ক'রে এঁকে দেবো।'

রাজকুমারী হেসে বলেন : 'ও যাবার আগে সবারই জন্য কিছু না কিছু করতে চায়। সবাইকেই ও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে।'

'যারা আমাদের ভালবাসে তাদের মধ্যে থাকার চেয়ে সুখ কি? অন্যকে সুখী করার মধ্যেই তো সব থেকে আনন্দ। মন্তব্য করেন দিদিমা।

ছেলেমেয়েরা ভাবে তাদের ছবি কি মজার হবে। দিদিমার ছবির কথা তারা জানে না। কাউণ্টেস্ তাদের বলেছে শান্ত হয়ে বসলে তার জন্যও পুরস্কার মিলবে। দিদিমা বসে বসে দেখেন কি ক'রে শিল্পীর তুলিতে তাঁর প্রিয় নাতিনাতনীদের ছবি অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তারা নড়াচড়া করলেই বা স্বভাবজনিত বদভ্যাস বশতঃ কিছু করলেই তিনি তাদের ধমকে দেন,—'জনি একপায়ে দাঁড়িয়ো না, তাহলে ছবিতে তুমি বেঁকে যাবে, বারুস্কা খরগোসের মত নাক কুঁচকিও না—তাহলে ওমনি ছবি হয়ে যারে তোমার। উইলি হাঁসের মত ঘাড় উঁচু কেন?' আডেল্কা যেই ভুলে হাতের আঙুল মুখে দেয়, দিদিমা ধমকে ওঠেন : 'বড়ো হয়েছো তুমি—দাঁতে রুটি কাটতে লজ্জা করে না তোমার?' (বোহেমিয়ায় সপ্তাহে দু'তিন দিন বাড়িতে রুটি ভাজা হয়। বড় বড় রুটি—দু'এক সপ্তাহেই তা শক্ত পাথরের মত হয়ে যায়। তখন তা ছোটদের পক্ষে চিবনো এক সমস্যা বিশেষ।)

কাউণ্টেস্ মনের সুখে ছবি আঁকে। ছেলেমেয়েদের হাবভাবে ও দিদিমার কথায় সে মনে মনে আনন্দ পায়। সত্যিই দিনে দিনে সে সজীব হয়ে ওঠে। তাই দেখে দিদিমা মন্তব্য করেন গোলাপ ফুলের মত না হলেও, আপেল ফুল ফোটবার পূর্বাভাষ। কাউণ্টেস্‌কে দিনে দিনে সুখী দেখায়। তার চোখের বর্ণ ও উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। মাঝে

মাঝে সে তুলি সরিয়ে রেখে দিদিমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে—তার চোখ জলে ভরে ওঠে। তারপর দু'হাতে দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর রেখাবহুল কপালে চুমো খেয়ে তাঁর সাদা চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। কখনও বা নীচু হয়ে দিদিমার হাতে চুমো খায়।

দিদিমা এ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চমকে উঠে বলেন: 'কি করছো তুমি? আমি কি এ সম্মানের যোগ্য?'

'তা আমি ভালই জানি দিদিমা—জেনেই তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দিদিমা তুমি স্বর্গের দেবদূত!' কাউন্টেস্ দিদিমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে।

তার পদ্মের মত শুভ্র ও নির্মল কপালে হাত রেখে দিদিমা বলেন: 'ভগবান যেন তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করেন—তোমায় যেন সুখী করেন।'

'তোমার জন্য ও রাজকুমারীর জন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো।'

পরের দিন শিকার-রক্ষক পুরোনো বাড়িতে সবাইকে জিজ্ঞেস করে তারা শেষবারের মত ভিক্টোবকাকে দেখতে যাবে কিনা। শ্রীমতী প্রশেক মৃতদেহ দেখলে ভয় পায়, তাই সে বাড়ি রইলো। মিলারের স্ত্রীও পারে না দেখতে, সেও রইলো বাড়িতে। সেই একই ওজর। ক্রিষ্টিনা তখন মাঠের কাজে ব্যস্ত। কেবলমাত্র দিদিমা ছেলেমেয়েদের ও মানচিঙ্কাকে নিয়ে চললেন। পথে ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথলেন। ছেলেরা স্তাতোনোভিতস্ তীর্থ থেকে দিদিমার আনা ছবি নিয়ে যায়। দিদিমা একটি মালা সঙ্গে নেন।

শিকার-রক্ষকের স্ত্রী বাড়ির দরজায় সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে: 'কে জানতো আজ এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে?'

দিদিমা বলেন: 'সকালে উঠেও আমরা জানতে পারি না

সারাদিন কি ঘটবে।' হরিণটি এসে আডেল্‌কার গায়ে মাথা ঘসে। ছেলেরা ও কুকুরগুলি এসে সবাইকে ঘিরে ধরে।

ঘরে ঢুকে দিদিমা জিজ্ঞেস করেন : 'কোথায় রেখেছো ওকে ?'

'বাগানে,' শিকার-রক্ষকের স্ত্রী সবাইকে বাগানে নিয়ে যায়।

বাগানে কুঞ্জটি সবুজ লতাপাতায় ছাওয়া। একটি শবাধারের মধ্যে ভিক্‌টোরকাকে শোয়ালো। তাকে সাদা পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কপালে একটি বুনো পিঙ্ক ফুলের মালা ও মাথাটি শেওলার বালিশের ওপর। হাত দুখানি বুকের ওপর। শবাধারটিও লতাপাতায় ছাওয়া —মাথার দিকে একটি প্রদীপ জ্বলছে—পায়ের দিকে একটি ছোট পাত্রে পূণ্য প্রদীপ আর সেই সঙ্গে জল ছিটানোর জন্য একটি রাইশস্যের মঞ্জরী। সব কিছুই শিকার-রক্ষকের স্ত্রী ব্যবস্থা ক'রে রয়েছে। দিনের মধ্যে অনেকবারই সে এই শবাধারের কাছে এসেছে—তাই এ দৃশ্যে সে অভ্যস্ত। দিদিমা শবাধারের কাছে এসেই ক্রুশচিহ্ন ক'রে হাঁটু পেতে প্রার্থনায় বসলেন। ছেলেমেয়েরাও তাঁকে অনুসরণ করে।

দিদিমা প্রার্থনা থেকে উঠলে শিকার-রক্ষকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করে : 'দেখুন, সব ব্যবস্থা ঠিক আছে তো ? আর ফুল বা ছবি আমরা দিই নি, ভেবেছিলাম আপনারাও কিছু নিয়ে আসবেন।'

দিদিমা বলেন। 'সব ঠিক হয়েছে। সুন্দর ব্যবস্থা আপনার।'

শিকার-রক্ষকের স্ত্রী ছেলেমেয়েরের হাত থেকে ফুল ও ছবি নিয়ে মৃতদেহের পাশে রেখে দেয়। তার হাত দুখানিতে মালা জড়িয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে করুণভাবে চেয়ে থাকেন। সে বন্যভাব আর নেই। সেই কালো জ্বলন্ত চোখ দুটি বুজে আছে—আগুন নিভে গেছে। জটপাকানো চুল চিরুনি দিয়ে পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো—মারবেল পাথরের মত সাদা কপালখানির চারিদিকে একটি লাল ফুলের মালা—যেন প্রেমের বন্ধন। রেগে গেলে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে বিকটরূপ

দেখা দিত তা আর নেই—মুখের পেশীগুলি সম্পূর্ণ শিথিল হ'য়ে এক প্রশান্ত ভাব ধারণ করেছে। ঠোঁটদু'খানিতে বোধ হয় তার শেষ চিন্তারই প্রতিচ্ছবি—একটি তিক্ত হাসি।

দিদিমা ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করেন: 'কিসের দুঃখ তোর? কি করেছে ওরা তোর? হায়, তোর দুঃখের ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না কেউ। এবার তুই ভগবানের রাজ্যে চলে গিয়েছিস্—ভগবানই দোষীকে শাস্তি দেবেন।'

'কামার বৌ চেয়েছিল ওর মাথার তলে কাঠের গুড়ো দিতে, আমার স্বামী কিন্তু শেওলা দিয়েছেন। না জানি লোকে কি বলবে? ওর আত্মীয়েরা হয়তো বলবে যে আমরা ওকে অনাথার মত বিদায় দিয়েছি।'

'লোকে যা বলে বলুক। বেঁচে থাকতে কেউ একখানি ছেঁড়া ন্যাকড়াও দেয় না আব মরে গেলে সবাই সোনার কাপড় নিয়ে আসে। পনের বছর ও ঐ সবুজ বালিশে শুয়েছে—ওখানেই ও শুয়ে থাক।' দিদিমা রাইয়ের মঞ্জরী দিয়ে মৃতদেহের উপর তিনবার পূণ্য বারি ছিটিয়ে দিয়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দেন। ছেলেমেয়েরাও তাই করে।

বিসেন্ পাহাড়ের পিছনে এক ছোট উপত্যকায় একটি গির্জা। সেখানে একটি ছোট সমাধিক্ষেত্রে ভিক্‌টোরকাকে কবর দেওয়া হলো। কবরটির উপরে শিকার-রক্ষক একটি ফার গাছ পুঁতে দিল। বারো মাসই তাতে সবুজ পাতা থাকে। বাঁধের পাড়ে আর ভিক্‌টোরকার ঘুমপাড়ানি গান শোনা যায় না—তার গুহাটিও শূন্য প'ড়ে আছে। ভাঙ্গা ফার গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে। তবু ভিক্‌টোরকাকে কেউ ভুলে যায় নি। তার দুর্ভাগ্যের উপর রচিত একটি করুণ গান বহুকাল শুনতে পাওয়া গেছে।

কথামত কাউণ্টেস্ দিদিমার ছবিখানি রেখে দিয়ে ছেলেমেয়েদের

ছবিখানি নিয়ে আসে। বাপ মা তাই দেখে বড় খুশি। দিদিমার আনন্দ কিন্তু আর ধরে না। যেই বাড়ি আসে তাদেরই ছবিখানি দেখিয়ে দিদিমা বলেন : 'ছবিতে প্রাণ দেবার ক্ষমতা আছে কাউণ্টেসের।'

বছর কেটে যায়। ছেলেমেয়েরা বাড়ি ছেড়ে বিদেশে যায়। দিদিমা তখন ছবিখানি দেখে বলেন : 'যদিও সাধারণ লোকের ছবি এঁকে রাখার প্রথা নেই, তবুও এ আমার ভালই মনে হয়। প্রত্যেকের মুখই আমার মনে আছে। কিন্তু যেই বছরের পর বছর কেটে যাবে,—স্মৃতি লুপ্ত হয়ে আসবে,—তখন এই ছবিখানির দিকে চেয়ে আমার মনে কত আনন্দ হবে।'

রাজকুমারীর চাষের ক্ষেত থেকেই শেষ শস্য কাটা হয়। রাজকুমারী তাড়াতাড়ি ইটালি ফিরে যেতে চান। কর্মাধ্যক্ষ খবর দেয় যে ফসল-কাটার উৎসব গম কাটার পরই হবে।

গ্রামে ক্রিষ্টিনাই সবচেয়ে সুন্দরী। দিদিমা তাকে দিয়ে রাজকুমারীকে শস্যের মালা উপহার দেবেন এ প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করে।

ক্যাসেলের পিছনে একটি খোলা মাঠ···কোথাও কোথাও ঘাস বা খড়ের স্তূপ। মাঠের মাঝে ছেলেরা একটি মস্ত খুঁটি পুঁতে, তাতে লাল রুমাল, ফিতে, ফুল, পাতা, ফসলের শিষ দিয়ে সাজিয়ে দেয়। বেঞ্চি পেতে বসার জায়গা ও মাটি সমান ক'রে নাচের আসর তৈরি হয়।

'দিদিমা, দিদিমা,' ক্রিষ্টিনা উতলা হ'য়ে বলে : 'তোমার আশায় বেঁচে আছি। ফসল কাটার উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল। জানিনা কি হবে আমার। দিদিমা তোমার আশা কি শুধু আমাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য?'

'না তোকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেব কেন? যা বলেছি তা সত্য সত্যই ভেবেছি। কাল তোর সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে আসবি। রাজকুমারী দেখে খুশি হবেন। আমি যদি বেঁচে থাকি আর ভাল

থাকি, তা'হলে আমিও আসবো। ওখানেই তোকে সব কথা বলবো।' দিদিমার মুখখানি গোপন আনন্দে ভরে ওঠে।

মিলোর জন্যে কি করা হয়েছে তা তিনি জানতেন। রাজকুমারীকে যদি কথা না দিতেন, তা'হলে তিনি মেয়েটির মনের অশান্তি তখনই দূর ক'রে দিতেন।

পরের দিন সবাই ভাল পোশাক পরে মাঠে এসে জড় হয় ফসল কাটার উৎসবে। একখানি গাড়ির অর্ধেক ফসলের শীষে বোঝাই করা হয়েছে—ঘোড়া কটিও রঙিন ফিতে দিয়ে সাজানো হয়েছে,—তার ওপর গাড়ির গাড়োয়ান বসেছে। গাড়িতে ফসলের উপর বসে ক্রিষ্টিনা ও কয়েকটি মেয়ে। গাড়ির দু'পাশে সারি দিয়ে যুবক ও বৃদ্ধের দল। ছেলেদের হাতে কাস্তে—মেয়েদের হাতেও কাস্তে এবং নিড়ানি। প্রত্যেকের হাতে একটি ফসলের শীষ। গাড়োয়ান চাবুক মারতেই ঘোড়া এগিয়ে চলে। গান গেয়ে শোভাযাত্রা ক্যাসেলের পথে যায়। ক্যাসেলে এসে মেয়েরা গাড়ি থেকে নামে। ক্রিষ্টিনা লাল রুমালে মালাটি নিয়ে হল ঘরে আসে, তার পিছনে আর সকলে আসে গান গেয়ে। হল ঘরের অপর দরজা দিয়ে রাজকুমারী প্রবেশ করেন। কাঁপতে কাঁপতে লজ্জায় নতমুখ হয়ে ক্রিষ্টিনা রাজকুমারীর কুশল ও শস্যপ্রাচুর্যের আবৃত্তি করে, এগিয়ে এসে তাঁর পায়ের কাছে ফসলের শীষেব মালাটি রাখে। সবাই টুপি খুলে রাজকুমারীকে শুভেচ্ছা জানায়। রাজকুমারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আহার ও পানের জন্য নিমন্ত্রণ জানান।

তার পর ক্রিষ্টিনার দিকে চেয়ে তিনি বলেন : 'তোমার উপহারের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। সবাই দেখছি এসেছে জোড়ে, কেবল তুমিই একা। তোমার একজন সঙ্গী মিললেই বোধ হয় তুমি সুখী হবে।'

এই বলে তিনি একটি দরজা খুলতেই সবাই দেখে মিলো চাষীর বেশে দাঁড়িয়ে আছে।

'জ্যাকব!' ক্রিষ্টিনা চেঁচিয়ে ওঠে। সবাই এসে তাকে ধরে না রাখলে সে আনন্দে ও উচ্ছ্বাস পড়ে যেত। রাজকুমারী ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মিলো চেঁচিয়ে ওঠে: 'এসো সবাই।' বাইরে এসে সবাইকে একটি টাকার থলি দেখিয়ে বলে: 'এটি রাজকুমারী দিয়েছেন—এসো আমরা ভাগ ক'রে নিই,' থলিটা সে টমেসের হাতে দেয়। ক্যাসেলের বাইরে এসে সে কি আনন্দ উচ্ছ্বাস। মিলো তার প্রেমিকাকে মধুর. আলিঙ্গন জানায়। সবাই বলে কি ভাবে রাজকুমারী তাকে রক্ষা করেছেন।

'দিদিমা, দিদিমা না থাকলে কিছুই সম্ভব হতো না,' ক্রিষ্টিনা দিদিমার কথা ভুলতে পারে না।

সবাই নাচতে যায়। সপরিবারে ক্যাসেলের কর্মচারীরা, প্রশেক পরিবার, মিলার ও শিকার-রক্ষকের পরিবার ও সেই সঙ্গে শোভাযাত্রায় যারা এসেছে। দিদিমাও এসেছেন। মিলো ও ক্রিষ্টিনা আনন্দে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে।

ক্রিষ্টিনা অভিযোগ করে: 'দিদিমা, কালতো তুমি জানতে যে মিলো এসেছে, কিন্তু আমায় বলোনি কেন?'

'আমার বলবার হুকুম ছিল না। তোকে তো বলেছিলাম শীঘ্রই তোদের দেখা হবে। ধৈর্য ধরলে সবই পাওয়া যায়।'

সাজানো খুঁটিটাকে ঘিরে সমস্ত পরিবেশ নাচ গান ও আনন্দে মুখর হ'য়ে ওঠে। বিয়ার ও নানা ধরনের মিশ্রিত পানীয়ে সকলের স্ফূর্তির মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যায়। রাজকুমারী যেই কাউণ্টেসকে সঙ্গে ক'রে সবাইকে দেখতে এলেন তখন জনতা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে নেচে গেয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানায়—তাঁর স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে পান ক'রে ক'রে সবার পান পাত্র বহুবার খালি হ'য়ে যায়।

ক্রিষ্টিনা এসে কাউন্টেসের হাতে চুমো খেয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। কাউন্টেস মিলার ও শিকার-রক্ষকের সঙ্গে কথা বলে—দিদিমার দিকে এগিয়ে আসে। এই দেখে কর্মাধ্যক্ষের স্ত্রী ও তার মেয়ে জ্বলে ওঠে। দিদিমাকে তারা একেবারেই দেখতে পারতো না, বিশেষ ক'রে তাদের দুরভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাবার পর। টেবিলে এসে যারা বসেছে তাদের পানের মাত্রাধিক্যে মাথা ভারী হয়ে এসেছে—ক্যাসেলের কর্মচারী ও কর্মাধ্যক্ষের নামে তারা গালমন্দ শুরু করেছে। তাদের মধ্যে একজন যেই একটি পানপাত্র নিয়ে এসে রাজকুমারীকে পানীয় দিতে যায়, টমেস্ এসে তাকে বাধা দেয়। তারপর রাজকুমারী উৎসব থেকে চলে যান।

উৎসবের কয়েকদিন পরই রাজকুমারী কাউন্টেস্‌কে নিয়ে ইটালি যাত্রা করলেন। যাবার আগে তিনি দিদিমার কাছে ক্রিষ্টিনার বিয়ের উপহারের জন্য একটি নেকলেস রেখে গেলেন।

দিদিমা সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছামতই সবকিছু হয়েছে। তবু একটি ব্যাপারে তাঁর মন খারাপ। মেয়ে ইয়োহানাকে একখানি চিঠি লিখতে হবে। শ্রীমতী প্রশেকও চিঠি লিখে দিতে পারতো, তবে এ তাঁর মনোমত হবে না। একদিন তাই তিনি বারুঙ্কাকে ঘরে ডেকে নিয়ে এলেন। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে টেবিলে বসতে বললেন তাকে : 'বারুঙ্কা বোস্, তোর মাসী ইয়োহানাকে একখানা চিঠি লিখতে হবে,' : এই বলে দিদিমা শুরু করেন : 'লেখ—

'যীশুর জয় হোক !—'

'কিন্তু দিদিমা,' বারুঙ্কা বাধা দিয়ে বলে : 'এমনিভাবে চিঠির আরম্ভ হয় না। লিখতে হয় প্রিয় ইয়োহানা।'

'না রে না। তোর দাদামশাই ও দাদামশায়ের বাবা তাঁরা এমনি ভাবেই লিখতেন—তুই আরম্ভ কর।'

'যীশুর জয় হোক! তোমাকে সহস্র আশীর্বাদ ও চুম্বন জানাইতেছি। ভগবানের কৃপায় আমি ভালই আছি। কাশিতে একটু কষ্ট পাইতেছি—তবে আমারও তো বয়স হইয়াছে। এ বয়সে যে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে তাহা ভগবানের কৃপায়। বারুস্কা আমাকে যদিও সবসময়ে সাহায্য করে, তবু এখনও আমি নিজে জামাকাপড় সেলাই করিতে পারি। এখনও চলিবার শক্তি আমার আছে। আশা করি তুমি ও ডরথি বেশ ভালই আছ। তোমার চিঠিতে জানিতে পারিলাম যে তোমার কাকার স্বাস্থ্য ভাল নাই—আশা করি তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবেন। প্রায়ই তাঁহার অসুস্থতার কথা শুনি। তবে ঘন ঘন যাহার অসুখ করে তাহার আয়ু কম হয় না।...

'তুমি লিখিয়াছ—বিবাহ করিতে চাও—আমার মত চাহিয়াছ। মা, তুমি যখন মনের মত বর পছন্দ করিয়াছ তখন আমার কি বলিবার আছে? ভগবান তোমাদের দুইজনের মঙ্গল করুন। তোমরা যেন সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করিতে পার এই আমার প্রার্থনা। বিবাহে আমার আপত্তি হইবে কেন? জর্জ শুনিয়াছি ভাল ছেলে, তুমি তাহাকে ভালবাসো। আমিতো তার সঙ্গে বাস করিব না, তুমিই বাস করিবে, আমার আশা ছিল তুমি একজন বোহেমিয়ানকেই বিবাহ করিবে। একদেশের হইলে পরস্পরের বোঝাবুঝি ভাল হয়। তবু আমি তোমাকে দোষ দেই না। আমরা সবাই জগজ্জননীর সন্তান—এক-দেশের না হইলেও আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত। জর্জকে আমার আশীর্বাদ জানাইও। তোমাদের ঘরকন্না পাতার পর সময় মত একবার আমাকে দেখিয়া যাইও। এখানে ছেলেমেয়েরাও তোমাদের কথা বলে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন—তোমরা সুখে থাকো।'

বারুস্কা আর একবার চিঠিখানি পড়ে। তারপর চিঠিটি ভাঁজ ক'রে দিদিমা ড্রয়ারে রেখে দেন। গির্জায় যাবার পথে ডাকঘরে দিয়ে আসবেন।

সতের

সেন্ট্ ক্যাথারিন দিবসের কয়েকদিন আগে এক বিকালে গ্রামের যুবকেরা সরাইখানার সামনে এসে জমায়েত হয়েছে। বাড়িটির বাইরে-ভিতরে সর্বত্রই ঝক্ঝকে—দরজার উপর পত্র-পল্লবে সাজানো, দেওয়ালের প্রতি ছবিখানি ঘিরে সবুজ পাতা, দরজা জানালায় সাদা ধবধবে পর্দা—ঘরের মেঝেগুলিও ঝক্ঝক্ করছে। লম্বা টেবিলের উপর সাদা ঢাকনি—তার উপর ফুলের মালা, লাল আর সাদা ফিতে দিয়ে বাঁধা। টেবিলের চারধারে মেয়েরা ব'সে—উচ্ছ্বাসে যেন গোলাপ বা পিঙ্ক ফুলের মত হয়ে গিয়েছে। তারা সবাই ক্রিষ্টিনার বিয়ের মালা গাঁথতে এসেছে। ক্রিষ্টিনাও টেবিলের এককোণে বসে আছে—যেন বিনয়ের প্রতিমা। আজ সে কর্মহীনা। ঘরের কোন কাজ আজ তার করার নেই। দিদিমার হাতে সে আজ নিজেকে সঁপে দিয়েছে। দিদিমা এসব বিয়ের কাজে যোগ দিতে রাজী না থাকলেও ক্রিষ্টিনাকে তিনি 'না' বলতে পারেন নি। ক্রিষ্টিনার মা অসুস্থ, তাই মিলারের স্ত্রী ঘরের কাজের ভার নিয়েছে। চিক্কা ও তার মাও সাহায্য করছে। দিদিমা মেয়েদের মধ্যে বসেছেন। কিছু না করলেও সবাইকে তাঁর নানা কাজে উপদেশ দিতে হয়। কনে কোণে বসে বসে বিয়ের মালায় সুতো পরাচ্ছে।

যে ঘোড়াটি কনের গাড়ি টেনে গির্জায় নিয়ে যাবে তাকেও ফুলের মালা ও রঙিন ফিতে দিয়ে সাজানো হয়েছে। বরের দিকে চেয়ে কনের চোখ দুটি আনন্দে ও মাধুর্যে ভরে ওঠে। বর বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে—বন্ধুরা তাদের স্ত্রী আর বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করছে প্রাণ খুলে। বরের কিন্তু কনের সঙ্গে কথা বলার তত স্বাধীনতা নেই—তাদের শুধু

মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়। কনের সাথীরা মালা দুলিয়ে গেয়ে ওঠে :

'ও সাদা পায়রা, কোথায় পালিয়েছ তুমি,

তোমার তুষার শুভ্র পালক আর বুক যে ভিজে গেল—'

কনে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে।

বর তাই দেখে সবাইকে জিজ্ঞেস করে : 'ও কাঁদছে কেন?'

'সুখ আর দুঃখ পরস্পরের সঙ্গী। একে অন্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজ দুঃখ কাল সুখ।'

তারপর আরম্ভ হয় গানের পর গান। প্রথমে যৌবন, প্রেম ও একক জীবনের আনন্দের গান। তারপর বিবাহিত জীবনের সুখশান্তির গান। গানের মাঝে মাঝে বরের মুখপাত্রের গলা শোনা যায়। বিয়ের পর দাম্পত্যজীবনের আনন্দের গান শুনে সে বলে : 'আমি একটি নতুন গান গাইবো—'

'শুনি শুনি আমরা কাকের কা কা— !'

'হায় দাম্পত্য সুখ!

কোথায় সে-সুখ?

আমি যদি ওকে বলি : রান্না করো,

ও শুধু রাঁধবে বার্লি।

আমি যদি বলি : মাংস রাঁধো,

ও শুধু কইবে কথা আর মাখবে ময়দা।

হায় দাম্পত্য সুখ!

কোথায় সে-সুখ!'

মেয়েরা চেঁচিয়ে ওঠে : 'এ গানের এক পয়সাও দাম নেই।'

তাদের হুল্লড়ে আর কেউ এ গানের শেষ শুনতে পায় না। মালা গাঁথা হয়ে গেলে মেয়েরা হাত ধরাধরি ক'রে টেবিলের চারধারে নেচে গাইতে থাকে :

'এবার সব তৈরি
মিলেছে উপহার—
কোলাচও হয়েছে ভাজা,
শেষ হলো মালা গাঁথা।

দরজা খুলে যায়। মিলারের স্ত্রী কয়েকজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রচুর খাবার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে—তার পিছনে পানীয় নিয়ে মিলার ও কয়েকজন বরযাত্রী। সবাই টেবিলে এসে বসে। মালার বদলে এবার টেবিলখানা নানা খাবারে ভরতি হয়ে যায়।

খাওয়া, পান ও আনন্দের পরে টেবিল পরিষ্কার ক'রে কনের কাছে উপহার স্বরূপ তিনখানি থালা নিয়ে আসা হয়। প্রথমটায় এক গোছা গমের শীষ—কনে যেন ফলবতী হয়; দ্বিতীয়টিতে ছাইয়ের সঙ্গে কতগুলি বীজ মেশানো—কনেকে তা বেছে নিতে হবে, তার ধৈর্যের পরীক্ষা। তৃতীয় থালাটিতে কি যেন কাপড় দিয়ে ঢাকা—কনেকে সেই গুপ্ত জিনিসটি না দেখেই হাত পেতে নিতে হবে। কিন্তু কনে কাপড়খানির এককোণা তুলতেই তা থেকে একটি চড়ুই পাখি বেরিয়ে উড়ে ঘরের চালে গিয়ে বসে।

দিদিমা কনের ঘাড়ে হাত রেখে বলেন: 'দেখলি তো বেশী কৌতূহলের ফল!'

ছেলেমেয়েরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। ভোজের পরই নাচ শুরু হয়।

পর দিন সকালে ছেরনভের সবাই তাড়াতাড়ি জেগে ওঠে। কেউ কনের সঙ্গে গির্জায় যাবে, কারও বা বিয়ে বাড়ি যাবার নিমন্ত্রণ। যাদের নিমন্ত্রণ হয়নি তারাও রাস্তায় এসে হাজির হয় শোভাযাত্রা দেখার জন্য। জম্‌জমে শোভাযাত্রা—ঘোড়ায় টানা গাড়ি ক'রে কনে যাবে—

কনের গলায় দামী পাথরের নেকলেস্, পরনে সাদা চিকনের কাজ করা এপ্রণ, গোলাপী রঙের তাফ্তার জ্যাকেট্ ও ফিকে নীল স্কার্ট—এ খবর সবার কানে পৌঁছে গেছে। সবাই জানে ভোজে কি কি খাবার দেওয়া হবে, টেবিলে কে কে কার কার পরে বসবে, কনে কি কি আসবাব পাবে, ক'খানি পালকের বিছানা, এমন কি ক'টি অন্তর্বাস পাবে, তা পর্যন্ত। এ সবের হিসাব কারও অজানা নেই। এমনি বিয়েতে কি যাবো না বললে চলে? কনের মালাটি কেমন হলো, কতক্ষণ কাঁদলো সে, নিমন্ত্রিতদের পোশাক কেমন—এ যদি কেউ না দেখে তবে তার গাফিলতির মার্জনা নেই। এ উৎসব যেন ছেরনভের একটা বিশেষ ঘটনা—ছ'মাস ধরে এর আলোচনা চলবে। এমন সুযোগ কি হারানো যায়?

পুরোনো বাড়ি ও মিল থেকে নিমন্ত্রিতেরা এসে ভিড় ঠেলে সরাইখানার ভিতরে প্রবেশ করে। কনেপক্ষের নিমন্ত্রিতেরা এসে গেছে। মিলার তার সবচেয়ে ভাল পোশাকটি পরে এসেছে। তার জুতোয় যেন আজ মুখ দেখা যায় এমনি পালিশ—হাতে একটি রুপোর নস্যির কৌটো। সে কনে পক্ষের তরফ থেকে সাক্ষী। মিলারের স্ত্রীও এসেছে সিল্কের পোশাকে—জোড়া থুতনির তলে গলায় মুক্তার মালা ও মাথায় সোনালী টুপি। দিদিমার পরনেও বিয়ের পোশাক, মাথায় রবিবারের টুপিটি। কনের সঙ্গীরা, বরযাত্রী ও বরের মুখপাত্র—কারও দেখা নেই। তারা সবাই ছেরনভ-এ বরকে আনতে গিয়েছে। কনেরও দেখা নেই—সে ঘরের কোণে বসে আছে।

সহসা উঠোনে সোরগোল পড়ে যায়। 'ঐ আসছে, আসছে—'

মিলের কাছ থেকে বেহালা ও বাঁশির শব্দ শোনা যায়। সবাই বরকে নিয়ে আসছে। দর্শকেরা ফিস্ ফিস্ করে বলে: 'দেখ, দেখ মিলোর ছোট বোন হয়েছে ছোট নিতকনে, তিথনেকের মেয়ে

হয়েছে বড় নিতকনে—টমেসের বৌ যদি একা থাকতো তাহলে সেও নিতকনে সেজে আসতো!'

'টমেস্ বরের সাক্ষী!'

'ওর বৌ কোথায়? তাকে দেখছি না তো।'

'সে কনেকে সাজগোজ করাচ্ছে।'

তার তো সময় হয়ে এল, যে কোন দিন নতুন মানুষ আসবে পৃথিবীতে।' কে একজন মহিলা বললেন।

'আরে দেখ, মোড়লও আসছে! আশ্চর্য, ওকেও নিমন্ত্রণ করেছে! ওই তো সব নষ্টের মূল।'

সবই আশ্চর্য হয়ে যায়।

'মোড়ল নিজে তত খারাপ লোক নয়, লুসিই আগুন জ্বেলেছে—আর কর্মাধ্যক্ষ তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে। মিলো ওকে নিমন্ত্রণ ক'রে ভালই করেছে, এই উপযুক্ত শাস্তি, বিশেষ ক'রে লুসির পক্ষে। সে ঈর্ষায় জ্বলে মরবে।'

'কেন, ওর তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—'

'কই, আমি তো শুনিনি।'

'সবেমাত্র—গত পরশু—ঠিক হয়েছে।'

'অনেক দিন ওর জন্য অপেক্ষা করেছিল জোসেফ ছেলেটি।'

'তা হবে, তবে যতদিন মিলোর আশা ছিল, ততদিন ও-মেয়ে আর কাউকে বিয়ে করতো না।'

এমনি নানা ধরনের মন্তব্য শোনা যায় সমাগতদের মধ্যে। বর যেই বাড়ির দরজায় আসে সরাইখানার মালিক এসে তাকে পূর্ণপাত্র নিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। রীতি অনুযায়ী বর সোজা কনের খোঁজে যায়, দেখে সে ঘরের কোণে বসে কাঁদছে। কনেকে সঙ্গে ক'রে বর এসে হাজির হয় অন্য এক ঘরে, সেখানে দুজনেরই বাপ মা তাদের

আশীর্বাদ করার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে। দু'জনে গুরুজনদের সামনে হাঁটু পেতে বসে। তখন তাদের মুখপাত্র তার বক্তৃতা শুরু করে। প্রথমেই বর ও কনের পক্ষ থেকে বাপমাকে তাদের সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। ঘরে সকলের চোখে জল এসে যায়। আশীর্বাদের পর তারা গির্জায় রওনা হয়।

বরকনের সহচর ও কনের প্রথম সহচরীর মধ্যে ক্রিষ্টিনা, তারপর কনের দ্বিতীয় সহচরীর সঙ্গে মিলো, তারপর এমনি জোড়ে জোড়ে সবাই চলে, কেবলমাত্র মুখপাত্র একা শোভাযাত্রার সামনে এগিয়ে চলে। তারা গাড়িতে উঠলে মেয়েরা রুমাল নেড়ে গান ধরে—ছেলেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। কনে কিন্তু নীরবে কাঁদে, মাঝে মাঝে অপর গাড়িতে যেখানে বর আর তার সাক্ষী বসে আছে সেদিকে তাকায়।

দর্শকেরা যে যার বাড়ি চলে যায়। শূন্য সরাইখানা। শুধু এক জানালার ধারে ক্রিষ্টিনার রুগ্ন মা বসে বসে শোভাযাত্রার দিকে চেয়ে মেয়ের জন্য মনে মনে প্রার্থনা করে। বাড়িতে মেয়ে এতদিন মার শূন্যস্থান পূরণ ক'রে রেখেছিল—ধৈর্য ধরে মার দীর্ঘ পীড়াজনিত সব কঠোর মেজাজ সে হাসিমুখে সহ্য করেছে। ইতিমধ্যেই মেয়েরা টেবিল সাজাতে আসে। টমেসের স্ত্রী আজ সবকিছুর ভার নিয়েছে। মালাগাঁথার উৎসবে সব কিছুর ভার ছিল মিলারের স্ত্রীর উপর।

গির্জা থেকে শোভাযাত্রা ফিরে এলে আবার সরাইখানার মালিক তাদের পূর্ণপাত্র নিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। পোশাক বদলে কনে ভোজে যায়। টেবিলের মাথায় বসে বর আর কনে। বরের নিতবর কনের নিতকনেদের পরিচর্যা করে—তারাও মাঝে মাঝে নিজেদের খাবার তুলে তাকে দেয়। মুখপাত্র ঘোষণা করে যে 'স্বর্গের দেবতার' মত সে তার কর্তব্য সাধন করেছে। দিদিমা আজ আনন্দময়ী। নানা ধরনের

রসিকতার জবাব দেন দিদিমা। বাড়িতে তিনি কখনও একটি মটর-দানাও মাটিতে ফেলে দেন না, কিন্তু এখানে যখন পরস্পর মুঠোমুঠো গম ও মটর ছোড়াছুড়ি করছে, তিনি বর ও কনের দিকে এক মুঠো গম ছুড়ে দিয়ে বলেন: 'ভগবান যেন তোমাদের উপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।' মটর ও গমের দানাগুলি কিন্তু কেউ পা দিয়ে মাড়াবার সুযোগ পায় না—পোষা পায়রাগুলি এসে তা খুঁটে খায়।

ভোজ শেষ হয়। মদে আর মদে অনেকে বেসামাল। প্রত্যেকেরই সামনে অপর্যাপ্ত খাবার বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। যদি কেউ বয়ে নিয়ে যাবারও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তবে টমেসের স্ত্রী এসে তাকে সাহায্য করে। বিয়েবাড়ি থেকে খালি হাতে ফেরা অসম্মানের কথা। পান ও আহারের এত প্রাচুর্য যে যেই সরাই-খানার পাশ দিয়ে গিয়েছে সেই ইচ্ছামত তার ভাগ পেয়েছে। গ্রামের ছেলের দল যারা শুধু ঘুরে দেখতে এসেছে, তাদেরও পকেট খাবারে ভর্তি হয়ে উঠেছে। ভোজের পর সবাই কনেকে 'দোলনার জন্য' অর্থ দেয়। এপ্রণের উপর টাকা পয়সা পড়তে দেখে কনে কিন্তু বিস্মিত হয় না। বরকনের সহচরেরা কনের সহচরীদের হাত ধোয়ার জন্য পাত্র ভরে জল ও তোয়ালে নিয়ে আসে। প্রথা যে, মেয়েদের এই পরিচর্যার জন্য জলে কয়েকটি মুদ্রা ফেলে দেওয়া। খোসমেজাজী মেয়েদের কৃপায় জলপাত্রটির তলদেশ রৌপ্য মুদ্রায় ভরে ওঠে। পরের দিন ছেলেরা পানে ও নাচে তার সদ্ব্যবহার করবে।

এবার নাচ শুরু হয়। বরকনে পোশাক বদলাতে যায়। এই সুযোগে দিদিমা ছেলেমেয়েদের বাড়ি নিয়ে যান। তাঁকে আবার ফিরে আসতে হবে, সন্ধ্যায় কনের মালা খুলে ফেলার অনুষ্ঠানে। কনের মাথায় পরানোর জন্য তিনি একটি টুপিও নিয়ে এসেছেন। এ ভার

তাঁরই উপর। নাচের পর সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে—সবাই কনের সঙ্গে নাচতে চায়। দিদিমা অন্য স্ত্রীলোকদের আড়ালে ডেকে চুপে চুপে বলেন—মাঝরাত্রি হয়ে গেছে, এবার কনে 'মেয়েদের' হাতে। তারা সবাই গিয়ে বর ও তার সহচরের সঙ্গে কনেকে নিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। তারা কনেকে কিছুতেই ছাড়বে না—তার মালা খুলতে দেবে না। অবশেষে মেয়েরা কনেকে নিয়ে আসে তার ঘরে। মেয়েরা দরজায় দাঁড়িয়ে করুণ গান ধরে।

টমেসের স্ত্রী কনের মাথার চুল খুলে দিয়ে তার মাথা থেকে ফুলের মুকুট ও মালা খুলে নেয়। দিদিমা তখন তার মাথায় টুপি পরিয়ে দেন। কনে কাঁদতে থাকে, অন্যান্য মেয়েরা কলরব করে। কেবলমাত্র দিমিমা গম্ভীর হয়ে থাকেন। কখনও বা তাঁর মুখে হাসির রেখা খেলে গেলেও তাঁর চোখ দুটি সিক্ত হয়ে ওঠে। আজ তাঁর মেয়ে ইয়োহানারও বিয়ে, এ কথা মনে পড়ে যায় তাঁর।

কনের মাথার টুপিটি বেশ মানিয়েছে। তবু মিলারের স্ত্রী ঠাট্টা করে বলে, যেন বাঁদরের মত দেখতে।

'এবার বরের পালা। কে যাবে তোমাদের মধ্যে বরকে জব্দ করতে?' দিদিমা জিজ্ঞেস করেন।

'আমি যাই একজনকে ধরে নিয়ে আসছি,' টমেসের বৌ ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে বুড়ী ধোপানীকে ধরে নিয়ে আসে। তার মাথায় একখানি শাল ঢাকা দিয়ে দিদিমা তাকে নিয়ে চলেন বরের কাছে, সে যদি বুড়ীকে 'কিনতে' চায়। বর বুড়ীর চারদিকে ঘুরে ফিরে, তার শালখানি তুলতেই দেখে এক থুরথুরে বুড়ী। সবাই হেসে ওঠে। এমন কনেকে বর কিনতে চায় না। দিদিমা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আবার আর-একজনকে নিয়ে আসা হয়। বর আর সবাই ভাবে এ সত্যিকারের কনে—তাকে কিনে নেওয়া যাক। কিন্তু মুখপাত্র

বলে ওঠে: 'বস্তাবন্দী খরগোস কিনে কি হবে?' শালখানি তুলে ফেলতেই দেখা যায় যে মিলারের স্ত্রী মিষ্টি হাসছে।

নস্যির কৌটো ঘুরিয়ে মিলার বলে: 'নাও ওকে কিনে নাও তোমরা, খুব সস্তায় দিয়ে দেব—'

স্ত্রী হেসে বলে: 'আজ বেচে দেবে, কাল আবার আমায় কিনে নিতে হবে।'

তৃতীয়বার এক লম্বা ছিপছিপে কনেকে নিয়ে আসা হয়। মুখপাত্র বলে এর জন্য একটা টাকা দিতে পারি। বর কিন্তু তার থলেতে যা কিছু ছিল সব দিয়ে তাকে কিনে নেয়। খবর পেয়ে মেয়েরা ছুটে এসে বরকে ঘিরে গান ধরে:

'সব সাঙ্গ হ'লো।
মালা খোলা হয়ে গেল,
কোলাচও খাওয়া হলো,
এবার কনেও হয়েছে জয়।'

এবার কনে বরের। মেয়েরা কনের জন্য যে টাকা পেয়েছে কাল তারা যখন বাসর সাজাতে আসবে তখন তা খাওয়ায় খরচ হবে। তখনও গান ও হাসির হুল্লোড় পড়ে যাবে। মুখপাত্র বলে যে সত্যিকারের নিয়ম মানলে বিয়ের উৎসবে কমপক্ষে আটদিন লাগে। বিয়ের আগে মালা গাঁথার উৎসব, বিয়ে, বাসরশয্যা, কনের বাড়িতে ও বরের বাড়িতে মিলন, তারপর বন্ধুদের সঙ্গে সমাবেশ—এই করেই সপ্তাহ কেটে যায়। তারপরেই নবদম্পতীর বিশ্রাম—তারা তখন বলতে পারে: 'এবার আমরা একা-দুজনে··· !'

ক্রিষ্টিনার বিয়ের কয়েকদিন পর শ্রীমতী প্রশেক ক্যাসেলের এক স্ত্রী কর্মচারীর কাছ থেকে চিঠি পেলেন যে এক শিল্পীর সঙ্গে কাউন্টেসের

বিয়ের ঠিক হয়েছে। এই শিল্পীই নাকি কাউণ্টেসের শিক্ষক ছিল। কাউণ্টেস্ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে,—রাজকুমারীও তাই এখন খুব সুখী।

খবর শুনে দিদিমা মাথা নেড়ে বলেন: 'ভগবানকে ধন্যবাদ। সব কিছুই সফল হয়েছে।'

* * *

দিদিমার চারধারে ছোটরা কি ভাবে বেড়ে ওঠে তা বর্ণনা করার অভিলাষ আমার নেই। শিকার-রক্ষকের বাড়ি থেকে মিলারের বাড়িতেও পাঠকদের বারবার টেনে নিয়ে যাবার অর্থ হয় না। এ পথে জীবন সহজ ও সরল, বিশেষ পরিবর্তন নেই। ছোটরা বড় হয়, কেউ বেরিয়ে পড়ে, কেউ বাড়িতেই থাকে—তারপর বিবাহ। বৃদ্ধেরা বয়ঃপ্রাপ্তদের ভার দিয়ে বিদায় নেয়, ঠিক যেমন ওক্ গাছের বুড়ো পাতাগুলি ঝরে পড়ে,—আবার নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে। ভাগ্য অন্বেষণে কেউ বেরিয়ে পড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে-নিয়ে-যাওয়া গাছের বীজের মত। সেখানেই তারা অনুকূল পরিবেশে শিকড় গেড়ে বসে।

দিদিমা কিন্তু এ স্থান ছেড়ে আর কোথাও গেলেন না। শান্ত ও ধীর মনে তিনি তাঁর চারদিকে চেয়ে দেখেন সকলের শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি। প্রতিবেশীদের সৌভাগ্যে তিনি আনন্দ পান, তাদের দুঃখে সমবেদনা জানান। একে একে তাঁর নাতিনাতনীরা যেই বড় হয়ে বাড়ি ছেড়ে যায়, তিনি তাদের চোখের জলে বিদায় দেন,—বলেন: 'ভগবান করলে আবার দেখা হবে।' আবার দেখা হয়। বছরের শেষে তারা বাড়ি আসে। তাদের গল্প শুনে দিদিমার চোখ দুটি খুশিতে ভরে

ওঠে। তিনি তাদের ভবিষ্যতের ভরসা দেন। তাদের ছোট খাট দোষ ত্রুটি তিনি মার্জনা করেন। তারাও তাঁর কাছে কোন কথাই গোপন করে না। বয়স্কা মেয়েরা দিদিমার কাছে কোন কথাই গোপন করে না। তিনি তাদের আশা, ভরসা, ভয়, ভাবনা সব কিছুই জানতেন। তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা থেকে তারা কখনই বঞ্চিত হতো না।

মান্‌চিঙ্কা একটি ছেলেকে ভালবাসতো। ছেলেটি বড় ভাল তবে বড় গরীব। মিলার তাই মেয়ের কিছুতেই বিয়েতে মত দেয় না। মান্‌চিঙ্কা তখন পালিয়ে দিদিমার কাছে আশ্রয় নেয়। দিদিমা জানতেন কি ভাবে মিলারের মাথার ঠিক করতে হবে। বিয়ে হয়ে যাবার পর মেয়ে যখন সুখী, ব্যবসাও যখন কর্মঠ জামাইয়ের তদারকে ভাল চলছে, মিলার তখন একদিন বলে : 'দিদিমা ঠিকই বলেছেন। গরীবের উপরই ভগবানের দয়া বেশী।'

ছোট ছেলেমেয়েরা দিদিমাকে আপনার দিদিমা বলেই জানে। ক্রিষ্টিনার বিয়ের দু'বছর পর রাজকুমারী ফিরে আসেন। তিনি দিদিমাকে ডেকে পাঠান। একটি সুন্দর ছোট ছেলেকে দেখিয়ে রাজকুমারী বলেন—এ কাউণ্টেসের ছেলে। কাউণ্টেস্‌ বিয়ের এক-বছর পরেই মারা গিয়েছে। দিদিমা ছেলেটিকে কোলে নিতেই তাঁর চোখ জলে ভরে ওঠে। সেই অসহায় শিশুটির মার কথা তাঁর মনে পড়ে। রাজকুমারীর কোলে শিশুটিকে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বলেন : 'আমাদের কেঁদে লাভ নেই। কাউণ্টেস্‌ স্বর্গে গিয়েছে—এ পৃথিবী তার স্থান নয়। ভগবান যাদের ভালবাসেন তাদেরই ডেকে নেন।'

সবাই বুঝতে পারেনি যে দিদিমা দিনে দিনে শেষের পথে এগিয়ে চলেছেন। একমাত্র দিদিমাই তা জানতেন। একটি পুরোনো আপেল গাছকে দেখিয়ে তিনি বলতেন : 'আমাদের দু'জনের অবস্থাই এক, একই সঙ্গে বিদায় নেব আমরা।'

এক বসন্তে সব গাছেই সবুজ পাতায় ভরে ওঠে, কেবলমাত্র সেই পুরোনো আপেল গাছটিতে আর পাতা আসে না। সেই বসন্তেই দিদিমার কাশি বেড়ে ওঠে। তিনি আর হেঁটে গির্জায় যেতে পারেন না। হাত দু'খানি আরও জীর্ণ হয়ে যায়—মাথার চুল বরফের মত সাদা আর গলার স্বর দিনে দিনে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

একদিন শ্রীমতী প্রশেক সবাইকে চিঠি লিখে বাড়ি আসতে বলে। দিদিমা শয্যা নিয়েছেন। আর তিনি চরকা নিয়ে বসতে পারেন না। শিকার-রক্ষকের বাড়ি, মিলারের বাড়ি ও গ্রাম থেকে সবাই জিজ্ঞেস করতে আসে দিদিমা কেমন আছেন। দিদিমা ভাল নেই। আডেল্কা তাঁর সঙ্গে প্রার্থনা করে। রোজ তাকে দিদিমাকে খবর বলতে হয়, বাগানের গাছগুলি কেমন আছে, তরিতরকারীর গাছগুলো কত বড় হয়েছে, হাঁসমুরগী কেমন আছে, স্পটি কি করছে। আডেল্কা শুনে বলে আর কতদিনে বেয়ার আসবে। 'জন্‌ও হয়তো তার সঙ্গে আসবে।' দিদিমা মনে মনে আশা করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তিও, লোপ পেতে শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে তিনি আডেল্কাকে বারুস্কা বলে ডেকে ওঠেন। আডেল্কা যেই বলে বারুস্কা বাড়ি নেই তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন: 'না, সে বাড়ি নেই। তার সঙ্গে আর দেখা হবে না। সে ভাল আছে তো?' সবার সঙ্গেই দিদিমার দেখা হয়।

প্রশেক বাড়ি আসে। তার সঙ্গে আসে উইলি ও ইয়োহানা। জ্যাসপারও আসে। রিসেন্ পাহাড় থেকে বেয়ারও আসে জন্‌কে সঙ্গে ক'রে। ওরেলও এসেছে। দিদিমা তাকেও নাতিনাতনীদের মধ্যে গণ্য করতেন। আডেল্কার সঙ্গে তার ভাব তাঁর অজানা ছিল না। তাঁর মতও ছিল। সবাই এসে দিদিমার বিছানার চারধারে উপস্থিত হয়।

সর্বপ্রথম আসে বারুস্কা। সে নাইটেঙ্গেলটি সঙ্গে ক'রে এসেছে। দিদিমার

ঘরের জানালা দিয়ে পাখিটা তার বাসায় আসতো। দিদিমার ঘরে বারুক্কা তার পুরোনো জায়গাটি তাকিয়ে দেখে। ওখানেই তার বিছানা ছিল। ওখানে শুয়েই সে পাখির গান শুনতো—ওখানে শুতে যেতে বা উঠতে দিদিমা তাকে আশীর্বাদ করতেন। আবার সে দিদিমার কাছে ফিরে এসেছে, সেই কণ্ঠধ্বনি। সেই হাতখানিই আজ আবার বারুক্কার কপাল ছুঁয়ে রয়েছে। একই কপাল, তবে আজ তার চিন্তা ভিন্ন। দিদিমা দেখেন তার আদরের নাতনীর চোখে জল ঝরছে—কিন্তু এ চোখের জলও ভিন্ন। এ সেই ছোটবেলার চোখের জল নয়, যা একটি মধুর হাসিতেই মুছে যেত—আর সে তখন দিদিমার ঘরে ছোট বিছানায় পড়তো ঘুমিয়ে। সে-চোখের জল শুধু ভিজিয়ে দিত, দৃষ্টিকে স্তিমিত করতে পারতো না।

দিদিমা বুঝতে পারেন তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। তাই পাকা গিন্নীর মত তাঁর ঘরসংসার গুটাতে বসেন। প্রথমে মনে মনে ভগবানের নামে প্রার্থনা ক'রে তিনি তাঁর সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা শুরু করেন। প্রত্যেকেই একটি একটি উপহার পায়। যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে তিনি মিষ্টি কথা বলেন—তাদের দিকে চেয়ে থাকেন যতক্ষণ না তারা দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। রাজকুমারীও হোরটেন্‌সের শিশুপুত্র নিয়ে দেখতে এলেন। তাঁরা যাবার পরও দিদিমা ওঁদের যাবার পথের দিকে চেয়ে থাকেন, জানেন আর তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে না। বোবা প্রাণী কুকুর ও বেড়ালটির কথাও তিনি ভুলতে পারেন না। তাদেরও তিনি বিছানার পাশে ডেকে আদর করেন। স্থলতান তাঁর হাত চেটে দেয়। চাকরদের বলেন: 'ওদের দেখো। ওরা বড় কৃতজ্ঞ।' ভোরসাকে ডেকে দিদিমা বলেন: 'আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি জর্জ এসেছে। আমি মরে গেলেই মৌমাছিদের খবর দিতে ভুলো না···আর সবাই হয়তো ভুলে যাবে।' দিদিমা জানতেন

ভোরসা একথা শুনবে কারণ তার এতে বিশ্বাস ছিল। অন্য সবাই ইচ্ছা থাকলেও হয়তো ভুলে যাবে।

পরের দিন সন্ধ্যায় দিদিমা ধীরে ধীরে শেষের পথে এগিয়ে চলেন। বারুস্কা তাঁকে শেষ প্রার্থনা পড়ে শোনায়—তিনিও তা আবৃত্তি করেন। সহসা তাঁর ঠোঁট দুখানি নিশ্চল হয়ে যায়, দৃষ্টি বিছানার উপর ঝুলানো ক্রুশটির উপর স্তব্ধ হয়ে থাকে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। জীবন-শিখা নিভে আসে—প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেল।

বারুস্কা চোখ বন্ধ করে। ক্রিষ্টিনা জানালা খুলে দেয়, 'আত্মা যেন উড়ে যেতে পারে।' ভোরসা কান্না থামিয়ে ছুটে মৌমাছির চাকের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে : 'মৌমাছি, আমাদের দিদিমা আর নেই—' গাছের নীচে বসে সে কাঁদতে থাকে। মিলার ছেরনভে গিয়ে গির্জার ঘণ্টা বাজানোর ব্যবস্থা করে। বাড়িতে বসে তার ভাল লাগে না—বাইরে গিয়ে চোখের জলে মনের দুঃখ কাটিয়ে আসে। পথে যেতে যেতে বলে : 'ভিক্টোরকাকে হারিয়েছি—দিদিমাকে ভুলবো কি ক'রে ?' গির্জার ঘণ্টা যেই দিদিমার পরলোক যাওয়ার সংবাদ ঘোষণা করে পাড়া প্রতিবেশী সবাই কাঁদে।

তিনদিন পর দিদিমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসবে গাঁয়ের সবাই এসে যোগ দেয়। সবাই দিদিমার শেষ বিশ্রামের স্থানটি পর্যন্ত অনুগমন করতে চায়। ক্যাসেলের পাশ দিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে—জানালার পর্দা সরিয়ে রাজকুমারী তাকিয়ে থাকেন নির্নিমেষ চোখে। করুণদৃষ্টিতে তিনি শোভাযাত্রার দিকে চেয়ে থাকেন—যতক্ষণ না তা দৃষ্টিপথ থেকে দূরে চলে যায়। তারপর পর্দা টেনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন :

'দিদিমা, সত্যিই তুমি বড় ভাল !'